পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর
জীবন-চরিত

তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা
হেমলতা দেবী
প্রণীত

প্রজ্ঞাভারতী

প্রকাশক
সুশান্ত দে
প্রজ্ঞাভারতী
১, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

প্রথম মুদ্রণ ১৩২৭
প্রজ্ঞাভারতী প্রকাশিত
দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯০

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রক
মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৪

গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন

আমার আজন্মের সাধ পূর্ণ হইল। যখন হইতে কলম ধরিতে শিখিয়াছি তখন হইতে আমার প্রাণের বাসনা যে পিতৃদেবের জীবনচরিত লিখিব। পিতা আমার যখন বিলাতে ছিলেন তখন তাঁকে এই কথা লিখি, তদুত্তরে তিনি লেখেনঃ—

"তুমি তোমার এক পত্রে লিখিয়াছ যে তুমি আমার জীবনচরিত লিখিবে। ছি! ছি! এমন কাজ করিও না। তোমার পিতার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। ঈশ্বরের সেবাতে আমার এই শ্মশ্রু যখন শুভ্রবর্ণ হইয়া যাইবে, এই রসনা তাঁর গুণগান করিতে করিতে যখন বার্দ্ধক্যবশতঃ নিস্তেজ ও অসমর্থ হইয়া আসিবে, এ চক্ষু তাঁর বিশ্বাসীদলের সুখ দেখিতে দেখিতে যখন নিস্তেজ ও অন্ধ হইয়া যাইবে, যখন আমি তোমার স্কন্ধে হাত দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাইব এবং এখন যাহারা জননীর গর্ভে আছে তারা আচার্য্যের কার্য্য করিবে সেই জীবনের সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকি এবং তুমি মা যদি বাঁচিয়া থাক তবে তোমার বাবার সামান্য জীবনের বৃত্তান্ত লিখিবে। তোমার পিতার জীবনে জগদীশ্বরের করুণা কিরূপ কাজ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিও। আমার আবার জীবনচরিত লেখা হইবে ভাবিলেও আমার লজ্জা হয়।" অতএব ভগবান্ যখন তাঁর অযোগ্য কন্যাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তখন আমার আজীবনের বাসনা পূর্ণ করিলাম।

আমি পিতার জীবনচরিত লিখিতেছি শুনিয়া অনেকে ভীত হইয়াছেন, মনে করিতেছেন বুঝি বা অতিভক্তিবশতঃ আমি পিতার চরিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলি। ভগবান জানেন, আমি একটি কথাও বাড়াইয়া লিখি নাই। আমার পিতার অলৌকিকত্ব কিছুই ছিল না, তিনি দেবতা ছিলেন না। তবে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে আমি তাঁর যথার্থ চিত্র আঁকিতে পারিয়াছি কি না। আমি তাঁকে ঠিকরূপেই বুঝিয়াছিলাম, কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতেছি 'অনুরাগ অন্ধ নয়, বিরাগ অন্ধ'। পিতৃভক্তি আমার চক্ষে সেই অঞ্জন লাগাইয়া দিয়াছে যাতে তাঁর মহান চরিত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি: কিন্তু অক্ষমতাবশতঃ ঠিক প্রকাশ করিতে পারি নাই।

পিতৃদেবের বিস্তর ডায়েরি আছে—আশা আছে তার কিছু কিছু সাধারণকে দেখাইতে পারিব। আমার এই গ্রন্থের অনেক উপকরণ সেই ডায়েরি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদটি স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বসন্তবালার প্রদত্ত একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে এই সকল কথা বসন্তবালা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি এইজন্য বসন্তবালার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রিয়নাথের নিকট নানাবিধ উপকরণ পাইয়াছি। তিনি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ কাজ ত তাঁর আমার দুজনেরই কাজ; সুতরাং তাঁকে আর ধন্যবাদ দিব কি? সাধনাশ্রম-সংক্রান্ত অধ্যায়টি লিখিবার সময়ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

চক্রবর্তী কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমি বিদেশে থাকি, বন্ধুগণের সহায়তা লাভের সুযোগ পাই নাই। যেমন লিখিয়াছি তেমনই ছাপাইলাম। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র কলেবর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমাকে অনেক কথা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের কাহারো কোন পরিচয় দিতে পারি নাই, কেবল আসল কথাটি বলিয়া অপর কথা সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও অনেক শ্রীবৃদ্ধির স্থান রহিল। অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল, তাহা ভবিষ্যতে সংশোধিত হইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে হইল, সুতরাং নির্ভুল করিতে পারা গেল না।

এই পুস্তকখানি এত শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কেহই আমাকে ভরসা দেন নাই। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ ইহাকে যন্ত্রস্থ করিয়া যথা সময়ে প্রকাশিত করিবার গুরুভার স্কন্ধে লইয়া এক অসাধ্যসাধন করিলেন; কেবল তাঁরই ঐকান্তিক যত্নে আমার এই পুস্তকখানি আজ প্রকাশিত হইল।

'সবুজপত্র' সহকারী শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই বইখানির প্রুফ দেখার কঠিন কার্য্যটি প্রসন্নমনে করিয়া দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুইজন সহৃদয় ব্যক্তির নিঃস্বার্থ উপকারের কথা আমি বিস্মৃত হইতে পারিব না।

গ্রন্থকর্ত্রী

কলিকাতা
৭ই জানুয়ারি, ১৯২১

উৎসর্গ

আশার বাস ভবিষ্যতে।
আমাব সন্তানদিগের ক্রোড় যাহারা অলঙ্কৃত
কবিয়াছে ও করিবে
প্রাণেব সেই প্রিয় ধনগুলিকে
ও
বন্ধুদিগের নাতি নাত্‌নিগণের
চাবু হস্তে
আমাব এই মহামূল্য সম্পত্তি
উপহাব দিলাম।

এই পুস্তকখানির পুনর্মুদ্রণে সহায়তার জন্য আমরা শ্রীমতী তপতী মুখোপাধ্যায় ও কুমারী বুলবুল সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রকাশক

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পত্রাংক
১	মজিলপুর গ্রাম ও তাহার ইতিহাস	১
২	বংশপরিচয়—পিতামাতা	৮
৩	জন্ম—মাতুলালয়—শৈশব	২১
৪	বিদ্যাশিক্ষা ও কলিকাতায় আগমন	৩১
৫	ধর্ম্মচেতনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ	৩৬
৬	বিধবা বিবাহের আন্দোলন	৪৩
৭	ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ	৪৭
৮	ভারতাশ্রম	৫৪
৯	হরিনাভি বাস	৫৯
১০	ভবানীপুরে বাস	৬১
১১	হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা	৬৭
১২	কুচবিহার বিবাহ	৭১
১৩	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৭৫
১৪	ধর্ম্মবীর—কর্ম্মক্ষেত্রে	৮২
১৫	পত্নী প্রসন্নময়ী	৮৭
১৬	প্রবল কর্ম্মময় যুগ	৯৩
১৭	বিলাত যাত্রা	৯৮
১৮	বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর	১০২
১৯	সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা	১০৭
২০	রুগ্নদেহে সেবা	১২০
২১	জীবনের শেষ অধ্যায়	১২৬
২২	শেষ চিত্র	১৩৩
২৩	শিবনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব	১৩৭
২৪	সাধকরূপে—ধর্ম্মরাজ্যে	১৪২
২৫	সাহিত্য-ক্ষেত্রে	১৫০
	পরিশিষ্ট	১৫৮
	লেখিকার পরিচয়	১৭৪

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

মজিলপুর গ্রাম ও তাহার ইতিহাস

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের রাজপুর, হরিনাভি, মজিলপুর প্রভৃতি গ্রাম বৈদিক ব্রাহ্মণকুলের প্রধান আবাসভূমি,—তন্মধ্যে মজিলপুর গ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অনুমান গঙ্গার এক শাখা এক সময়ে এই পথে বহমানা ছিল—এখন আর সে গঙ্গার স্রোত নাই। গঙ্গার সেই ধারা এখন মজিয়া গিয়াছে। মজিলপুর গ্রাম এখন যেখানে—এইরূপ প্রবাদ আছে—এক সময় তাহা গঙ্গার গর্ভ ছিল। গঙ্গা মজিয়া যে স্থানের উৎপত্তি, সেই গ্রামের নাম হইল "মজিলপুর"। মজিলপুর গ্রামের সকল পুষ্করিণীর জলই গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র। মৃত্যুর সময় আপন আপন খিড়কীর পুকুরে সকলকে "অন্তর্জলি" করা হয়, তাহাতে গঙ্গা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সে গ্রামবাসী কাহারও সংশয় থাকে না—গ্রামখানি এমনই পবিত্র। গ্রামখানির কিছু বিশেষত্বও আছে। কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়িয়া ছারখার হইয়া গেল,—কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি অদ্যাবধি ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে পড়ে নাই। এখানে ম্যালেরিয়া নাই এবং ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে কায়স্থ-গণের ঘনবসতি। জমিদার দত্তগণ হইলেন গ্রামের মধ্যবিন্দু—জমিদার বাড়ীর আশেপাশে ব্রাহ্মণ ও জমিদারদিগের আত্মীয় কুটুম্বের এবং গ্রামের সীমান্ত প্রদেশে কামার, কুমার, হাড়ি, বাগ্দী প্রভৃতি ইতর জাতির বাস। গ্রামখানি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। গ্রামখানির আর এক বিশেষত্ব এই যে, এক এক পাড়া জুড়িয়া এক এক পরিবারের বাস—যথা ভট্টাচার্য্যপাড়া, সেখানে ভট্টাচার্য্য বই অপর কেহ বাস করে না; দত্তপাড়া, বসুপাড়া, চক্রবর্ত্তীপাড়া, নন্দীপাড়া, কুমারপাড়া ইত্যাদি। গ্রামখানি বেষ্টন করিয়া খাল;—সেই খালের জল কখনও বাড়ে, কখনও কমে। খালের সহিত নদীর যোগ আছে। ডায়মণ্ডহারবার রেলওয়ে লাইনের মগরাহাটা নামক স্থানে রেলগাড়ী হইতে নামিয়া শালতি বা ডোঙ্গা করিয়া জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি গ্রামে যাইতে হয়। পূর্ব্বে যখন রেলপথ হয় নাই তখন লোকে ডোঙ্গায় অর্দ্ধপথ আসিয়া মগরাহাটা হইতে বরাবর কলিকাতায় আসিত; কেহ কেহ বা গ্রাম হইতে কলিকাতায় পদব্রজেই আসিত। এই মজিলপুর গ্রাম কলিকাতার ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং সুন্দরবনের অতি সন্নিকটে। একশত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল গ্রামে অত্যন্ত বাঘের উৎপাত ছিল। লোকে যেমন শৃগাল, কুকুর দেখিলে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করে না, এই অঞ্চলের লোকেরাও ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করাটাও তেমনি বড় অদ্ভুত ব্যাপার ভাবিত না। গ্রামের ভিতর বাঘের অবাধ গতি ছিল। এখনও সেখানে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় প্রতিদিন যেখানে সন্ধ্যার সময় বাঘে জল খাইতে আসিত। সে কালের লোকেরাও সাহসী এবং বলিষ্ঠ ছিল, বাঘের নাম শুনিলেই লাঠিসোঁটা লইয়া ছুটিয়া যাইত। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে সেকালে বাঘের উপদ্রবের গল্প অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বয়স যখন পাঁচ বৎসর ছিল তখন তাঁহারা কোঠা ঘরে বসিয়া বাটীর সম্মুখের মাঠে তিন দিন ধরিয়া প্রকাণ্ড এক ষাঁড়ের সহিত বাঘের যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে বৃষ এবং ব্যাঘ্র উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই ভীষণ সংগ্রামের কথা আজও সকলে বর্ণনা করে। কালীনাথবাবুদের বাড়ীর দোতলায় একদিন বাঘ উঠিয়াছিল। বাঘের বিবর আর

একটা বড় কৌতুকের গল্প প্রচলিত আছে। গ্রামে বর্ষার প্রথম ধারা নামিলেই পুষ্করিণী ডোবা স্ফুরিত হইয়া যায়, এবং সেই সময় শত শত কৈ মাছ জল হইতে উঠিয়া পড়ে। পুকুর পাড়ে কৈ মাছ কানে হাঁটিয়া চলিয়া বেড়ায়, তখন আবাল-বৃদ্ধবনিতা কৈ মাছ ধরিতে ব্যস্ত হয়। সে এক বড় আমোদজনক ব্যাপার। একবার এই প্রকার বর্ষার দিনে দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলাবলি করিতে লাগিলেন—"ভাই, আজ দুজনে ভোরে গিয়া খুব কৈ মাছ ধরা যাইবে, তুমি এসে আমাকে ডেকো।" ভোরে এক বন্ধু উঠিয়া ভাবিলেন—"একাই সব মাছ ধরিব, বন্ধুকে ডাকিয়া কাজ নাই।" তিনি গিয়া দেখেন অন্ধকারে বন্ধু অগ্রেই পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন,—আস্তে আস্তে পিছন হইতে আসিয়া অন্ধকারে বন্ধুর মস্তক উদ্দেশ করিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন; কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ—এ যে বাঘ! ব্যাঘ্র মহাশয় মনের আনন্দে কৈ মাছ ধরিয়া খাইতে ছিলেন, আচম্বিতে চপেটাঘাত খাইয়া গর্জ্জন করিয়া এক দৌড়! ব্রাহ্মণ এদিকে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়াই অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। ওদিকে অপর বন্ধু অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন যে ব্রাহ্মণের আর সাড়া শব্দ নাই—একাই মাছ ধরিতে যাই ভাবিয়া পুকুর পাড়ে আসিয়া দেখেন বন্ধু অজ্ঞান হইয়া তথায় পড়িয়া আছেন। অনেক পরিচর্য্যার পর যখন তাঁহার সংজ্ঞা হইল তখন সকলে তার বাঘের মাথায় চপেটাঘাতের গল্প শুনিয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন।

সেকালে মজিলপুরের লোকের এই প্রকারে বাঘের সহিত ঘর করিতে হইত। বাঘের উপদ্রব নিবারণের জন্য এক এক পাড়া বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত, তাহার একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার দিন থাকিতে থাকিতে বন্ধ করা হইত, তৎপরে সকলে নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন গৃহে কাজ কর্ম্ম পূজা অর্চ্চনা করিত। একশত বৎসর পূর্ব্বে যে মজিলপুর গ্রামের এই অবস্থা ছিল, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে ত গহন কানন ও হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি ছিলই। এই মজিলপুর গ্রামে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে—১০১১ সালে যখন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে জয় করিতে আসেন, তখন তাঁহার মুন্সী দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজের কাশ্যপ গোত্রজ কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের বংশজ সপ্তদশ পর্য্যায়ভুক্ত চন্দ্রকেতু দত্ত, যশোহরের ধূমঘাটের সন্নিহিত চাপাফুলি গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া আপন আত্মীয় কুটুম্ব, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া এই মজিলপুর গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। মজিলপুর গ্রামের অস্তিত্বই তখন ছিল না,—গ্রামটি তখন খালের সন্নিহিত এক নব নির্ম্মিত চরমাত্র। শিবনাথের পূর্ব্ব-পুরুষ দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলজ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা চন্দ্রকেতু দত্তের যজ্ঞপুরোহিত ছিলেন—তিনিও দত্ত মহাশয়ের সহিত আসিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন। মজিলপুর গ্রামখানি শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশাবলী দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকেতু দত্তের সঙ্গে যে সকল ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিখ্যাত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষও একজন। মজিলপুর গ্রামখানি বলিতে গেলে এই চন্দ্রকেতু দত্তের পরিবার পরিজন এবং তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে। সুতরাং মজিলপুরের ইতিহাসের সহিত চন্দ্রকেতু দত্ত ও শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার নাম চির গ্রথিত। এই উভয় বংশের কীর্ত্তিকলাপে মজিলপুরের ইতিহাস পূর্ণ।

মজিলপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম,—ইহার কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। পর্টুগীজগণ এই পথে এদেশে আসিয়াছিলেন কি না জানা যায় না, তবে পর্টুগীজদিগের যাত্রা বিবরণে "ময়দা" নামে একস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। বাস্তবিক মজিলপুরের উত্তর পারে আজিও "ময়দা" নামে এক গ্রাম আছে। শুনিতে পাওয়া যায় প্রাচীন কালে তথায় বন্দর ছিল। একথা বোধ হয় উপন্যাসের ন্যায় অলীক কাহিনী নয়,

কারণ এই অঞ্চলে লাঙ্গল দিবার সময় মাটির নীচে ভগ্ন জাহাজ, বোট ইত্যাদি জলযানের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন জলপথের সন্নিকটেই যে এই অঞ্চলের বসতি ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় যশোহর হইতে জলপথে সুন্দরবনের ভিতর দিয়া চন্দ্রকেতু দত্ত এখানে আসিয়া থাকিবেন। চন্দ্রকেতু দত্তের সজ্জপুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা হইতে বংশ পরম্পরায় এই অঞ্চল দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণই যজন, যাজন, ও সংস্কৃতের চর্চা লইয়াই থাকিতেন। ইঁহারা কদাচ রাজসেবা করিতেন। সুতরাং চির দরিদ্র হইয়াও ইঁহারা আত্মসম্মানে পূর্ণ হইয়া থাকিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা যশোহর হইতে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্ববঙ্গের লোক নহেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিক নামটিতে তাঁহার দক্ষিণ দেশ হইতে আগমনের ইতিহাস নিহিত আছে। কিন্তু এ দক্ষিণ দেশ উৎকল কি মাদ্রাজ তাহা ঠিক বলা যায় না। বেদগান করাই একসময় ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ম্ম ছিল,- উদ্গাতা অর্থাৎ যিনি বেদগান করেন। অতএব "উদগাতা" উপাধিধারী বৈদিক ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিতেই হইবে। বৈদিক ঋত্বিকগণ—হোতা, পোতা, অর্ব্বযু ও উদ্গাতা এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। দাক্ষিণাত্যে তেলঙ্গ ও দ্রাবিড় দেশে এখনও অনেক সামবেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতাও সামবেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সে দেশে এখনও বৈদিক প্রণালীতে হোমাদির ব্যবস্থা আছে, সে দেশে আজিও বৈদিক ব্রাহ্মণের অপ্রতুল নাই। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না জানিনা। তবে মজিলপুরে শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশাবলীর মধ্যে এইরূপ একটা প্রবাদ আছে যে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কেহ উড়িষ্যার যাজপুর হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

বাৎস্য গোত্রীয় সামবেদী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মজিলপুর গ্রাম ছাইয়া ফেলিয়াছেন। মজিলপুরের ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রচর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এক মজিলপুর গ্রামে ১০/১২ খানি টোল, চতুষ্পাঠি ছিল। এই গ্রামের ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মজিলপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত চর্চ্চার খ্যাতি বহুদূর প্রসারিত হইয়াছিল। একদা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ এই গ্রামে আসিয়া স্থানীয় পণ্ডিতদিগের সহিত উপর্য্যুপরি তিন চারি দিন শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হন যে মজিলপুরের নাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ রাখেন। বাস্তবিক মজিলপুর গ্রাম একসময় সংস্কৃত চর্চ্চার পীঠস্থান ছিল। ইংরাজি শিক্ষাই ধনবানের একমাত্র পথ হইলেও ইঁহারা সব চিরদিনই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা লইয়া গৌরবান্বিত চির-দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়াছেন। কদাচ কেহ রাজসেবা করিতেন না। এই যে মজিলপুরের টোল চতুষ্পাঠির কথা বলিলাম, ইহার মধ্যে শিবনাথের প্রতিপালক রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের একটি টোলা ছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার যোগ্য বংশধর।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশের ইতিহাস দিবার পূর্ব্বে মজিলপুরের দত্ত জমিদারদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা নিতান্ত আবশ্যক। একসময় মজিলপুর গ্রামের সমুদয় উন্নতির মূলে এই জমিদারগণ ছিলেন, ইঁহারাই একসময় মজিলপুরের রাজা ছিলেন, গ্রামবাসী সকলের শুভাশুভ-ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। ইঁহারা কাছারি করিয়া গ্রামের সকল বিষয় নিষ্পত্তি করিতেন। বাস্তবিকই জমিদারবাবুদিগের সহিত মজিলপুরের ইতিহাস গ্রথিত। মজিলপুর ত আর প্রাচীন স্থান নয়—দত্তদিগের ইতিহাসই ইহার ইতিহাস—তবে ইংরাজদিগের এদেশে আগমনের বহু পূর্ব্বে মজিলপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার চৌরঙ্গীতে যখন একসময় বাঘ

বেড়াইত, তখন মজিলপুরে যে এত বাঘের উপদ্রব ছিল—তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কলিকাতা অপেক্ষা মজিলপুর গ্রাম যে একসময় সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শাস্ত্রচর্চ্চায় মুখরিত এবং পণ্ডিতগণের আবাসভূমি ছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। নচেৎ ক্ষুদ্র একখানি গ্রামে ১০/১২ খানি টোল চতুষ্পাঠি থাকা কি প্রকারে সম্ভব ছিল? ইংরাজগণ কলিকাতায় যখন রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখনও দত্ত জমিদারগণ রাজশক্তি পরিচালন করিয়া মজিলপুর গ্রামবাসীদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা রূপে বিরাজ করিতেন। তাহারাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগের প্রতিপালক ছিলেন। ক্রমে ইংরাজের রাজ্য দৃঢ়মূল হইলে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইল। তখন মজিলপুরের ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে সংস্কৃত চর্চ্চা তাঁহাদিগকে দারিদ্র্যের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তবু এমনি সংস্কার যে বহুদিন পর্যন্ত রাজসেবা এবং ইংরাজি শিক্ষার প্রতি মজিলপুরের ব্রাহ্মণ সমাজের দারুণ অশ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিল। শিবনাথের পিতাই সেকালে জ্ঞাতি-বর্গের মধ্যে প্রথম রাজসেবা করেন, সেইজন্য তাঁহাকে নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত মজিলপুরের ব্রাহ্মণসমাজে পুরাতন বিধি প্রবল ছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শিক্ষা বিষয়ে নবযুগের সূচনা হইয়াছে। বিশ বৎসরের মধ্যে এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হইল যে ইংরাজি শিক্ষা ব্যতীত এ দেশবাসীর আর কোন প্রকার উন্নতির আশা নাই। ১৮৪৫ সালে বঙ্গদেশের নানা স্থানে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় অনেকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—সেই সালে মজিলপুরেও একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বলিতে গেলে সেই সময় হইতেই ক্ষুদ্র মজিলপুর গ্রামে নবালোক প্রবিষ্ট হয়। হালিসহরের শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক ছিলেন,—তিনি ছাত্রবৃন্দের অন্তরে জ্ঞান-স্পৃহা ও চিন্তাশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য "বিদ্যাবিলাসিনী" নামে এক সভা স্থাপন করেন। সেই সময়ে ব্রজনাথ দত্ত নামে একজন বিদ্যোৎসাহী ভদ্রলোক মজিলপুর গ্রামে ছিলেন, তিনিও ছাত্রবৃন্দের অন্তরে জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। ব্রজনাথ দত্ত 'প্রেমতরঙ্গিনী", "সত্যধর্ম্ম", "নিত্যকর্ম্ম" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ব্রজনাথ দত্তের পুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত নব প্রতিষ্ঠিত হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়ের অতি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় গ্রন্থরচয়িতা ছিলেন। তাঁহার রচিত দুখানি পুস্তক "লুক্রেশিয়া উপাখ্যান" ও "সঙ্গীত রত্নাকর" বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎকালে শিবকৃষ্ণ দত্তের ন্যায় সাধু চরিত্রের যুবা মজিলপুর গ্রামে আর ছিল না। শিবকৃষ্ণ দত্তের জ্ঞাতি ভ্রাতা জমিদার দত্ত বংশের হরিদাস দত্ত মজিলপুর গ্রামে যুবকদিগের ভিতর জ্ঞান ও নীতি প্রচারের জন্য উৎসাহী হইয়াছিলেন। হরিদাস দত্ত মহাশয় বিদ্যাবিলাসিনী সভার সভাপতি ও শিবকৃষ্ণ দত্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। সভার একটি পুস্তকাগার ছিল, তাহাতে সেই সময়কার সকল উৎকৃষ্ট পুস্তক ও সংবাদপত্র গৃহীত হইত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা প্রভৃতি এই সভায় শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা হইত। ভবানীপুরের "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী" সভার কাগজ পত্রাদিও এই সভায় পঠিত হইত।

এই প্রকারে মজিলপুর গ্রামে ধীরে ধীরে স্বাধীন চিন্তার ভাব প্রবেশ করিতে লাগিল। ১৮৫৪ সালে বিদ্যাবিলাসিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। সেই অধিবেশনে শিবকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় সমাজ সংস্কার বিষয়ে একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেন এবং সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে জয়নগরনিবাসী কলাবৎ মতিলাল রাজা রামমোহন রায়ের রচিত দুই একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করেন।

পরদিন গ্রামে হুলুস্থুলে পড়িয়া গেল। গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিতে লাগিলেন যে—"ছেলেরা ব্রহ্ম সভা করিয়াছে।" জমিদারবাবুরাও ভীত হইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে এই সভায় যেন আর কেহ না যায়। কিন্তু সভার উদ্যোগী যুবকবৃন্দ এইরূপে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহারা আরও উৎসাহের সহিত সকল প্রকার সাধু কার্য্যে ব্রতী হইলেন। জমিদার বংশের হরিদাস দত্ত এই সময় মজিলপুরের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। পল্লীগ্রামের পথঘাট হইতে দেশের যুবকদিগের চরিত্র পর্য্যন্ত সংস্কার করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। সকল বিষয়েই তাঁহার উৎসাহ ছিল—এমন কি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যও ব্যায়াম চর্চ্চার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার জন্যও উৎসাহী হইয়াছিলেন।

হরিদাস দত্তের সেই সময়কার উন্নত জীবন চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কি পরিবর্ত্তনময় এই সংসার। শুনিতে পাওয়া যায়, হরিদাস দত্তের জীবনে পরে এই সকল ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মজিলপুরের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথপ্রদর্শক ব্রজনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণ দত্তই বলিতে গেলে মজিলপুর গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া যান। তিনিই উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী করেন। কিন্তু কি পরিতাপের কথা—শিবকৃষ্ণ দত্ত নিজেই পরে পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রজনাথ দত্তের এত গুণগ্রাম থাকিলেও তিনি অত্যন্ত সিদ্ধিসেবী ছিলেন। সর্ব্বদাই সিদ্ধি খাইতেন, বোধ হয় তাহারই ফলে তাঁহার কয়েকটি সন্তান পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। যে দুই ব্যক্তি মজিলপুরের উন্নতির জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনের এইরূপ অতি শোচনীয় পরিণাম হইল। হরিনাথ দত্ত মহাশয় মজিলপুরের উন্নতিকল্পে কি না করিয়াছেন? তাঁহার চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে মজিলপুরে এক ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় হরিনাথ দত্ত ও শিবকৃষ্ণ দত্ত এই দুইজনে অভয়াচরণ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরনাথ মিত্র প্রভৃতি স্থানীয় যুবকদিগকে লইয়া তাহাদিগের বাগানবাটীতে গোপনে উপাসনা এবং ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিতেন। যে উমেশচন্দ্র দত্ত চরিত্রগুণে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, শিবকৃষ্ণ দত্ত ও হরিনাথ দত্তই তাঁহার জীবনের উন্নতির মূল। হরিনাথ দত্তের চেষ্টায় গ্রামে যে ইংরাজি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা আড়াই বৎসর পরেই উঠিয়া যায়। উমেশচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়টি উঠিয়া গেলে তিনি ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন এবং সেখান হইতে ১৮৫৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইয়াছিলেন। মজিলপুর গ্রামে সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে অভয়াচরণ, উমেশচন্দ্র ব্যতীত জমিদারবংশীয় কালীনাথ দত্ত প্রভৃতিও ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। এই সকল যুবকদিগের বেশ একটি ঘন নিবিষ্ট দল ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই গভীর তত্ত্ব, গভীর চিন্তা এবং সাধু কার্য্য লইয়া থাকিতেন। শিবকৃষ্ণ দত্ত পথপ্রদর্শক ও সকলের নেতা ছিলেন। মজিলপুরের যুবকবৃন্দ কিছুদিন বঙ্গহিতার্থিনী নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শিবকৃষ্ণ দত্ত ছিলেন ইহার সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন সহকারী সম্পাদক। ১৮৬২ সালের স্থানীয় ব্রাহ্ম যুবক কালীনাথ দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। কিরূপে এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল এখানে তাহা বোধ হয় বর্ণন করা যাইতে পারে। ১৮৬২ সালে ভাদ্র মাসে কালীনাথ দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইল। উমেশচন্দ্র এবং কালীনাথ পূর্ব্বে সংকল্প করিয়া-

ছিলেন যে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সকল প্রকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। কালীনাথের জননী শুনিলেন যে কালীনাথ পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে বসিলেন। কালীনাথ গ্রামের আত্মীয় স্বজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন হরনাথ বসু ভবানীপুরে থাকিতেন। তাহাকে সংবাদ দিলেন যে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া শ্রাদ্ধের সময় দেশে আসিতে হইবে এবং মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ পিতৃশ্রাদ্ধ যে পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন সেই মুদ্রিত পদ্ধতিখানি পাঠাইয়া দিতে হইবে। তখনকার দিনে জমিদারবাবুদিগের ভবানীপুরের বাটী হইতে মজিলপুরে পেয়াদার ডাক যাইত। মজিলপুরে ভদ্রলোকেরা সেই ডাকে চিঠিপত্র পাঠাইতেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন হরনাথবাবু পেয়াদার ডাকে একখানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি পাঠাইয়া দিলেন। ডাক জমিদারবাবুদিগের কাছারিতে পৌঁছিলে তাঁরা হরনাথবাবুর প্রেরিত পত্র ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি খুলিয়া পড়িলেন। এখন আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে এই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবে এবং তাঁহারা গ্রামের যত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহাদিগকে ডাকিয়া এই অনুষ্ঠানে যাইতে নিষেধ করিলেন। উমেশবাবুরা কয় ভ্রাতা [illegible] পাল ভট্টাচার্য্য বারাসতের পণ্ডিত রজনাথ প্রভৃতি দুই চারিজন লোক শ্রাদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে শালতি করিয়া কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রাহ্ম উপস্থিত হইলেন। এদিকে হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত পথে ঘাটে জটলা আন্দোলন এবং চারিদিকে ছিঃছিঃ রব। কালীনাথের জননী দুঃখে মরিয়া গেলেন জমিদারবাবুরা ব্রাহ্মদিগের উপর খড়্গহস্ত হইলেন—এক

* এইখানে জমিদারবাবুদের বংশ পরিচয় দেওয়া হইল ঃ—

মজিলপুরের দত্ত জমিদারদিগের বংশলতিকা।

(১) চন্দ্রকেতু দত্ত
|
(২) রমানাথ দত্ত
|
(৩) জয়রাম দত্ত
|
(৪) রামচন্দ্র দত্ত
|
(৫) হরিনারায়ণ দত্ত
|
(৬) রাধাকৃষ্ণ দত্ত
|
(৭) কালিদাস দত্ত
|
(৮) হরিদাস দত্ত

(৯) উদয়কৃষ্ণ, বিপিনকৃষ্ণ, বিনয়কৃষ্ণ, রমণকৃষ্ণ, অময়কৃষ্ণ

(১০) বীরেন্দ্রকৃষ্ণ (বিপিনকৃষ্ণের পুত্র)

বিনয়কৃষ্ণ — সুধীর, সুনীল, সুরাজ, সুদেব

কি শ্রাদ্ধের যে দোকানে মিঠাইয়ের ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল সেই দোকানীকেও মিঠাই দিতে নিষেধ করিলেন। যাহা হউক নানা প্রতিকূলতা স্বত্ত্বেও কালীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু তখন হইতেই ব্রাহ্মদিগের উপর রীতিমত নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। ভাদ্র মাসে এই ঘটনা হয়।

কার্ত্তিক মাসে উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মদিগের আর এক নিষ্ঠুর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধা পিতামহী গতাসু হইলেন। উমেশচন্দ্রের অগ্রজ অভয়াচরণ ও উমেশচন্দ্র ব্যতীত তখন আর কেহ ছিলেন না। কালী-নাথও কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। আত্মীয়স্বজনগণ একঘরে হইয়াছেন বলিয়া কেহ মৃতের সৎকার করিতে আসিলেন না। অগত্যা দুই ভাই শব বহন করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যকে কাষ্ঠ এবং কুড়ালি লইয়া পশ্চাতে আসিতে বলিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন—কাঠ আর পৌঁছায় না। তখন ভৃত্য আসিয়া বলিল বাবুদের হুকুম, কাঠ কুড়ালি লইয়া কেহ মৃতের সৎকারে সাহায্য করিতে পারিবে না। উমেশচন্দ্র জ্যেষ্ঠকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া থানার দারোগা নারায়ণদীনের নিকট উপস্থিত হইয়া বিপদের কথা জানাইলেন। দারোগা মহাশয় অত্যন্ত খাঁটি লোক ছিলেন। তিনি ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া দত্তবাবুদিগের কাছারিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কাহার প্ররোচনায় উমেশচন্দ্রের প্রতি এই প্রকার অত্যাচার হইতেছে—এ সকল বে-আইনি কাজ কেহ করিলে সাজা পাইতে হইবে। সামান্য একজন দারোগার কথায় আশ্চর্য্য ফল ফলিল—গাড়ীরে কাঠ কুড়ালি সকলই শ্মশানে উপস্থিত হইল। সেদিনকার মত উমেশচন্দ্ররা দুই ভাই পিতামহীর সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগকে একঘরে হইয়া গ্রামে বাস করিতে হইল। অভয়াচরণ এবং উমেশচন্দ্র মজিলপুরে বসিয়াই ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া পিতামহীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

উমেশচন্দ্রের পিতামহ ষষ্ঠীচরণ দত্ত জমিদারদিগের নায়েবী করিতেন। একবার জমিদারবাবুদিগের কাছারী রক্ষা করিতে গিয়া ডাকাতের হাতে পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ যে দশ-বিঘা উৎকৃষ্ট ধানের জমি খোরাকীরূপে পুরস্কার পাইয়াছিলেন, উমেশচন্দ্রেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে জমিদারবাবুরা তাহা পুনর্গ্রহণ করেন।

মজিলপুর বালিকাবিদ্যালয় ১৮৫৮ সালে মজিলপুর গ্রামে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি যখন স্থাপিত হয় তখন গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। শিবনাথের পিতা কিন্তু প্রথম হইতেই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার কন্যা ঠাকুরদাসী, এবং কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। যখন হইতে ব্রাহ্ম যুবকগণ এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইলেন তখন হইতে জমিদারবাবুরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন যদিও একসময় এই জমিদারবংশীয় হরিদাস দত্তই স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। পণ্ডিত কালীধন ভট্টাচার্য্য আমৃত্যু এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্ম যুবকগণ হিতৈষিণী সভা স্থাপন করিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। যখন উমেশচন্দ্র এক প্রতিবেশিনী আত্মীয়ার নিকট হইতে একখণ্ড জমি লইয়া স্কুলের বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করিলেন, সেই সময় জমিদারবাবুদিগের দুইজন ভৃত্য—শুকরো মুসলমান ও তাহার পুত্র সেই জমি তাহাদিগের পাট্টা লওয়া বলিয়া নালিশ করিল। বারুইপুরের আদালতে এই মোকদ্দমা উঠিল। এই মিথ্যা মোকদ্দমা অনেক চেষ্টা আয়োজন সত্ত্বেও টেঁকিল না এবং শুকরো মুসলমানের মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়নের জন্য তিন

মাস সশ্রম কারাবাস হইল। তখন শিবনাথ ভবানীপুরের বাসা হইতে প্রতি রবিবারে শুকরো মুসলমানকে জেলে মিঠাই খাওয়াইতে যাইতেন। যাহা হউক পরে জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ দত্তের আনুকূল্যে মজিলপুর বালিকা বিদ্যালয়টি জমিদারবাবুদেব এক বাটীতে স্থানান্তরিত হইল এবং তখন হইতে জমিদারগণই বালিকা বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালক হইলেন। অদ্যাবধি বালিকা বিদ্যালয়টি জমিদার-বাবুদিগের বাটীতেই আছে।

শিবনাথ ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য আগমন করেন। তিনি ছুটীতে যখন দেশে যাইতেন, তখন বিদ্যাবিলাসিনী সভায় এবং তৎপরে হিতৈষিণী সভায় গমন করিতেন ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদিগেব হিতৈষিণী সভার উপর দারুণ বিরাগ ছিল। তখনকার দিনে পথেঘাটে কেহ ব্রাহ্ম-যুবকদিগের সহিত কথা কহিত না, কিন্তু শিবনাথের পিতা তেজস্বী হরানন্দ পুত্রকে কখনও ব্রাহ্মযুবকদিগের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেন না। ১৮৬৫ সাল হইতে শিবনাথের ধর্ম্মভাব প্রবল হয়—তখন উমেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীননাথের সঙ্গে শ্মশানে গিয়া উপাসনা করিতেন এবং জমিদার যোগেন্দ্রনাথ দত্তের বৈঠকখানা বাড়ীতে প্রেতাত্মা আহ্বান করিতেন।

১৮৬৩ সাল হইতে মজিলপুর গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ম্লান হইয়া আসে। কালীনাথ, উমেশচন্দ্র, হরনাথ প্রভৃতি কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র চলিয়া যান এবং সংস্কারকদিগের নেতা শিবকৃষ্ণ দত্ত পাগল হইয়া দেশে রহিয়া গেলেন এবং কলিকাতাই মজিলপুরের ব্রাহ্মদিগের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া পড়িল।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

বংশপরিচয়—পিতামাতা

পূর্ব্বে অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশাবলীর দ্বারা মজিলপুর গ্রামখানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখানে শিবনাথের পিতৃকুলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। এই স্থানে যে বংশলতিকা* সন্নিবিষ্ট হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে শিবনাথ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা হইতে নবম পুরুষ পরে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার পুত্র রাজেন্দ্র "ভট্টাচার্য" উপাধি লাভ করেন। তখন হইতে "উদ্গাতা" উপাধির পরিবর্ত্তে ইঁহারা "ভট্টাচার্য্য" নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। রাজেন্দ্রের পুত্র রামেশ্বর

---

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বংশলতিকা।

(১) শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা→(২) রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য→(৩) রামেশ্বর বা থাউ বিদ্যালঙ্কার →(৪) রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য→(৫) সীতারাম ভট্টাচার্য্য—সুভদ্রা দেবী→(৬) রাধানাথ ভট্টাচার্য্য—মনোরমা দেবী→(৭) রামজয় ন্যায়ালঙ্কার—সুশীলা দেবী→(৮) রামকুমার ভট্টাচার্য্য—লক্ষ্মী দেবী→(৯) হরানন্দ ভট্টাচার্য্য—গোলোকমণি দেবী→(১০) শিবনাথ শাস্ত্রী—প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী দেবী→(১১) প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য—অবন্তী দেবী→(১২) শ্রীঅমর নাথ ভট্টাচার্য্য।

পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের জন্য বিদ্যালঙ্কার উপাধি লাভ করেন। লোকে তাঁহাকে "খাউ বিদ্যালঙ্কার" বলিয়া ডাকিত। শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার রামেশ্বরের প্রপৌত্র রাধানাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র। শিবনাথের জন্মের বহু পূর্ব্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও মজিলপুর গ্রামে শিবনাথের স্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ১০/১২ খানি টোল ও চতুষ্পাঠি ছিল। তন্মধ্যে শিবনাথের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের একটি। জমিদার দত্তগণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতার বংশজ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারকে কেবল কুলপুরোহিত জ্ঞানে নয়, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্যও তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিতেন।

রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র রামকুমার ভট্টাচার্য্য স্বগ্রামেই কাম্যায়ণ গোত্রীয় পদ-মান-কুল-শীলসম্পন্ন পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষ্মী দেবী ছিল। ইনি নামে লক্ষ্মী দেবী ছিলেন বটে, কিন্তু অতি প্রতাপশালিনী তেজস্বিনী নারী ছিলেন। তাঁহার ভয়ে কেবল পরিবার পরিজন নয়, গ্রামের চোর ডাকাত পর্য্যন্ত কাঁপিত। তিনি দেখিতে গৌরাঙ্গী ও তন্বী ছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধন-প্রকৃতিসম্পন্না ও কার্য্যকুশলা ছিলেন। ইঁহার পতি রামকুমার ভট্টাচার্য্য দীর্ঘা-বয়ব, শ্যামাঙ্গ ধর্ম্মভীরু, দয়ালু ও শান্ত স্বভাব পুরুষ ছিলেন—পত্নীর ভয়ে সর্ব্বদাই সংকুচিত হইয়া থাকিতেন। শিবনাথের পিতামহ পিতামহী সম্বন্ধে পরিবার মধ্যে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মী দেবী একবার কি করিয়া চোর ধরিয়াদিলেন সেই গল্প করিতেছি :—

সেকালের মাটির ঘরে সহজেই চোরে সিঁদ কাটিত। রাত্রে একই ঘরে ৩।৪ বার সিঁদ কাটার গল্পও শুনিয়াছি। একবার চোরে সিঁদ কাটিয়া লক্ষ্মী দেবীর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং লক্ষ্মী দেবীর গলার অলংকার খুলিবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়ে লক্ষ্মী দেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং চোরকে শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন ও স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন "ও মন্দ ওঠ, আমি চোর ধরেছি"—ওদিকে তাঁর স্বামী চোরের নাম শুনিয়াই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলেন; তিনি টু শব্দ করিলেন না। লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে অনেক টানাটানি ধস্তাধস্তি করিয়া চোর হাত ছাড়াইয়া পলাইল। তিনি যে এতক্ষণ চোরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট আর কতক্ষণ ধরিয়া রাখিবেন ? চোর ত পলাইয়া গেল, তখন পতির উপর লক্ষ্মী দেবী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁকে শতবার ধিক্কার দিলেন। কিন্তু সেই অবধি আর কখনও তাঁর ঘরে চোরে সিঁদ দেয় নাই। এই লক্ষ্মী দেবী আর একবার বাঘ তাড়াইয়াছিলেন। তখনকার দিনে মজিলপুর গ্রামে বড় বাঘের উপদ্রব ছিল, সেইজন্য এক এক পাড়া বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। তাহাতে একটি মাত্র সদর দ্বার—তাহা বেলা থাকিতেই বন্ধ করা হইত, তখন পাড়ার সকলে নিশ্চিন্ত মনে কাজ কর্ম্ম করিত। একবার অসাবধানতাবশতঃ সদর দ্বার যথাসময়ে বন্ধ করা হয় নাই বলিয়া পাড়ার মধ্যে বাঘ আসিয়াছিল। শিবনাথের পিতামহ সায়ংসন্ধ্যায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় পাড়ায় 'বাঘ' "বাঘ" রব পড়িয়া গেল। তিনি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য যেমন মুখ বাড়াইবেন, সত্যই কানাচে বাঘ। একেবারে বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি!! তাঁর কণ্ঠস্বর এড়াইয়া গেল, ভীতকম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন "সত্যি যে বাঘ আমার নিলে।" অমনি লক্ষ্মীঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন "পিছন ফিরোনা, চোখোচোখি চেয়ে থাক"—এই বলিয়া এক গোছা জ্বলন্ত কাঠ লইয়া বাঘ মহাশয়ের মুখাগ্নি করিতে গেলেন। বাঘ এই দুর্যোগ দেখিয়া দৌড়। স্বামীকে বাঘের মুখ হইতে লক্ষ্মী দেবী উদ্ধার করিলেন। লোকে তাঁকে "বাঘ-

তাড়ানী" "চোরধরণী" বলিত—তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু তাঁর পতি ঠিক তাহার বিপরীত প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর মত পরদুঃখকাতর দয়ালু ব্যক্তি বড় দেখা যায় না। তাঁহার জননী অর্থাৎ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের গৃহিণী পুত্রের মতই নিরীহ ও দয়াময়ী ছিলেন। মাতাপুত্রে সকল বিষয়ে একমত—আর উভয়েই লক্ষ্মী দেবীর ভয়ে সন্ত্রস্থ থাকিতেন। পুত্র স্নান করিতে গিয়া অভুক্ত কাহাকে দেখিয়া আসিলেন, আসিয়া চুপি চুপি মাকে বলিলেন, "মা, একজন গরীব অভুক্ত আছে, তাকে আমার ভাত কটী দিই—আমরা মায়ে পোয়ে একজনের ভাত দুজনে খাবো"। যাহাতে পত্নী এ সকল দয়া দাক্ষিণ্যের কথা কিছুমাত্র জানিতে না পারেন, সেইজন্য অনেক উপায় করিতেন। একদিন শিবনাথের বড় পিসি দোলায় বসিয়া আছেন এমন সময় তাঁর পিতা গামছা পরিয়া স্নানান্তে ফিরিয়া আসিলেন। পিতাকে দেখিয়াই কন্যা বলিয়া উঠিলেন—'বাবা কাপড় কোথায় গেল, গামছা পরে এসেছ যে। পিতা কাতরভাবে কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"হে্যা মা চুপ কর, চেঁচিয়ো না, তোমার মা যেন শোনে না আহা একজন বড় দুঃখী তার কাপড় নেই তাকে দিয়ে এসেছি। শিবনাথের পিতামহ পিতামহী এই প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রবল ঝড় ও বন্যা হইয়া বংগদেশের দক্ষিণ অঞ্চল ভাসিয়া যায়। সেই সময় হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বন্যার জল সরিয়া গেলে ভীষণ ওলাউঠা রোগ দেখা দিল। সেই প্রথম সে দেশের লোক ওলাওঠার নাম শুনিল। ওলাউঠায় দেশ ছারখার হইয়া গেল। এই বিষম রোগে দশ দিনের মধ্যে শিবনাথের পিতামহ, পিতামহী ও প্রপিতামহী মারা গেলেন। তখন শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে। বৃদ্ধ রামজয় ন্যায়ালংকারের উপর তখন নাতি নাতনিদিগকে মানুষ করিবার ভার পড়িল। শিবনাথের বড়পিসি আনন্দময়ীর তখন গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বালক হরানন্দ ব্যতীত, গণেশজননী নামে আর এক কন্যা ও রামতারণ নামে এক শিশু বালক রাখিয়া পিতামাতা গত হন। বৃদ্ধ রামজয় ন্যায়ালংকার এই সকল মাতৃপিতৃহীন শিশুসন্তানদিগকে লইয়া সংসার পাতিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে শিবনাথের কাকা রামতারণের মৃত্যু হইল। তখন হরানন্দ ভট্টাচার্য্যই একমাত্র বংশধর হইয়া ঠাকুরদাদার পরম আদরের পাত্র হইলেন। কিন্তু লক্ষ্মী দেবীর গর্ভের সন্তান হরানন্দ বাল্যকাল হইতেই জননীর ন্যায় প্রচন্ড ক্রোধন প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ পিতামহের এই আদরের নাতির কত দৌরাত্ম্যই সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়।

অনুমান ১৮২৭ সালে হরানন্দের জন্ম হয়। তাঁহার দশ বৎসর বয়সের সময়েই কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণস্থিত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গোলোকমণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতি শৈশবকালেই এই কন্যা কুলীন বৈদিক সমাজের প্রথানুসারে হরানন্দের বাগ্‌দত্তা ছিল। ক্রমে হরানন্দের নববধূ মজিলপুরে শ্বশুর ঘর করিতে আসিলেন। শ্বশুর শাশুড়ী নাই, গৃহে বড় ননদ গৃহিণী, বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর অন্ধ ও বধির হইয়া দ্বিতীয় বাল্যদশা যাপন করিতেছেন, ঘরে আর কেহ নাই। বালিকাবধূ গোলোকমণি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও কার্য্যপটু ছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই ননদের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব জন্মিয়া গৃহে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইল। এই অশান্তির ফলে শিবনাথের শৈশব জীবন ঘোর সংকটময় হইয়াছিল। তিনি আত্মজীবনীতে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িয়া বিবাহের পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়িতে লাগিলেন। কলেজ হইতে বাহির হইয়া

মজিলপুরে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পণ্ডিতি কর্ম্ম লইয়া দেশে বাস করিতেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য স্বগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রথমে রাজসেবা করেন; তৎপূর্ব্বে কেহ কখনও রাজকার্য্য করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম লওয়াতেও জ্ঞাতিগণের মধ্যে তাঁহার বিলক্ষণ নিন্দা হয়।

গবর্ণমেণ্টের চাকরি ভিন্ন আর এক কারণে জ্ঞাতিগণের ভিতর তাঁর "সাহেব" বলিয়া নিন্দা ছিল—পায়ে চটি এবং গায়ে গেঞ্জি দিতেন বলিয়া তাঁর সাহেবীয়ানার চূড়ান্ত হইয়াছিল। সেকাল আর একালে কি প্রভেদ! হরানন্দ ভট্টাচার্য্য দেখিতে গৌরবর্ণ এবং খর্ব্বাকার ও কৃশ ছিলেন—মূর্ত্তি দেখিলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ অগ্নি-শর্ম্মা বলিয়া বোধ হইত। যেন জ্বলন্ত হুতাশন—প্রতি কথায় প্রতি পাদক্ষেপে তাঁর গর্ব্ব ও ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহাকেও ভয় করিতেন না। রাগিলে জ্ঞান থাকিত না, ঘরে আগুন দিতেন, সমুদায় জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেন—যেন সৃষ্টিসংহার করিবার জন্য ভৈরবমূর্ত্তি ধারণ করিতেন। গ্রামের আপামর সাধারণ লোক, নৌকার দাড়ী মাঝি, ইতর ভদ্র তাঁহাকে "রাগীঠাকুর" বলিয়া জানিত—সহজে কেহ তাঁর ক্রোধে ইন্ধন দিত না। শিবনাথের পিতার সত্যানুরাগ ও ন্যায়নিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। সত্য এবং ন্যায়সঙ্গত বলিয়া যাহা বুঝিতেন, কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে তাহা হইতে একপা হটিতেন না। কথায় কথায় বলিতেন - "... দুনিয়ার কাকেও ডরায় না, শর্ম্মা কালো বশ নয়।" মজিলপুর গ্রামে ১৮৫৮ সালে বালিকা বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়। তখন গ্রামের ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন যুবকদিগের চেষ্টাতেই ইহা স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মরা এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া মজিলপুরের দত্ত জমিদারগণ ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়ান তখন স্বর্গীয় হরনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবনকৃষ্ণ বসু "ডালকুত্তা" লইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া বলিয়া বেড়াইতেন— ভাল চাও ত মেয়ে স্কুলে পাঠিও নহিত কুকুর লেলাইয়া দেব।" কুকুরের ভয়ে লোকে বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইতে স্বীকৃত হইত। প্রথমে জমিদারবাবুদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও মেয়েদের স্কুল বসিয়া গেল। কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী এবং শিবনাথের ভগিনী ঠাকুরদাসী ইহার পূর্ব্বতন ছাত্রীদিগের মধ্যে প্রধান। পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য স্পর্দ্ধাভরে বলিয়া-ছিলেন—"যদি আর কেউ স্কুলে মেয়ে না দেয়, শুধু আমার মেয়ে লইয়া স্কুল চালাবে।" যেখানে প্রতিবাদ, যেখানে বাধা, হরানন্দ শর্ম্মা সেইখানেই বিজয়ী বীরের মত দাঁড়াইতেন। শিবনাথের পিতা বিদ্বান ও সত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। কাব্য-কথায় ও সংস্কৃতগ্রন্থের সমালোচনায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি অতিশয় সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন।—তাঁর রসিকতার আর অন্ত ছিল না। সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যে তাঁর অদম্য উৎসাহ ছিল। পল্লীগ্রামে যখনই অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইত, হরনাথ শর্ম্মা সর্ব্বাগ্রে সেই জ্বলন্ত চালের উপর উঠিতেন, এবং সকলকে জল আনিয়া দিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। কত সময় দেখা গিয়াছে, কোন দুঃখিনী বিধবাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাহার দায় উদ্ধার করিয়াছেন। শিবনাথের পিতার হৃদয়ে লেশ-মাত্র ক্ষুদ্রতা স্থান পাইত না—ক্ষুদ্রতা তিনি তিলমাত্র সহ্য করিতে পারিতেন না। শিবনাথ তাঁহার পিতার উদারতা, সহৃদয়তা, বাক্‌পটুতা, রসিকতা, সত্যপ্রিয়তা, পরোপকারস্পৃহা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন।

হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের সাধুতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার মজিল-পুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময় গরীব লোকের কষ্টের একশেষ দেখিয়া গবর্ণ-মেণ্ট রিলিফ ফণ্ড খোলেন। হরানন্দ শর্ম্মার সত্যপরায়ণতা ও কার্য্যপরায়ণতার

খ্যাতি এতদূর ছিল যে কর্তৃপক্ষগণ নিয়ম করিয়াছিলেন পণ্ডিত হরানন্দের নিকট হইতে সার্টিফিকেট আনিলেই তাহাকে সাহায্য করা হইবে। ইহার কারণ এই ছিল যে হরানন্দ ভট্টাচার্য্য যাহাকে সার্টিফিকেট দিতেন, তার বাড়ী গিয়া তার রান্নাঘরের উনান দেখিয়া আসিয়া তবে সার্টিফিকেট দিতেন। এই সময় হরানন্দ কলিকাতায় চাকরি করিতেন। গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে গিয়াছিলেন। ছুটীর শেষা-শেষি কলিকাতা আসিবার দিন নিকট হইয়াছে, এমন সময় শুনিলেন মজিলপুর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে কোন চাষা লোক সপরিবারে অনাহারে আছে—শুনিয়া নিজের গোলা হইতে দুই পালি চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁটিয়া তাকে দিয়া আসিলেন এবং সেই সংগে বলিলেন, "রবিবার যখন হাটে যাবে আমি তোমাকে সার্টিফিকেট দিব, তুমি সরকারি সাহায্য পাবে।' সেই রবিবারই কলিকাতায় ফিরিবার দিন। পরদিন সোমবার দুই মাস ছুটীর পর স্কুল খুলিবে, অনুপস্থিত হইলে দুই মাসের মাহিনা কাটা যাইবে। এদিকে হরানন্দের মনে নাই যে চাষা লোকটিকে সার্টি-ফিকেট লইবার জন্য সেইদিনই আসিতে বলিয়াছেন। যথাসময় শিবনাথকে সংগে লইয়া শালতি করিয়া যাত্রা করিলেন, শালতি অনেক দূর আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল সেই চাষা লোকটিকে তিনি আসিতে বলিয়াছিলেন। অমনি চীৎকার করিয়া মাঝিদের ডাকিয়া বলিলেন—"বাপু থামা, থামা—শালতি ফেরা—আমার আর যাওয়া হবে না, বাড়ী যেতে হবে—তোদের ভয় নাই আমি তোদের পুরা ভাড়া দিব।" শিবনাথ বলিলেন—"বাবা কাল যে স্কুল খুলিবে, আপনাকে উপস্থিত হতেই হবে।" হরানন্দ বলিলেন—"তা কি হবে—আমার না হয় দুমাসের মাহিনা কাটা যাবে। আর এ লোকটা যে সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাবে। আমি নিজের কথা এখন ভাবতে পারি না—এ গরীবকে কথা দিয়াছি আমায় তার উপায় করতেই হবে।"

হরানন্দের হৃদয়খানা এই প্রকার ছিল। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা কিরূপ ছিল তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—

তখন হরানন্দ মজিলপুরের হার্ডিং স্কুলের হেডপণ্ডিত। একবার স্কুলের ঘর তৈয়ারি হইয়া কিছু বাঁশের খুঁটি বাঁচে। হরানন্দ বাঁশগুলি পুকুরের জলে ডুবাইয়া রাখিয়া কর্তৃপক্ষদিগকে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করেন সেই খুঁটিগুলি কি বিক্রয় করিতে হইবে? অনেক দিন গেল পত্রের আর জবাব আসে না—হরানন্দ সেই বাঁশগুলির কোন উপায় করিতে পারেন না এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে হরানন্দ গৃহের দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন এমন সময় একজন ভদ্রলোক আসিয়া তাঁকে বলিলেন—"পণ্ডিতমশাই, আমি একখানা ঘর করছি। পাকা বাঁশ পাচ্ছি না, আপনার স্কুলের কিছু বাঁশ অমুক পুকুরে ডোবান আছে শুনেছি, যদি দয়া করে আমায় বাঁশগুলি দেন, বড় উপকার হয়, আমি আপনাকে কিছু টাকা ধরে দেব।" হরানন্দ প্রথমে বুঝিতেই পারেন নাই লোকটা কি বলছে। তিনি বলিলেন—"বাপু, সরকারি বাঁশ, আমি তাদের চিঠি লিখেছি, তারা যা হুকুম দেবে তাই হবে।" আবার সেই লোকটি তাঁকে টাকা ধরে দেবার কথা বলিল, তখন হরানন্দ বুঝিতে পারিলেন লোকটা তাঁকে ঘুস দিবার প্রস্তাব করছে। আর কোথায় যায়! হরানন্দ শর্ম্মা সিংহ বিক্রমে হুঁকা ফেলিয়া সেই লোকটার গলা টিপিয়া ধরিলেন —"কি এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমায় টাকা ধরে দিতে চাও চোর! তুমি নিশ্চয় সেই বাঁশ কিছু সরিয়েছ, এখনই থানায় চল"—এমনি ব্যাপার যে হরানন্দের বজ্রমুষ্টি হইতে তাহাকে আর ছাড়ান যায় না। অনেক কষ্টে তবে সে ব্যক্তি সে যাত্রা অব্যাহতি পায়।

জীবনের শেষ দশায় যে কয়টি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ এখানে করিতেছি ঃ—

১৮৯৫ কি ১৮৯৬ সালে যখন শিবনাথ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর লাইব্রেরীতে থাকিতেন তখন একদিন ঘরে আসিয়া দেখেন, হরানন্দ অতি বিষণ্ণভাবে শিবনাথের বিছানায় শুইয়া আছেন। তিনি পিতার মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, আপনার কি হয়েছে এত বিমর্ষ আছেন কেন?'

হরানন্দ— ওরে একটা বড় ক্লেশের কারণ ঘটেছে।"

শিবনাথ—'কি ক্লেশের কারণ?'

হরানন্দ—"আমি ভেবেছিলাম যে এক পয়সাও ধার না রেখে মরব। এতদিন মনে করেছিলাম, বুঝি আমার এক পয়সাও ঋণ নাই। সেদিন হঠাৎ মনে হল যে কলেজে যখন শ্রীশ বিদ্যারত্নের (যিনি প্রথম বিধবা বিবাহ করেন) সঙ্গে পড়তাম, তার কাছ থেকে ৩।৪ দফায় ৪০৲ টাকা ধার করি। কথা ছিল কাজে বসলে ধার শোধ করব: তারপর বিধবা বিবাহের হুজুগে পড়ে শ্রীশ কোথায় গেল—আমি সব ভুলে গেলাম। এখন মনে পড়েছে যেমন করে হোক এই ৪০৲ টাকা শোধ করতে হবে।"

শিবনাথ অনেক অনুসন্ধান করে তাঁর পুত্রের হাতে ৪০৲ টাকা দিয়া একখানি রসিদ লইয়া দেশে পাঠান, তবে হরানন্দের মনে শান্তি হয়। শ্রীশচন্দ্রের পুত্র বলিয়াছিলেন, পঁয়ষট্টি বৎসরের ঋণ এমন করে ঘরে এসে শোধ করবার কথা ত কখন শুনি নাই।

আবার হরানন্দের এক ঋণের কথা মনে পড়ে—২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের ঋণ। একবার মজিলপুরের ছেলেরা গ্রামে একটি লাইব্রেরী করে; তারা হরানন্দ শর্ম্মার হাতে একটি বই-এর তালিকা দিয়া বলে—'পণ্ডিতমশাই, আপনার কোন চেনা দোকান হইতে বইগুলি আনিয়া দেবেন, আমরা টাকাটা পরে দেব।" হরানন্দ তাঁর এক বন্ধুর দোকান হতে ১০৲ টাকার বই কিনিয়া ছেলেদের হাতে দিলেন। তারা আজ কাল করিয়া ১০টি টাকা দিল না ক্রমে হরানন্দও তাগাদা করিতে ভুলিয়া গেলেন। আর বই-এর দশ টাকার কথা তাঁর মনে রহিল না। বৃদ্ধ বয়সে ঋণের চিন্তা করিতে করিতে এই দোকানে ১০৲ টাকা ঋণের কথা মনে পড়িল। শিবনাথের নিকট ১০টি টাকা পাঠাইয়া সেই লোকের যদি কেহ থাকে তাহাকে দিতে বলিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর শিবনাথ পুস্তকবিক্রেতার পুত্রকে এই ১০টি টাকা দিয়া রসিদখানি হরানন্দকে পাঠাইয়া দেন।

আবার ঋণের চিন্তা করিতে করিতে তাঁর মনে পড়িল ছাত্রাবস্থাতে ভবানীপুরে এক কাপড়ের দোকান হতে ৫৲ টাকার কাপড় ধারে লইয়াছিলেন, সে টাকা দেওয়া হয় নাই। আবার শিবনাথের উপর হুকুম আসিল, অমুক স্থানে অমুকের দোকানে ৫৲ টাকা দিয়ে এস। এবারে আর দোকান বা দোকানদার কিছুরই সন্ধান মিলিল না। শিবনাথ অগত্যা ৫৲ টাকার কাপড় কিনিয়া দেশে পিতার নিকট পাঠাইলেন। হরানন্দ সেই কাপড় গরীবদের দিয়া তবে প্রাণে শান্তি পাইলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে এই সকল চিন্তায় বিব্রত থাকিতেন। আর একটি ঘটনা বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এখানে তাহার উল্লেখ করি ঃ—

তখন হরানন্দ স্বগ্রামে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করেন। একবার মাহিনার বিল ইনসপেক্টরের স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙ্গাইবার জন্য কলিকাতায় আসেন; সেই সময় গ্রামে একজন সার্কেল পণ্ডিত নিজের বিলখানি তাঁর হাতে দিয়া বলিল—"পণ্ডিতমশাই, অনুগ্রহ করে আমার বিলখানিও স্বাক্ষর করাইয়া ভাঙ্গাইয়া আনিবেন।"

এদিকে কলিকাতায় আসিয়া বিল ভাঙ্গাইতে দেরী হইল, ওদিকে পণ্ডিতটি ওলাউঠা হইয়া দেশে মারা গেলেন। ইনসপেক্টরের কাছে পণ্ডিতের বিধবা স্ত্রী একখানি দরখাস্ত পাঠাইলেন যে, তাঁর মৃত পতির মাহিনার টাকা আর কাহাকেও না দিয়া তাঁহাকেই দেওয়া হয়। হরানন্দ পণ্ডিতের বিলখানি দিয়া মাহিনার টাকা লইতে অস্বীকার করিলেন। ইনসপেক্টর অনুরোধ করিলেন—'পণ্ডিত, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, তুমি সেই স্ত্রীলোকের হাতে নিজে এই টাকা বাট দেও, আর কাহারও হাতে দিও না।' অগত্যা হরানন্দ বিধবার টাকা কয়টি লইয়া বাড়ী আসিলেন, আসিয়া শোনেন স্ত্রীলোকটি বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলেন আবার যখন শ্বশুরবাড়ী আসিবে, তখন টাকা দিব। এই মনে করিয়া টাকা কয়টি কাগজে মুড়িয়া বাক্সের এক কোণে রাখিলেন। এক মাস দুই মাস করিয়া বৎসর কাটিল, তারপর আরও অনেক বৎসর গেল আর স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই। ক্রমে হরানন্দ টাকার কথা ভুলিলেন এবং নিজের টাকা ভাবিয়া বাক্সের টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন। ১৫।১৬ বৎসর পরে হঠাৎ এই কথাটি স্মরণ হইল—তখন ১০।১২ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া সেই টাকা কয়টি তাহার হাতে দিয়া আসিলেন।

শিবনাথ পিতার সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরতার কথা তুলিয়া বলিতেন— "এমন বাবার দৃষ্টান্ত যে জন্মাবধি দেখে এসেছে তাকে আর মৌখিক উপদেশ শুনিতে হয় না।" মৌখিক উপদেশকে শিবনাথ অতি তুচ্ছ মনে করিতেন। যে মনস্বিনী রমণী গোলোকমণির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

শিবনাথের জননী গোলোকমণি যেরূপ সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, বার্দ্ধক্যে আমরা তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী ছাড়া আর কোন সৌন্দর্য্যই দেখি নাই। তাঁর পিতৃকুলের সকলেই দীর্ঘকলেবর ছিলেন। তিনিও সাধারণ নারীদিগের মধ্যে অত্যন্ত দীর্ঘকায়া ছিলেন। শিবনাথের জননী গোলোকমণি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। কোন দিনই কোন কার্য্যে বা ধর্ম্ম সাধনায় তাঁর তিলার্দ্ধ শৈথিল্য বা পারিপাট্যের অভাব দেখা যায় নাই। তাঁর সকল কার্য্যেই নিপুণতা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাইত। হরানন্দের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ—সত্যনিষ্ঠা তেজস্বিতা, বদান্যতা—গোলোকমণির চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল—দক্ষতা, সকল কার্য্যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। হরানন্দ লাভ-ক্ষতির গণনাশূন্য ছিলেন অস্থানে ক্রুদ্ধ হইয়া কাজ মাটি করিতেন, অযোগ্যপাত্রে দান করিয়া সহৃদয়তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। গোলোকমণি—যাহা হিত, বিহিত ও লাভজনক, তাহার জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতেন। এই দম্পতির দুজনেই প্রখর ব্যক্তিত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন উভয়েই কর্ত্তৃত্বপরায়ণ, উভয়েই গর্ব্বিত প্রকৃতির—সুতরাং পরিবার মধ্যে নিয়তই দাম্পত্য কলহের অভিনয় চলিত। হরানন্দ স্ত্রৈণ পুরুষকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন—স্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া যে ব্যক্তি চলে সে কাপুরুষ ও হেয়, এই তাঁর বিশ্বাস ছিল, সুতরাং গোলোকমণি যখনই তাঁহার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করাইবার চেষ্টা করিতেন, তখনই তিনি গর্ব্বিত মস্তক আরও উন্নত করিয়া বলিতেন —"তুমি কি আমাকে আজ্ঞাকারী কিঙ্কর পেয়েছ?" গোলোকমণি স্বামীর প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন—অনুরোধে কাজ হয় না, আজ্ঞা করিলে একেবারেই অসাধ্য। তিনি স্বামীর নিকট কাজ আদায় করিবার অশেষ ফন্দী জানিতেন। প্রয়োজন হইলে, তাঁর যুক্তিযুক্ত সুমিষ্ট বাক্য পরম্পরার অন্ত ছিল না। স্বামীকে বুঝাইয়া দিতেন যে তাঁর ইচ্ছামতই কাজ হইবে, কেবল ঔচিত্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, আর তাঁর বড় মনে বাজে এমন কথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কার্য্য সম্পন্ন হইত। বাহ্যতঃ

বোধ হইত স্বামীর ইচ্ছায় কাজ হইল, কিন্তু কার্য্যতঃ গোলোকমণি দেবীর অভিষ্ট পূর্ণ হইত। ঠাকুরমার কার্য্যোদ্ধারের ফন্দী দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। অর্থব্যয় সম্বন্ধে শিবনাথের পিতা মুক্তহস্ত ছিলেন এবং কি ব্যয় করিয়াছেন, তাহা অনেক সময় হিসাব রাখিতেন না। গোলোকমণি দেবী তাঁর বাক্স হইতে মাঝে মাঝে টাকা সরাইতেন, তিনি বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিতেন না, কাজেই অর্থের অনটন উপস্থিত হইত, তখন স্ত্রীর নিকট অভাব জানাইতেন। ঠাকুরমা সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতেন, "পাড়াপড়শীর নিকট সুদে টাকা ধার করিয়া দিতে পারি।" ঠাকুরদাদা শুনিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। তারপর পত্নী একবার পুকুরপাড়ে ঘুরিয়া আসিয়া নিজের বাক্স হইতে টাকা দিয়া যথাসময়ে সুদ সমেত টাকা আদায় করিতেন। আমার মায়ের নিকট এই সকল গল্প শুনিয়াছি। যখন ঠাকুরমা পুকুরপাড়ে ঘুরিয়া বাক্স হইতে টাকা বাহির করিতেন, মা দেখিয়া একা একা বড়ই হাসিতেন। ঠাকুরদাদার বাক্সের টাকা কি করিয়া কম পড়ে, তাহাও সর্ব্বদা দেখিতেন। ইঁহাদের দাম্পত্য কলহ শুনিয়া সকলে আমোদ পাইতেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের পক্ষে ইহা একটুও প্রহসনের ব্যাপার ছিল না। এইখানে একটি কৌতুকজনক গল্প না বলিয়া পারিলাম না। আমি পৌত্রীক ভিটায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া ঠাকুরদাদা আমায় অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আর আমার পিতৃ পরিবারে পুত্র অপেক্ষা কন্যার অধিক আদর। আমার তিন পিসির যা আদর ছিল আমার পিতার তার এক অংশও ছিল না, কাজেই আমি নাতনি হইয়াও নাতির অধিক আদর পিতামহের নিকট পাইয়াছি। আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে কখন কখন কলিকাতায় তাঁহারা যখন থাকিতেন, আমি ঠাকুরদাদা ঠাকুরমাকে দেখিতে যাইতাম। আমাকে পাইলে উভয়েই সুখী হইতেন, দুজনেই আমাকে ডাকিয়া নানা গল্প করিতে ভালবাসিতেন। আমাকে ঠাকুরদাদা একদিন চুপি চুপি বলিতেছেন "দ্যাখ্ ও চোকী (ঠাকুরদাদার প্রদত্ত ডাকনাম), আইবড় যেন থাকিস না, সুব্রাহ্মণ দেখে বিয়ে করিস, বুঝলি? তুই প্রণাম করলে কি বলে যে আশীর্ব্বাদ করব ভেবে পাই না। 'জন্ম এয়োস্ত্রী হও' এই ত এক বাঁধা আশীর্ব্বাদ জানি, তা মুখে আসে বলতে পারি না, ভয় হয় পাছে বা বলে বসি 'জন্ম আইবড় হও'—বিয়ে না হলে কি চলে তোদের যে কি কাণ্ড!" ইত্যাদি। আমি শুনে খুব হাসতে আরম্ভ করলাম। ঠাকুরমা আর এক ঘরে কি কাজ করছিলেন তিনি আমার মুখের ভাব ও হাসি দেখে বুঝলেন কি ভাবের কথা হচ্চে—অমনি তিনি বলে উঠলেন "ওরে চোকী! বুড়ো কি বলছে রে? তোকে বিয়ে করতে বলছে? না, খবরদার অমন কর্ম্ম করিসনি, কালভৈরব ডেকে আনিস্‌নি। সেই নয় বছরের মেয়ে আমার স্কন্ধে ঐ কালভৈরব যে চড়েছেন আমার সারা জীবনটা নাকাল করলে। তোদের ভাল কিছু দেখি না, কেবল যে মেয়েগুলোকে ধরে বিয়ে দিতে হয় না এটা বড় ভাল নিয়ম। আমাদের যদি এ বিধি থাকত, তাহলে কি আমি বে করি না আমার তিনটে মেয়ের বিয়ে দি।" ঠাকুরদাদা হেসে বলিলেন, "বলি, তুমি যদি না বে করতে তবে আর তিনটে মেয়ের বিয়ে দেবার দায় থাকত না—সব ন্যাটাই চুকে যেত।" এই দম্পতির কথা কাটাকাটি শুনিতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইত। কেহ কাহাকেও কথায় হারাইতে পারিতেন না।

ঠাকুরমা "সাবিত্রীব্রত" করিতেন। ব্রতের দিন ঠাকুরদাদার সঙ্গে প্রাণান্তে ঝগড়া করিতেন না, কিন্তু উত্যক্ত হইবার শত শত কারণ উপস্থিত হইত। পা-পূজার সময় ঠাকুরদাদা মুখ ফিরাইয়া পা বাড়াইয়া দিতেন, ঠাকুরমা মনে মনে রাগিয়া গস্ গস্ করিতেন, আর বলিতেন—"আজ চুপ করে থাকি, কাল বুড়োকে মজা দেখাব।"

বৃদ্ধ বয়সে এই দাম্পত্য কলহ ক্ষুদ্র শিশুর কলহের মত শুনাইত। উভয় উভয়কে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। ঠাকুরমা পাড়া বেড়াইতে গেলে ঠাকুরদাদা ছট্‌ফট করিতেন। একবার পিতৃদেব যখন চন্দননগরে ছিলেন, ঠাকুরমা ঠাকুরদাদা কিছুদিন আসিয়া সেখানে ছিলেন। একদিন ঠাকুরমা তাঁতিপাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহিণী কোথায়?" (ঠাকুরদাদার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা অভ্যাস ছিল)। শুনিলেন তিনি তাঁতিপাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছেন। একটু বেড়াইয়া আসিয়া আরও দুবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহিণী এখনও আসেন নি?" তৃতীয় বার আসিয়া দেখেন সন্ধ্যা হয় তখনও গৃহিণী অদর্শন। এবারে রাগিয়া গেলেন, বলিলেন—"গৃহিণীকে বলে পাঠাও তাঁর আর ঘরে আসবার দরকার নেই—তিনি যেন তাঁতিদের বাড়ীতেই থাকেন।" এবার ঠাকুরদাদা গামছা লইয়া গঙ্গার ঘাটে গেলেন। ঠাকুরমা তখনই ফিরিয়া দেখেন ঠাকুরদাদা বাড়ী নাই। তিনিও অস্থির হইয়া বলিলেন, "হাঁ রে বুড়ো কোথায় গেল রে?" তার রাগের কথা শুনে বললেন—এখনই আসে এই। সত্যই তখনই ঠাকুরদাদা বাড়ী ফিরিলেন এবং যথারীতি ঝগড়া আরম্ভ হইল—এতক্ষণ বিলম্ব কেন হইল এই প্রশ্ন লইয়া। দুইজনে একদণ্ড শান্তিতে থাকিতেন না। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয় নাই। অর্দ্ধেক রাত্রি দুজনে ঝগড়া করিয়া কাটাইতেন. ভিন্ন গৃহে শয়নের ব্যবস্থা করিলে কিছুতেই শুনিতেন না। ঠাকুরদাদা একবার কঠিন পীড়ায় প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, কন্যা কুসুম পিতার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন, ঠাকুরমা কন্যাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন—"কাঁদিস কেন, বুড়ো কখন মরবে না, মলেই হোল কি না, আমি বুড়োবয়সে একাদশী করে মরি! বুড়োকে মরতে হবে না. তুই কাঁদিস নে।" কন্যা এই কথা শুনিয়া একেবারে চক্ষুস্থির! স্বামী যান দুঃখ নাই, ভাবনা নাই, আবার ধমক যে তিনি একাদশী করতে পারবেন না, অতএব বুড়ের মৃত্যুরূপ অকার্য্য অসম্ভব। বাস্তবিক এই নারী স্বামীর মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে গত হন। ঠাকুরদাদার রাগ হলেই ঠাকুরমাকে শাসাইতেন—"যত ঝগড়া করছ একাদশী করে শোধ করবে।" তিনি গর্ব্বভরে বলিতেন—"বয়ে গেছে একাদশী করতে। ড্যাং ড্যাং করে বুড়ো তোমায় ফেলে পালাবো।" পিতৃদেবের কঠিন পীড়ার সময়েও ঠাকুরমাও বলছিলেন—"এ কখন হতে পারে না—আমি বুড়ো মা বেঁচে থাকতে আমার একমাত্র ছেলে চলে যাবে তা হবে না।" বাবা সে যাত্রা সেরে উঠলেন। আশ্চর্য্য! ইঁহার দর্প স্পর্দ্ধা পূর্ণ মাত্রায় বহাল রহিল। শিবনাথ আজীবন জননীর অঞ্চলের নিধি চক্ষের মণি ছিলেন, এজগতে তাঁর "শিব" বই আর কিছু ছিল না। যে শিব তাঁর ইষ্টদেবতা, সে শিব তাঁহার একমাত্র পুত্র। পিতৃদেব ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাঁর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। নিজের মনের যন্ত্রণা—তাহার উপর ঠাকুরদাদা সর্ব্বদাই "তোমার পুত্র" বলিয়া গালাগালি ও অজস্র অভিসম্পাৎ দিতেন। তাহাতে ঠাকুরমার "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"র মত বোধ হইত। একে শিবনাথ আজন্ম মাতৃভক্ত তাহাতে জননীর এই গভীর দুঃখ ও পরিতাপ তাঁহাকে কি যে যন্ত্রণা দিত তাহা আর বলিবার নয়। জননীকে সুখী করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। "আমার মা" বলিতে আনন্দে আত্মহারা হইতেন, মায়ের চরণ দুইটির উপর মস্তক রাখিয়া পরম তৃপ্তি হৃদয়ে অনুভব করিতেন। ঠাকুরদাদা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর বিশ বৎসর পুত্রের মুখদর্শন করেন নাই—এজীবনে আর কখন "শিবনাথ" নাম মুখে উচ্চারণ করেন নাই। পিতৃদেবের বিষয় কিছু বলিতে হইলেই "পাজি" "হতভাগা" "লক্ষ্মীছাড়া" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। শিবনাথ আজীবন জননীকে মাসে মাসে তাঁহার হাতখরচের জন্য কিছু

কিছু টাকা দিতেন কিন্তু ঠাকুরদাদা পুত্রের অর্থ স্পর্শ করিতেন না। একবার দেশের একজন জিজ্ঞাসা করেন—"পণ্ডিতমশাই! শিবনাথ আপনাদের কিছু মাত্র সাহায্য করে না?" ঠাকুরদাদা উত্তরে বলিলেন—"শুনতে পাই মাসে মাসে কিছু কিছু গুদম ভাড়া তার গর্ব্ভধারিণীকে দিয়া থাকে, আমি সে পাজির টাকা স্পর্শ করি না।" শিবনাথ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সময় আকুল প্রাণে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে অনেক বার লিখিয়াছেন—"একদিন আপনাদের প্রসন্নতা ফিরিয়া পাইব।" তাহাই হইয়াছিল। জীবনের শেষ কয় বৎসর উভয়েই পুত্রগত প্রাণ হইয়াছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পর দেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহাতে হরানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রাণমন দিয়া পড়িয়া ছিলেন। যে ব্রাহ্মগণ তাঁহার আজীবন চক্ষুশূল ছিল, যাহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে কখনই ছাড়েন নাই, সেই ব্রাহ্মদিগকে বিশেষতঃ সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে তিনি অতিশয় ভালবাসিতে লাগিলেন। সর্ব্বদাই বলিতেন—"যদি মানুষ কেউ থাকে বাংলা দেশে তবে সে কৃষ্ণকুমার।" যে হরানন্দ ব্রাহ্মদের ভাষা, লেখা, চালচলনের দিনরাত বিদ্রূপ করিতেন, পূর্ব্বে সঞ্জীবনীর ভাষা লইয়া সর্ব্বদা ঠাট্টা করিতেন সেই হরানন্দ প্রতি সপ্তাহে সঞ্জীবনী পাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশে এক সভা হয়। সভায় হরানন্দ অগ্নিময় বক্তৃতা করিলেন এবং তারপর একজন মুসলমানের সহিত কোলাকুলি করিলেন। এই সেই হরানন্দ যিনি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ—সকলের নমস্য। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য অতিশয় গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্যের সমালোচনায় অতিশয় আমোদ পাইতেন। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার জন্য তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। স্ত্রীশিক্ষার হাতেখড়ি স্বরূপ পত্নী গোলোকমণিকে উত্তমরূপে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা দেন। ঠাকুরমাকে সেকালের একজন শিক্ষিতা নারী বলা যায়। মজিলপুরে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তাঁর নাতনি যখন ইংরাজী শিক্ষা করিতে লাগিল তখন সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। আমি যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া তাঁহাকে একখানি উপহার দিই তিনি পড়িয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"এ তো ইতিহাসের মত বোধ হয় না, এ তো সাহিত্যের মত সুপাঠ্য। তবে বইখানিতে 'ব্রাহ্ম' 'ব্রাহ্ম' গন্ধ আছে।" আমরা শুনিয়া বলিলাম—"ইতিহাসের ভিতর তিনি 'ব্রাহ্ম' গন্ধ কোথায় পেলেন?" ঠাকুরদাদা বলিলেন—"ব্রাহ্মেরা যা কিছু লেখে, দুলাইন লিখিলেও তার ভিতর 'ব্রাহ্ম' 'ব্রাহ্ম' গন্ধ থাকেই।" ব্রাহ্মদিগের ভাষা লিখিবার ভঙ্গী তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। কত যে বিদ্রূপ করিতেন তাহার আর সীমা নাই। ব্রাহ্মদিগকে তিনি এক অদ্ভুত জীব ভাবিতেন। সুযোগ পাইলেই বাক্যবাণে জরজর করিতেন।

শিবনাথের জনকজননী উভয়েই দীর্ঘজীবী এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে পূর্ণ শক্তিবিশিষ্ট এবং কার্য্যক্ষম ছিলেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের পক্ষে আশী বৎসর বয়সে দিবা দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে কালীঘাট হাঁটিয়া যাওয়া কিছুমাত্র কঠিন ব্যাপার ছিল না। নিদ্রালু অলস বৃদ্ধ এ পরিবারে কেহ কখন দেখে নাই। মনের উজ্জ্বলতা, বাক্যের সরলতা, কার্য্যের উৎসাহ, এ পরিবারের সকলের ভিতরেই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গোলোকমণি পুত্রের গৌরবে আপনাকে মনে মনে সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। একবার শুনিলেন পাড়ার কোন স্ত্রীলোক বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁর পুত্রকে নিন্দা করিয়াছে। অমনি গোলোকমণি স্পর্দ্ধাভরে বলিয়া উঠিলেন—"কি তোরা আমার ছেলের নিন্দে করিস, বেটা ত এক এ দেশের ভিতর আমিই প্রসব করেছি। ওলো লক্ষ্মীছাড়ীরা, তোরা

ত পাঁটা প্রসব করেছিস, আমার বেটার আবার নিন্দে করিস! খবরদার।" গোলোকমণির ভয়ে শিবনাথকে কারো কিছু বলিবার উপায় ছিল না। কলিকাতায় শেষবয়সে যখন আসিতেন পুত্রবধূদিগের হাতের জল খাইতেন না। বলিতেন—"তোদের কি জাত আছে।' একদিন বড়বধূ বলিলেন, "মা, আপনার ছেলের জন্যই ত আমাদের জাত গেছে।" গোলোকমণি অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি বলিস, আমার ছেলের জাত গেছে? আমার ছেলের জাত কে মারতে পাবে? ও জাত দিলে লোকে জাত পায়, জাত তোদেরই গেছে।" বধূরা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর এমন অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কথায় কথায় বলিতেন—"আমার ছেলের কপালে 'জয়পত্র' লেখা আছে, ওর সব ভাল।" একদিন গোলোকমণির সাধ হইল ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া ছেলের উপাসনা উপদেশ শুনিবেন। নাত্‌নিকে বলিলেন—"দেখ্‌ আজ আমি মন্দিরে গিয়ে শুনব তোর বাপ কি বলে।" নাত্‌নির মহা আপত্তি ঠাকুরমাকে মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইবে না, এসে ঠাট্টা করিবেন, এই ভয়। গোলোকমণি ছাড়িবার পাত্রী নন্‌, মন্দিরে গিয়া সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া ছেলের কথা শুনিতে লাগিলেন। শিবনাথের উত্তেজনাময় স্বার্থত্যাগের কথা শুনিযা মাথা নাড়িতে লাগিলেন। শিবনাথ এক একটা কথা বলেন তিনি তার উত্তর দেন। শিবনাথ যেই বলিলেন "তোমরা সকলে লাভ ক্ষতির গণনা না করে ঝাঁপ দিয়া পড়।" গোলোকমণি আর থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—"বেহ্মজ্ঞানীরা তোমার মত এত বোকা নয়, যা পড়বার তুমিই পড়েছ ওদের পড়তে বয়ে গেছে।" বাড়ীতে আসিয়া নাত্‌নী ঠাকুরমাকে তিরস্কার করিতে লাগিল—"ঠাকুরমা আর তোমাকে কখন যদি মন্দিরে নিয়ে গেছি, তোমার ছেলেকে বেদীতে দেখে তুমি ভেবেছ ঘর আর কি। ও যে একটা প্রকাশ্য জায়গা, অমন করে কি বলে?" গোলোকমণি প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন, "তোদের অনেক ভাগ্যি যে শিবের গালে ঠাস করে এক চড় মারিনি।"—ব্রাহ্মদের কাছে পুত্রের নাম করিতে হইলে বলিতেন—"এই তোমাদের শিবনাথ শাস্ত্রী যখন ছোট ছিল, রাগ হলেই আমায় বলত 'এক ঢিলে তোকে মেরে ফেলব।' তা এক ঢিলেই আমায় মেরে ফেলেছে।" শিবনাথ অত্যন্ত মাতৃপিতৃভক্ত ছিলেন। যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁহার পিসতুতো ভাইকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিতেছেনঃ—

"মেজদাদা, এখন বলিলে কেহ মানিবেন না। কিন্তু তথাপি আমি বলি—যদি কেহ বলেন যে আমা অপেক্ষা তাঁর পিতৃভক্তি কি মাতৃভক্তি অধিক তাহা স্বীকার করি না, তবে আমি পিতামাতার আদেশ অপেক্ষা ভগবানের আদেশ প্রতিপালন অধিক বলিয়া বিবেচনা করি।"

আর এক পত্রে পিতাকে লিখিতেছেনঃ—

১২৭৬ সাল ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

"যেদিন আমার ভক্তি সাধন হইবে সেদিন আমার সুপ্রভাত হইবে তখন আপনাকে মনের ধারণা আপনা হইতেই দূর করিতে হইবে। তখন আপনাকে আপনা হইতেই বাৎসল্য ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। ইহা হবেই হবে, হবেই হবে।"

শিবনাথের জন্য তাঁহার জনকজননী যাবজ্জীবন যেরূপ ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া স্বতঃই তাঁহার দেশের লোক তাঁহাকে "পাষাণ হৃদয়" "পাষণ্ড" বলিয়াছে, কিন্তু ভক্তিমান সুপুত্র শিবনাথ আজীবন একদিনের জন্যও পিতামাতার নিদারুণ কষ্টের কথা ভুলিতে পারেন নাই। অন্তর্নিহিত গভীর মর্ম্মবেদনা, যখন

তখন অকারণে তাহার লেখার ভিতর প্রকাশ হইয়া পড়িত। ২২ বৎসরের যুবক লিখিয়াছেন ঃ—

"জননীর হাহাকারে ঘর ফেটে যায় রে,
পিতার গর্ব্বিত শির ধূলিতে লুটায় রে।"

ইহার ৪।১ বৎসর পরে 'পুষ্পমালা'য় লিখিতেছেন ঃ—

"অন্যে ডাকি কেন কোথা গো জননী!
এস মা আমার জনম দুখিনি!
মায়ের বেদনা অন্যে ত জানে না,
সন্তানের মায়া অন্যে ত বোঝে না,
তুমি মা আমার স্নেহ কল্লোলিনি।
সন্তানের প্রাণে এস একবার
এ হস্তের সৃষ্টি শোণিতে তোমার
তব পদার্পণে, পুত্র-পাগলিনি,
জাগিবে হৃদয় নাচিবে লেখনী।"

জনকজননীর তুষ্টির জন্য শিবনাথ ধর্ম্মত্যাগ ভিন্ন আর সকল কার্য্যই অম্লান বদনে করিতে পারিতেন। ঠাকুরমা তাঁকে ঠাকুরের চরণামৃত ইত্যাদি যাহা খাইতে দিতেন, খাইতেন, পুত্রের মস্তকে জপের মালা ঠেকাইতেন—যাহা কিছু করিতেন শিবনাথ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেন। জননী যাহাতে শান্তি পাইতেন তাহাই করিতে দিতেন।

শিবনাথের জননী ৮১ বৎসর বয়সে ১৩১৫ (১৯০৮) শকে ৩০এ ভাদ্র দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় পুত্র ও কন্যা পুত্রবধূ বিরাজমোহিনী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে শিবনাথের মাথায় হাত দিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বার বার বলিতে লাগিলেন—"বাবা আমার! আমার বাবা, আমার ধন!" এই বলিয়া মনে মনে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিবনাথ মুখে একটু জল দিতে গেলেন—তখনও এত সজ্ঞান যে বিধর্মী ছেলের হস্তে জল গ্রহণ করিলেন না, মৃদুভাবে বলিলেন—"আর কেন বাবা আর নয়।" এ ক্ষোভ তাঁহারা কোথায় রাখিবেন—একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে কন্যা ঠাকুরদাসীকে পিতামাতার মুখাগ্নি করিতে হইল!!

গোলোকমণি ত চলিয়া গেলেন, হরানন্দ আরও তিন বৎসর জীবনের সঙ্গিনীকে হারাইয়া এ পৃথিবীতে রহিলেন। তখন কনিষ্ঠা কন্যা কুসুম তাঁহাকে অধিকতর যত্ন শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই কুসুমবালাকেই তিনি পৈতৃক সম্পত্তি তাঁহার পিতৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। পত্নীর মৃত্যুর পরে তাঁর পালিত বিড়াল এবং পক্ষীর সেবায় হরানন্দ নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই ইতরপ্রাণীর উপর তাঁর দয়া। প্রতিদিন আহারের পর পাড়ার কুকুরগুলিকে নিজ হস্তে ভাত দিতেন। গৃহপালিত সকল পশুর উপর তাঁর অত্যন্ত যত্ন ছিল। গোলোকমণির শেষ বয়সে দুটি বিড়ালছানা ছিল। বিড়াল দুটির সুন্দর রূপ দেখিয়া হরানন্দ তাদের নাম "গালচি" ও "দুলচি" রাখিয়া দিলেন। শিবনাথের জননীর পাখী পোষার ভারি সখ ছিল। গৃহিণী যখন চলিয়া গেলেন, তখন তাঁর পাখী আর বিড়ালের সেবায় হরানন্দের দিন কাটিতে লাগিল। একদিন সকালে উঠিয়া কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কুসী, কাল থেকে সকালে আধসের দুধ রোজ করিস"—

কুসুম—"কেন বাবা! তুমি সকালে দুধ খাবে?"

পিতা—"না আমি কেন সকালে উঠে দুধ খেতে গেলাম, বলি গৃহিণীর পাখী

আব বিড়াল দ্‌টো কি তিনি গেছেন বলে না খেযে মবে যাবে? ওদেব জন্য দুধ রোজ কব্।"

কন্যা কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত নহেন দেখিযা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাগিযা অস্থিব। আব একদিন বাত্রে বিড়ালছানা দুটি বাহিবে ডাকিতেছে, হবানন্দ কন্যাকে ডাকা-ডাকি আবম্ভ কবিলেন।— কুসী গালচি ‍্লচি কেন কাঁদে বে ওদেব বাহিবে শীত কবছে! কন্যা বলিলেন— না ওদেব মা হযত কোথায গেছে তাই কাঁদছে। এখনি চুপ কববে। হবানন্দ সে কথায সন্তুষ্ট হইতে পাবিলেন না। বাহিবে গিযা বিড়ালছানা দুটি কোলে কবিযা বিছানাব ভিতব শুইলেন। তবু তাবা ডাকিতে লাগিল, তখন বলেন— ওবে কুসী, ওবা শিশু কিনা উদবেব পীড়া হযে থাকবে, কি কবা যায বল ত?

কুসুম বলিলেন— কবা আব কি যায—তুমি কবিবাজেব বাড়ী যাও বিড়াল শিশুব উদবেব পীড়াব ওষুধ আনতে নযত ওদেব পেটে তেল মালিশ কবো।

হবানন্দ বিড়াল শিশুব সেবায সাবাবাত কাটাইলেন। প্রচণ্ড যাঁব বাগ তাঁব হৃদয এমন কোমল! ১৩১৮ সালে ২৭এ শ্রাবণ হবানন্দ পবলোকগমন কবেন। মৃত্যুব কিছু দিন পূর্ব্বে শিবনাথ পিতাকে দেখিযা আসিযাছিলেন কিন্তু মৃত্যুব সময তিনি উপস্থিত ছিলেন না। শেষ দিনে বাব বাব বলিতে লাগিলেন—'বড দবকাব ছিল। হায হায তাব সঙ্গে দেখা হল না। এমনি হবানন্দেব মনেব তেজ যে, যেদিন যান সেদিনও শয্যায তাঁকে শযন কবান কঠিন পীড়িতে ঠেস দিযা বসিযা বহিলেন এমন কি লাঠি ধবিযা বাবান্দায একবাব বেড়াইযা আসিলেন পা ঠিক পড়ে না, টলমল কবিতেছেন দেখিযা কন্যা কুসুম বলিল— বাবা কেন হাঁটছ, পড়ে যাবে যে।' হবানন্দেব একথায বাগ হইল—"কেন আমি বালক কি না, তাই চলতে গেলে পড়ে যাবো।' বেশ কথা বলিতেছেন, জ্ঞান সম্পূর্ণ আছে, কবিবাজ নাড়ী দেখিযা বলিলেন—'আব দেবী নাই, ঘাটে নাও।" ধবাধবি কবিযা সকলে নামাইলে ভাগিনেয কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। একবাব বলিলেন 'মামা নাম কবো।" তখনও হবানন্দেব সে কথা সহ্য হইল না। তিনি বিবক্ত হইযা বলিযা উঠিলেন—"মববাব সময নাম কবছি না ত কবছি কি? একথা বলিতে না বলিতে সেই তেজস্বী পুরুষেব তেজোদীপ্ত আত্মা দেহপিঞ্জব ছাড়িযা অনন্তে মিশাইল।

মজিলপুবনিবাসী খ্যাতনামা হাবাণচন্দ্র বক্ষিত হবানন্দ ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্য বিষযক পুস্তকে যাহা লিখিযাছেন তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত কবিতেছি:—

"মজিলপুবনিবাসী পণ্ডিত হবানন্দ দক্ষিণাঞ্চলেব একজন গণনীয ব্যক্তি। সাধাবণ ব্রাহ্ম-সমাজেব আচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইনি জন্মদাতা পিতা। তেজস্বী ত্যাগী নির্লোভ ব্রাহ্মণ একবুপ বাজা ছেলেব মাযা ত্যাগ কবিযা কষ্টে জীবনযাপন কবিযাছিলেন তথাপি সংকল্পচ্যুত হন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারে তাঁহাব বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহাব সুপ্রসিদ্ধ নলোপাখ্যান নামে সাহিত্য গ্রন্থ একটু নিবিষ্ট চিত্তে পড়িলে মনে হয যেন বিদ্যাসাগর মহাশযের কোন লেখা পাঠ কবিতেছি, কিন্তু নিয়তিই সর্ব্বমূলাধাব, তাই দবিদ্র ব্রাহ্মণ হবানন্দ —সেই সদানন্দ পুরুষ—মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আপন মনে হাসিযা খেলিয়া নিবহঙ্কাব সৌম্যশান্ত মূর্ত্তিতে, সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন কবিযা, সরস হাস্য কৌতুক ও পরিহাস রসিকতায় শোকাতুরের মুখে হাসি ফুটাইয়া ৮৫ বৎসব বয়সে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন, সে সংবাদ কেই বা রাখিল আর কেই বা লইল; আর সে তুলনাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম, পাঠক নিজেই তার তুলনা করুন। তাই

বলিতেছি নিয়তিই সর্ব্বমূলাধার। নলোপাখ্যান ব্যতীত বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডটি পণ্ডিত হরানন্দ অনুদিত করিয়াছিলেন। সে অনুবাদও সুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যপ্রতিভা এইখানেই শেষ হইল। ক্ষুদ্র মজিলপুরটুকুতে বসিয়া পেনসেনের কাটা গোণা টাকা লইয়া হিন্দুসমাজচ্যুত একমাত্র কৃতীপুত্রের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি হাসিমুখে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিতে পারিয়াছেন এইটুকুই তাঁহার পুণ্যফল।'

স্বগ্রামবাসী গুণগ্রাহী লেখকের প্রত্যেকটি কথা সত্য। হৃদয়ের বিশালতায় শিবনাথের সমকক্ষ ব্যক্তি সহজে দেখা যায় না। সত্যনিষ্ঠা জ্ঞানানুরাগ, পরোপকারস্পৃহা, স্বজনবাৎসল্য, স্বদেশ প্রেম প্রভৃতি যে সকল গুণ শিবনাথের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল তাহা তিনি তাঁহার উদারহৃদয় সত্যব্রত পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। মিষ্টভাষিতা কর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মশক্তি ধর্ম্মানুরাগ ইত্যাদি তিনি মনস্বিনী জননী গোলোকমণির নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। সন্তানের ভিতরে পিতামাতা আবার সঞ্জাত হন একথা সত্য। মানুষ মাত্রেই বিবিধ দোষগুণের আধার। যে চরিত্রে দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক হয় সেই মানুষকেই লোকে গুণী বলে। ভগবানের কৃপায় শিবনাথের চরিত্রে জনকজননীর সদ্‌গুণরাশি সমুদায় বর্ত্তিয়াছিল, এবং প্রত্যেকটি সদ্‌গুণ শিবনাথের হৃদয়াধারে প্রচণ্ডরূপে দর্শন দিয়াছিল। ফল দেখিয়া বৃক্ষের দোষগুণ বিচার করিতে হয়,—যে বৃক্ষে শিবনাথ-রূপ ফল ধরিয়াছিল সেই বৃক্ষটির অশেষ মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

জন্ম—মাতুলালয়—শৈশব

কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত রাজপুর হরিনাভি গ্রামের সন্নিহিত, চাঙ্গড়িপোতায় শিবনাথের মাতুলালয়। তাঁহার মাতুল স্বনামধন্য দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক রূপে সকলের নিকট পরিচিত। আমাদের দেশে চলিত কথায় বলে 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' অর্থাৎ লোকে মামার মত হইয়া থাকে। শিবনাথের সম্বন্ধেও এ কথার ব্যতিক্রম হয় নাই। কেবল পিতামাতার দোষগুণ লইয়াই সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, পিতৃবংশের দোষগুণই কেবল মানুষের ভিতর বর্ত্তায় না, বাস্তবিক মাতুল বংশের প্রভাবও বড় সামান্য নহে। "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" এ প্রবাদ বচন মিথ্যা নয়। অতএব শিবনাথের জন্মকথা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতুল বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এখানে তাঁহার বিখ্যাত মাতুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিতেছি।

কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বে পাঁচক্রোশ অন্তরে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে ১৮২০ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। দ্বারকানাথ শৈশবে গ্রামের পাঠশালা এবং চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িয়া বার বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৩২ সাল হইতে ১৮৪৫ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র। প্রতি বৎসর বিশেষ পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিয়া অতিশয় প্রশংসার সহিত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজের লাইব্রেরিয়ানের

পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ সাল হইতে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সাল হইতে দারুণ বহুমূত্র রোগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু শ্রম করা তাঁহার এমনই অভ্যাস ছিল যে পীড়িত হইয়াও তিনি গুরুতর শ্রম করিতেন। ১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় সাতনায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন সেখানেই ১৮৮৬ সালে ২২শে অগাষ্ট তাঁহার দেহান্ত হইল। ১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই যন্ত্রেই প্রথমে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস মুদ্রিত হয়। উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা ভাষাতে লিখিত ইতিহাস বঙ্গদেশে সেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পরেও বিদ্যাভূষণ মহাশয় "প্রভাকর" "নীতিসার" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকাই তাঁহার প্রধান কার্ত্তি। এই সম্বন্ধে তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ লিখিয়াছেন ঃ—

"১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল। দ্বারকানাথ তাহার সম্পাদকতার ভার ও তাঁহার বন্ধু তাহার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিল। তিনি অধ্যাপকতা পদে যে কিছু অবসর পাইতেন, তাহা সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। রাত্রি ১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন, রাত্রি ৪টার সময় উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্য্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে তাঁহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না। "প্রভাকর" ও "ভাস্কর" প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল। সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে "সোমপ্রকাশ" দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মনের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার একপংক্তিও কাহারও তুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোভে, লোকের রুচি ও সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়নিঃসৃত অকপট ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। তাঁহার হাতে সোমপ্রকাশ যতদিন ছিল, ততদিন ইহা সর্ব্ববিধ দেশের ও সমাজের উন্নতির পক্ষপাতী ছিল। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা লঘু, যাহা কেবলমাত্র প্রীতিপ্রদ কিন্তু রুচি সম্বন্ধে হীন, সোমপ্রকাশ তাহার ত্রিসীমায় যাইত না। এই সোমপ্রকাশের অভ্যুদয় বঙ্গীয় সাহিত্যকে ও বঙ্গসমাজের চিত্তকে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ উন্নত করিয়া তুলিয়াছিল।"

শিবনাথ এই প্রকার মাতুলের ভাগিনেয়। তাঁহার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্নও একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতার কাঁসারিপাড়াতে তাঁর টোল চতুষ্পাঠি ছিল। তিনি কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে প্রধান সহায় ছিলেন; এবং হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা স্কুলেও কিছুদিন পণ্ডিতি করিয়াছিলেন। হরচন্দ্র ন্যায়রত্নকে লোকে কৃপণ বলিত। তিনি যে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী লোক ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই, নয়ত সেকালে গ্রামের মধ্যে একটা পাকা দোতলা বাড়ী করা সহজ ব্যাপার ছিল না। হরচন্দ্রের সংসারকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলা যাইতে পারিত। সম্বৎসরের চাল ডাল, গৃহস্থের আবশ্যকীয় সমুদায় জিনিষপত্র তাঁহার গোলায় সঞ্চিত থাকিত। পরিবার পরিজনদিগকে কোন দিনই অভাবের লেশমাত্র জানিতে হয় নাই কিন্তু একটি

পয়সাও যাহাতে অপব্যয় না হয়, সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সেকালে হরিনাভি হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক প্রকার দোলদার ছেকরা গাড়ী যাওয়া আসা করিত। একটু স্বচ্ছল অবস্থা যাঁহাদের তাঁহারা পদব্রজে না আসিয়া এই ছেকরা গাড়ীতেই কলিকাতায় আসিতেন। সাধে কি লোকে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কৃপণ বলিত—তাঁহার যে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল তা নয়, অথচ কোন দিনই ছক্কর গাড়ীতে উঠিতেন না। সর্ব্বদা পদব্রজে চাংগড়িপোতা হইতে কলিকাতায় আসা যাওয়া করিতেন। শিবনাথ যখন ৮ বৎসরের বালক তখন হাঁটিয়া মামার সংগে কলিকাতায় আসিতেন। এখন গ্রামের চাষাও পদব্রজে কলিকাতায় আসিবার কথা ভাবে না! সেকালে এমনই সামাজিক আবহাওয়া ছিল, যে হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক কপর্দ্দক নিজের আরামের জন্য ব্যয় করিতেন না তাঁহাকে কলিকাতার বাসায় দশ-বার জন আত্মীয় কুটুম্বকে প্রতিপালন করিতে হইত। শিবনাথের জননী গোলোকমণি আকৃতি প্রকৃতিতে অনেকটা পিতার মতই ছিলেন। বিশেষতঃ সাংসারিক ব্যবস্থা এবং গৃহিণীপনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালংকারের ছাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও ইঁহার ছাত্র ছিলেন।

শিবনাথের পুণ্যবতী দিদিমার কথা না বলিলে এই প্রসংগ অংগহীন হইবে। ভূমিষ্ঠ হইয়া যে দিদিমার ক্রোড়ে তিনি আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সে দিদিমা বড় সাধারণ নারী ছিলেন না। আকৃতিতে তিনি সুন্দরী ছিলেন না বরং তাঁহার দেহে রূপের কিছু অভাবই ছিল, কিন্তু গুণ বুঝি এমন আর নারীকুলে হয় না। আকৃতি প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন পতির ঠিক বিপরীত—পতি ছিলেন হিসাবী ইনি ছিলেন মুক্তহস্ত—এই জন্য ইঁহার পতি পুত্র কখনই ইঁহার হাতে সংসারের খরচ দিতেন না।

প্রতিমাসে হাতখরচের জন্য কিছু কিছু টাকা পাইতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দান ধ্যান কুলাইত না। এই পরদুঃখকাতরা দয়াময়ী রমণীর দানস্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে তিনি পতিকে লুকাইয়া গোলার চাল ডাল দরিদ্রকে সর্ব্বদাই বিতরণ করিতেন। শিবনাথ আত্মচরিতে দিদিমার কথা অনেক লিখিয়াছেন। আমার জননী প্রসন্নময়ী দিদিশাশুড়ীর অসাধারণ দয়ার কথা অনেক গল্প বলিতেন। তিনি অনেক দিন দিদিশাশুড়ীর নিকট ছিলেন, যখনই দিদিশাশুড়ীর কোন কথা বলিতেন, তখনই প্রসন্নময়ী হাতদুটি জোড় করিয়া উদ্দেশে সেই স্বর্গবাসিনী দিদিমাকে প্রণাম করিতেন আর বলিতেন এ জীবনে অনেক মানুষ দেখিলাম, আমার দিদিশাশুড়ীর মত অত বড় প্রাণ আর কারো দেখি নাই। চাংগড়িপোতা হইতে হরিনাভিতে প্রতিদিন তিনি গংগাস্নান করিতে যাইতেন। ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইত, কারণ পথে তিনি গরীব দুঃখীদের তত্ত্ব লইতে লইতে যাইতেন, অভুক্ত কাহাকেও দেখিলে বাড়ী ফিরিবার সময় সংগে লইয়া যাইতেন, সেই জন্য তিনি প্রায় একাকী গংগাস্নান হইতে ফিরিতেন না। একথা তাঁর পুত্রবধূদের জানা ছিল। তাঁহারা শাশুড়ীর জন্য বসিয়া থাকিতেন, তিনি যেদিন দুইচারজন লোক সংগে করিয়া আসিতেন, সেদিন বৌদের আবার ভাত রাঁধিতে হইত, কাজেই শাশুড়ীর উপর মনে মনে বিরক্ত হইতেন। বৌদের এই প্রকার কষ্ট দিতে তাঁর বড় লজ্জা হইত, অথচ গ্রামের একজনও অভুক্ত থাকিলে, তিনি কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলিবেন! শিবনাথের দিদিমার পক্ষে তাহা অসাধ্য ব্যাপার ছিল।

শিবনাথের মাতৃকুলের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিলাম। শিবনাথের চরিত্রে যে সকল মহৎগুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা তিনি কোথা হইতে পাইয়াছিলেন,

তাহা পাঠকগণ একবার অনুধাবন করুন। শিবনাথের চরিত্রে মাতৃপিতৃকুলের সত্য-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা, শ্রমশক্তি, জ্ঞানানুরাগ কি পরিস্ফুট হয় নাই? হৃদয়ের কোমলতায় তিনি মাতামহীর যোগ্য দৌহিত্র, এবং রামকুমার ভট্টাচার্য্যের যোগ্য পৌত্র। তেজস্বিতায়, সত্যনিষ্ঠায় পিতা হরানন্দের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য। জননী এবং মাতুলের ন্যায়, অসাধারণ কর্ম্মশক্তি, এবং কর্ম্মে অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁহার ছিল। সর্ব্বোপরি শিবনাথ ছিলেন ধর্ম্মগত প্রাণ, তাঁহার জননীদেবী ও মাতামহীর ন্যায় ধর্ম্মগতপ্রাণা নারী এই বঙ্গদেশেও বিরল বটে। আর প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালংকারের কথা কি বলিব, সেই বৃদ্ধ শিবনাথের হাত ধরিয়া 'দুর্গা দুর্গা বল ভাই, দুর্গা বই আর গতি নাই" বলিয়া যেভাবে নাচিতে শিখিয়াছিলেন, শিবনাথ তাহা আর এ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। শিবনাথের নাচে একদিনের জন্য তাল ভঙ্গ হয় নাই—নাচিয়াছেন আর বলিয়াছেন—

ঈশ্বর বাড়ান যারে কে তারে মারিতে পারে
বজ্রদেহী হযে সে যে নাচিয়া বেড়ায় রে,
তাঁহার নাচের বাদ্য জগৎ বাজায় রে।

১২৫৩ সালের ১৯এ মাঘ, ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ৩১ জানুয়ারি রবিবার চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে শিবনাথের জন্ম হয়। সায়ংকালে যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন পূর্ণিমা গিয়া সবে প্রতিপদ পড়িয়াছে। পরিজনগণ উৎকর্ণ হইয়া ছিলেন, ধাত্রী যে মুহূর্ত্তে বলিল "ছেলে হয়েছে" অমনি রোল করিয়া শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সেদিন শিবনাথের মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বাড়ীতেই ছিলেন। দৌহিত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া দৈবজ্ঞের বাড়ী দৌড়িয়া গেলেন। এই তাঁর প্রথম নাতি। এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামে সব রাষ্ট্র হইয়া গেল "ন্যায়রত্নের নাতী হয়েছে"। অমনি দলে দলে বাজনদার আসিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিল। নারীগণ দলে দলে শিশুর মুখ দেখিতে আসিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় কলিকাতায় গেলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ীতে বাজনা চলিল। শনিবার বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আগমন পর্য্যন্ত বাজনাদারের ঢোলের আর বিরাম ছিল না, তিনি বাড়ী আসিয়া তবে তাহাদিগকে বিদায় করেন। মাতুল বিদ্যাভূষণ সূতিকাঘরের দ্বারে আসিয়া মোহর দিয়া ভাগিনার মুখ দেখিলেন। শিশুর প্রশস্ত ললাট দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ ছেলের যে কপাল দেখছি, বেঁচে থাকলে বড় লোক হবে।" শিশু শিবনাথ দিদিমা, মামী, মাসীদের কোলে কোলে পরম আদরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে শিশু ছয় মাসের হইলে জননীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় উপস্থিত হইল। ছয় মাসের হৃষ্ট পুষ্ট শিশু লইয়া জননী গোলোকমণি মজিলপুরের বাড়ীতে গেলেন। বৃদ্ধ ন্যায়ালংকারের আনন্দ আর ধরে না, তাঁর বংশধরকে লইয়া তিনি পরম তুষ্ট হইলেন। কিন্তু মজিলপুরে আসিয়াই শিবনাথের কঠিন পীড়া হইল, জীবনের আশা রহিল না। অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া শিশু অস্থিচর্ম্মসার হইল। তখন তাহার জননী ভিন্ন আর কেহই কোলে লইতে পারিত না—মূর্ত্তি এমন কদাকার হইয়াছিল যে তাঁর পিতা দেখিলেই বলিতেন "দেখলে ভয় করে, ছুঁতে ঘেন্না করে।" ঠাকুরমা বলিতেন "একটি হেঁড়ে মাথা, একটি গেঁড়ে গেঁড়ে পেট ও সলিতার মত হাত পা ছাড়া আর কিছু ত ছিল না —কেহ ভাবে নাই ছেলে বাঁচিবে।" সেই ছেলেও বাঁচিল কিন্তু দেহ আর এ জীবনে সবল হইল না। জীবনে অনেকবার কঠিন পীড়ায় মৃতকল্প হইয়াছেন। শরীর চিরদিন দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ ছিল। বাল্যের কঠিন পীড়া তাঁর শরীরের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছিল। জননীর প্রভুত্ত্ব এবং পুত্রের দারুণ অশান্তি

শিবনাথের পীড়ার কারণ ছিল। ঠাকুরমার মুখে শুনিয়াছি, তিনি রাত্রে ছেলের জন্য দুধ রাখিয়া দিতেন, সেই দুধ জমিয়া দই হইয়া গেলেও পীড়িত শিশুকে সেই দই খাওয়াইতেন। আর জননীর দেহের উপর দিয়া কত যে অত্যাচার অনিয়ম যাইত তাহার হিসাব হয় না। বড়ই আশ্চর্য্য যে এমন করিয়াও লোকের ছেলে বাঁচে। যেমন করিয়া আজ পর্য্যন্ত মজিলপুরে শিশুর জীবন কাটে—শিবনাথের জীবনও তেমনি করিয়া কাটিতে লাগিল।

বাল্যকালে শিবনাথ বড় পেটুক ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে সন্দেশ মণ্ডার, ফল ফুলুরির অভাব ছিল না; সুতরাং শিবনাথ একাই অধিকাংশ আহার করিতেন। তাঁহার জননী তাঁহাকে অত্যন্ত বেশী আহার করাইতেন, সেইজন্য অতি স্থূলোদর ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে শিবনাথের হাতেখড়ি হয়। যতদিন না হাতেখড়ি হয়, ততদিন খেলাধুলো করিয়াই বেড়াইবার কথা, শিবনাথ তাহাই করিতেন। বাল্যাবধি প্রপিতামহের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। ডালি আসিলেই তিনি 'বাবা' বলিয়া চীৎকার করিতেন। শিবনাথ আসিলেই তাহার হাতে ডালি দিয়া জননীকে দিতে বলিতেন এবং ইচ্ছামত সন্দেশ খাইতে বলিতেন। অধিকাংশ সময় শিবনাথ সমুদায় সন্দেশ খাইয়া কেবল সরাখানি রান্নাঘরের দাবায় ছুড়িয়া দিয়া বলিতেন 'অমুকের বাড়ী হতে ডালি এসেছিল, এই যে সরা।" মা তখন পেটুক ছেলেকে মারিবার জন্য যাইতেন, ততক্ষণে শিবনাথ এক দোড়ে পাড়ী। পগার হইয়া পালাইতেন। প্রপিতামহের পূজা শেষ হইলে নৃত্যের সময় আবার শিবনাথের ডাক পড়িত, তখন আবার দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য। ভাত খাইবার সময় রোজ পাতের কাছে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসিতেন। যখন দুধ কলা দিয়া ভাত মাখা হইত, তখন নিজেই বিড়াল হইয়া আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া খাইতে বসিতেন। যেদিন দৈবাৎ হাতে হাত ঠেকিয়া যাইত, সেদিন বৃদ্ধের আহার সেখানেই শেষ হইত। তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে "বাবা খাও" বলিয়া উঠিয়া পড়িতেন। এদিকে মা আসিয়া পৃষ্ঠে এমন এক চপেটাঘাত করিতেন যে ভোজনের আনন্দ ক্রন্দনে শেষ হইত। শৈশবে শিবনাথ একটু কিছু হইলেই মূর্চ্ছা যাইতেন। পাড়াগাঁয়ে যাকে রস তাড়কা বলে, বড় হইলে বস তাড়কা সারিয়া যায়।

পঞ্চমবর্ষে হাতেখড়ি হইলে বালক পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিল। প্রথম দিন হইতে শিবনাথ পাঠে মনোযোগী ছিলেন। ঠাকুরমার নিকট শুনিয়াছি যে, শিবনাথের বাল্যকালে পড়া এবং লেখাপড়ার সমুদায় সরঞ্জামের উপর যত্ন ছিল। পাঠশালায় যাইবার সময় দোয়াত কলম, পাততাড়ি বগলে লইয়া একখানি ছোট ধুতি পরিয়া যাইতেন। পাঠশালা হইতে আসিবার সময় কাপড়খানি কোমর হইতে উঠিয়া মাথায় পাগড়ী হইত; কিন্তু প্রাণপণে পাততাড়ি দোয়াত কলম সামলাইতে সামলাইতে দিগম্বর বালক বাড়ী আসিত। কাপড় পরাইয়া দিলেও কোমরে একদণ্ড কাপড় থাকিত না। গুরুমহাশয় শিবনাথের পাঠে উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত ভালবাসিতেন; আদর করিয়া বলিতেন, "শিবে! তুই খাসা পড়া বলিস, তোর পড়া কে বলে দেয় রে!" উত্তর, "কেন গুরুমশাই আমার মা বলে দেয়, মা আমার সব জানে।" বাস্তবিক শিবনাথের মা তাঁর পড়া বলিয়া দিতেন, পড়া বলিয়া না দিলে কি রক্ষা ছিল? শিবনাথের সঙ্গে পড়াশুনোয় কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বালকেরা বাড়ী গিয়া নিজ নিজ জননীকে পড়া বলিয়া দিবার জন্য উত্যক্ত করিত। তাঁরা বলিতেন "শিবের মা ভাল জ্বালা করলে, আমরা কি লেখাপড়া জানি?" বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শিবনাথ পাঠে একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

ইংরাজিতে একটি বচন আছে—Child is the father of man—অর্থাৎ

বালকের ভিতর যে অঙ্কুর দেখা যায়, যুবার ভিতর তাহারই উদ্গম হয়। বালক শিবনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব যুবক শিবনাথের ভিতর পরিস্ফুট হইবার কথা। তিনি আত্মচরিতে আপনার বাল্যকালের বিষয় অতি সুমধুর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। আমি ঠাকুরমার কাছেও তাঁর বাল্যজীবনের গল্প অনেক শুনিয়াছি।

প্রথম ঘটনা ছয় দিনের দিন পুত্রকে বুকে রাখিয়া ঠাকুরমা যখন ঘুমাইয়াছিলেন তখন তিনি বুক হইতে পড়িয়া যান, এবং ঠাকুরমা স্বপ্নে দেখেন যে এক সুন্দরী নারী তাঁর পুত্রকে লইয়া যাইতেছে। ঠাকুরমা যতই বলেন "আমার ছেলে কেন নিয়ে যাও ?" সে রমণী ততই বলে "এ তোমার ছেলে নয় আমার ছেলে।" এই স্বপ্ন দেখিয়া ঠাকুরমা চমকিয়া দেখেন যে ছেলে বুকে আর নাই পড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়িয়া গেল। তাঁর বিশ্বাস সেইদিন হইতে জাতহরণী তাঁর ছেলেকে লইয়া গিয়াছে, তাই তাঁর ছেলে বিধর্ম্মী হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা শিবনাথ যখন ৪।৫ বৎসরের বালক তখন ঠাকুরের নিবেদিত অন্ন কিছুতেই খাইতেন না। তাঁহাদের গৃহে প্রতিদিন গৃহদেবতাকে অন্ন নিবেদিত হইত। তিনি নিবেদন করা অন্ন কখন খাইতেন না। ঠাকুরের এঁটো খাব না বলিয়া কাঁদিতেন। ঠাকুরকে নিবেদন করার আগেই রান্নাঘরের দাবায় বসিয়া ভাত খাইতেন। ঠাকুরদাদা ছেলেকে রাগাইবার জন্য একটি ফুলের পাপড়ি বা একটু কোষার জল পাতে দিবা মাত্র ভাত ছাড়িয়া উঠিতেন, তাঁহাকে কিছুতেই খাওয়ান যাইত না। মাঝে মাঝে পিসীর বাড়ী হইতে তাঁহাকে খাওয়াইয়া আনিতে হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ী এই ব্যাপার! শিবনাথের পিতামাতা পুত্রের এই জিদের জন্য বড়ই লজ্জিত হইতেন, বিস্তর প্রহার করিয়াও তাঁহাকে জব্দ করিতে পারেন নাই। সকলে শিবনাথের জননীকে বলিত তোমার পেটে একটা কালাপাহাড় জন্মিয়াছে—মাতার মুখ তুলিবার উপায় ছিল না। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত গোলোকমণি বলিতেন "ও যে এমন হবে তা আমি আগেই জেনেছি, সেই ছয় দিনের ছেলে থেকে জেনেছি।"

শিবনাথ আশৈশব জীবজন্তুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "পুষি নাই এমন জন্তুই নাই।" টুনটুনি, বুলবুলি, দয়েল, ছাতারে, শালিক, টিয়া, পিঁপড়া, ফড়িং, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাণীই পুষিয়াছেন। পিঁপড়ার গতিবিধি দেখিবার জন্য উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিতেন। পাড়াগেঁয়ে ছেলে, বনে বনে পাখী ধরিয়া, ফড়িং ধরিয়া বেড়াইতেন। তাঁর আত্মচরিতে জীবজন্তুর বিষয় অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন, কিন্তু চিরদিন যে তাঁর পোষা শালিখ টুনো পাখীর গল্প আমাদের বলিতেন তাহার কথা উল্লেখ করেন নাই। এই আশ্চর্য্য পাখীটির কথা জননী প্রসন্নময়ীর নিকট শুনিয়াছি। তিনি বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া "টুনো"কে দেখেন এবং তিনিই টুনোকে উড়াইয়া দেন। টুনো একটা শালিক পাখী, শিবনাথ তাহাকে অতি শৈশবে বাসা হইতে আনেন। অনেক কষ্টে অনেক পরিচর্য্যায় তাহার জীবন রক্ষা হয়। ক্রমে পাখীটা খাঁচায় থাকিয়া বড় হয়, এবং অনর্গল মানুষের মত কথা কহিতে শেখে। পাখীটার অতি আশ্চর্য্য কথা কহিবার শক্তি ছিল, ঠিক যেন মানুষ কথা কহিতেছে এরূপ বোধ হইত। শিবনাথকে কখন "দাদা" কখন "শিবনাথ" বলিয়া পাড়া কাঁপাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিত। শিবনাথের বোন কাঁদিলেও "মা খুকি এ্যাঁ এ্যাঁ" বলিয়া ভেঙ্গাইত। প্রসন্নময়ী যখন ঘর ঝাঁট দিতেন পাখীটা বলিত "বৌমা ছ্যেং ছেং ছেং"। তাহাকে কিছু খাইতে দিলেই বলিত "আর খাব না আর খাব না খুকীকে দাও।" ভিখারী বাড়ীতে আসিলেই বলিত "মাঠাকরুণ অতিথি।" একবার শিবনাথ তাহাকে মামার

বাড়ী লইয়া গিয়াছিল, নূতন একটা পাখী দেখিয়া শিবনাথের মামা বিদ্যাভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন "এ পাখীটা কার?" শুনিলেন শিবনাথের পাখী, তখন বলিলেন "পাখীটা কি আমাদের পাখীগুলোর মত মুখ্যু, না কথা কয়"--শিবনাথ বলিলেন "ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না।" বিদ্যাভূষণ যেই বলিয়াছেন "ও আত্মারাম তুমি কি পড়তে পার না মুখ্যু?" অমনি আত্মারাম ঝঙ্কার করিয়া উঠিল "বটে! বটে! এরাম! এরাম! চোপ চোপ চোপ"—তিনি অবাক্। একদিন প্রসন্নময়ী পাখী-টাকে খাবার দিতে গেলেন, হাতে ঠোকর মারিল—যেই হাত সরাইয়া লইলেন অমনি বাহির হইয়া গেল। তার পর বাড়ীর উঠানে গাছের ডালে গিয়া বসিল, ধরিতে গেলে ক্রমে ক্রমে উপরের ডালে উড়িয়া বসিল, ধরা দিল না—এবং বাজপাখী সেটাকে মারিয়া ফেলিল। টুনোর শোকে শিবনাথ কাতর হইলেন—মাকে কেবলি বলিতে লাগিলেন "কোথা থেকে একটা বৌ আনলে, আমার পাখী উড়াইয়া দিল, ও বৌটাকে রেখো না—বিদায় করে দাও।"

শিবনাথ ডাংপিটে ছেলে কখন ছিলেন না, শরীর চিরদিনই দুর্ব্বল তবে বড়ই সদানন্দ আমোদপ্রিয় ছিলেন। খেলাধুলায় আমোদ আহ্লাদে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন। খেলার মধ্যে ঢিলছোড়া এক প্রিয় খেলা ছিল—ঢিলের সন্ধান ছিল অব্যর্থ। কত পাখী তাঁর ঢিলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রাগ হইলেই মাকে বলিতেন "এক ঢিলে তোকে মেরে ফেলবো"। ঠাকুরমার বিশ্বাস ছিল তাঁর ছেলে বড় বোকা—তিনি আবার বলিতেন, "ও ছোটবেলা থেকে বড় বোকা, হাঁ কালা, কেবল পদে পদে ঠকে আসত, ওর খাবার ফাঁকি দিয়ে অন্য ছেলে খেত, ওকে ফাঁকি দিয়ে, ভুলিয়ে গাছে চড়িয়ে অন্য ছেলে পালাত আর উনি গাছে বসে ধরা পড়তেন, তাড়া খেয়ে কাঁদতেন, বাড়ীতে এসে মার খেতেন—চিরদিন বোকা—এক পড়ার সময় ছাড়া সকল বিষয়ে নির্ব্বোধ ছিল—নির্ব্বোধ না হলে আর ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে?"

বাল্যাবধি তন্ময়তা শিবনাথের প্রকৃতির এক বিশেষ লক্ষণ, যখন যাহা করিতেন তাহাতেই ডুবিতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কথা মনে থাকিত না। যখন বালক ছিলেন একমনে হয়ত পিঁপড়ার গতিবিধি বা পাখী দেখিতেছেন—পিতা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন। কর্ণে যাইতেছে না, তিনি যখন আসিয়া গণ্ডে এক চপেটা-ঘাত করিতেন তখন চৈতন্য হইত। ডাকিলে শুনিতেন না বলিয়া ঠাকুরদাদা ভাবিলেন "ছেলে কালা"। কানের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজে ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তীর কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাবার পিছনে এক তোড়া চাবি ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ছোকরা কিছু শুনলে কি?" শিবনাথ বলিলেন "এক তোড়া চাবি পড়িল।" তিনি হাসিয়া বলিলেন "কানে কিছু হয় নাই, খুব ভাল শোনে।" তন্ময়তার জন্য শিবনাথকে অনেক নিগ্রহ সহিতে হইয়াছে—পিতা কানে না শুনিলে প্রহার করিতেন। একদিন পথে যাইবার সময় গাছে একটি সুন্দর পাখী দেখিয়া এমনই তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন যে হাতীর পায়ের তলায় প্রায় পড়িয়াছিলেন। এই তন্ময়তার জন্য কোলাহলের মধ্যে বসিয়াও নিমগ্ন হইয়া পাঠ করিতেন বা লিখিতেন। বাহিরের কর্ণ বধির করিয়া কার্য্য করিতেন।

বাল্যকালে অতি সহজেই তাঁহাকে মিষ্ট কথায় ভুলান যাইত। আদর করিয়া কেহ ডাকিলে গলিয়া যাইতেন, অল্পায়াসে লোকে তাঁহার দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইত। তাঁর এক খোঁড়া জাঠতুতো বোন কি করিয়া আদর করিয়া তাঁকে ডাকিয়া তাঁর খাবারগুলি খাইয়া তার পর মারিয়া তাড়াইয়া দিত সেকথা আত্মচরিতে বলিয়া-ছেন। প্রতিদিন সে "পাগলা দাদা বড় ভাল ছেলে বড় সুন্দর ছেলে" বলে ডাকিত। খাবার শেষ হইলে সে যে মারিবে তাহা জানিয়াও আদর করিয়া ডাকিলেই না

গিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি আত্মচরিতে বলিয়াছেন যে "চিরদিনই আমি প্রশংসাপ্রিয় মানুষ।" মানুষমাত্রেই প্রশংসাপ্রিয়—বিশেষতঃ শিশু—আর শিবনাথ মিষ্টকথার বশ চিরদিনই ছিলেন।

শিবনাথের চরিত্রের আর এক বিশেষত্ব—নারীজাতির প্রতি হৃদয়ের টান—আশৈশব তাঁহার এই প্রকৃতি। বাল্যকালে খেলার সঙ্গিনীকে এত ভালবাসিতেন যে, খেলার সময় তাকে দলে না পাইলে অস্থির হইতেন। স্কুল হইতে বাড়ী আসিবার সময় তাহাকে দেখিয়া তাহার সহিত খেলিয়া আসিতেন। উন্মাদিনী নাম্নী ছোট বোনটিকে এত ভালবাসিতেন যে, সচরাচর কোন ভাই বোনকে এত ভালবাসে না। ঠাকুরমার মুখে উন্মাদিনী শিবনাথকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা শুনিয়া মনে হয়, যেন এসব উপন্যাসের গল্প। উন্মাদিনী শিবনাথের বোন, তাঁর চেয়ে ছয় বৎসরের ছোট। উন্মাদিনী দেখিতে বড় সুন্দরী ছিল বলিয়া, পিতা আদর করিয়া মেয়েকে উন্মাদিনী বলিয়া ডাকিতেন। শিবনাথ এই ছোট বোনটিকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন, উন্মাদিনীকে একদণ্ড না দেখিলে অস্থির হইতেন—যা কিছু পাইতেন উন্মাদিনীর জন্য আনিতেন। রাত্রে উন্মাদিনীর গলা না জড়াইয়া শুইতেন না। সে শিবনাথকে 'পাগ্‌গা দাদা" অর্থাৎ "পাগলা দাদা" বলিয়া ডাকিত। শিবনাথ কলিকাতায় আসিবার সময় উন্মাদিনীকে ছাড়িয়া আসিতে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন —তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল যে "কে তাঁর বুকে ছুরি বিঁধাইয়া দিল।" ছুটীর সময় যখন বাড়ী যাইতেন, তখন হাঁটিয়া অনেক ক্রোশ আসিতেন, ধূলিধূসরিত মূর্ত্তি লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই প্রথম কথা "মা, উন্মাদিনী কোথায়?" যদি শুনিতেন পাড়ায় খেলিতে গিয়াছে তখনই সেই পায়ে সেই ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ছুটিয়া যাইতেন, সে প্রসন্নমূর্ত্তি বোনটিকে কাঁধে করিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিতেন। ভাই বোনের তখন যে কি আনন্দ হইত তাহা অবর্ণনীয়। সেই উন্মাদিনী শিবনাথের আদরের বোন উন্মাদিনী! পাঁচ বৎসরের বালিকা বেড়াইতে গিয়া লিচু খাইয়া বাড়ী আসিল—আর উঠিল না—কলেরা হইয়া মারা গেল! শিবনাথের শোক অবর্ণনীয়—তিনি চিরজীবন লিচু খাওয়া সহ্য করিতে পারিতেন না। কতবার আমাদের বলিয়াছেন "আমার দুর্গা প্রতিমার মত সুন্দর বোনটি লিচু খেয়ে মারা গেল।" বাল্যকালে শিবনাথ আর উন্মাদিনী প্রতিমা ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন, উন্মাদিনীকে পালকীর ছাদে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—তখন লোকেরা বলিয়াছিল "পালকীর উপরের প্রতিমা দেখিব না ঐ প্রতিমা দেখিব।" সেকথাও শিবনাথ বলিতে ভালবাসিতেন, অন্যান্য ভগিনীদিগকেও শিবনাথ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নিজে বোনেদের বিদ্যালয় হইতে আনিতে যাইতেন, গ্রীষ্মকালে মাটী তাতে বলিয়া কোলে করিয়া বোনদের আনিতেন। বাঙ্গালীর ঘরে যেখানে একটি মাত্র পুত্র, আর চারিটি কন্যা সেখানে কি এমন হয়? দিদিমা মামী মাসী শিবনাথ ইঁহাদিগের চিরভক্ত ছিলেন—তিনি পিতা, জেঠা, কাকা, মামার ত্রিসীমায় সহজে যাইতেন না। শিবনাথকে নারীগণই চিরদিন ভালবাসিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে হরানন্দ যখন তাঁহাকে মারিবার জন্য লাঠিয়াল সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন মজিলপুর গ্রামের মেয়েরা শুনিয়া বলিয়াছিল "পণ্ডিত মশাই এ দেশের মালিক নাকি, দেখি ত কেমন তিনি শিবনাথকে মারেন?" শিবনাথ আজীবন স্ত্রীজাতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন :—

যৌবনকালে 'পুষ্পমালা'য় লিখিয়াছেন :—

তুমি নারী জান নাকি নারী এ জগতে
এ মরু জগতে যেন বটচ্ছায়া সমা,

নারী আতপত্র এই জীবনের পথে
গৃহলক্ষ্মী কুললক্ষ্মী নারী নিরুপমা
কিন্তু বঙ্গে নারী জন্ম বড় বিড়ম্বনা
তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে
বহেনা ত ধারা লোন। নারীর যাতনা
এ বঙ্গ সংসারে দেখে কাঁদিলে নির্জ্জনে।

বাল্যাবধি তিনি নারীজাতির দুঃখ দেখিতে পারিতেন না। শিবনাথের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি শৈশব হইতে বড় প্রবল। কথা বলিতে শিখিলেই জননীকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিতেন। বাক্‌পটুতা গুণ বাল্যকালেই ছিল, কথায় কেহ তাঁহাকে হারাইতে পারিত না, এইজন্য তাঁর নাম ছিল "শিবে জ্যেটা"। পাকা পাকা কথা বলিতে অদ্বিতীয় ছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে শিবনাথ কবি বলিয়া পরিচিত। শৈশবে কবিত্বের লক্ষণস্বরূপ অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয়তা ছিল—নানা কল্পনা মনে স্থান পাইত। উন্মাদিনীকে মন হইতে বানাইয়া বানাইয়া নানা গল্প বলিতেন। বোধহয় ১০।১২ বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। ছোটবেলাকার খাতা ঠাকুরমার কাছে ছিল, দেখিয়াছি তাহাতে কাঁচা হাতের লেখার অনেক ছোট ছোট কবিতা লেখা আছে। তাহার মধ্যে একটি ফুলের টবের উপর কবিতা ছিল, তাহার দুই এক লাইন এখনও মনে আছে:—

"টব রূপ সিংহাসন করি আরোহন" ইত্যাদি।

স্কুলে যখন পড়েন তখন ক্লাসের বন্ধু গঙ্গাধরের নামে লিখিয়াছিলেন:—

ইজার চাপকান গায়, ইস্কুলেতে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতী,
বড় তার অহংকার, ধরা দেখে সবাকার
চলে যেন নবাবের নাতী।

বেচারা গঙ্গাধর মোটা ছিল বলিয়া একেবারে হাতী নাম রাখিয়াছিল। যে কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, বাল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবনাথেরও তাহা পাওয়া গিয়াছিল। সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতা দীননাথ দত্ত মহাশয় শিবনাথের সঙ্গে বাঙ্গালা স্কুলে কথামালার শ্রেণীতে পড়িতেন, তিনি বলেন যে, "শিবনাথ বাল্যকালে বড় আমোদপ্রিয় ছিলেন, একটা আমোদ করবার কিছু পেলেই ছুটে যেতেন। একবার বাড়ীর একটা চোর-বিড়ালকে থলেতে পুরিয়া সকলের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে কি করিবার থালপারে খেলিতে গিয়াছিলেন, তা আজও মনে পড়ে। মনটা বরাবর সরল সাদা, অপরকে দিতে চিরদিনই মুক্তহস্ত ছিলেন।" দীনবাবু বলেন—"এক একদিন পড়িবার সময় শিবনাথের কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধা দেখিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম 'এটা কি?' শিবনাথ উত্তর করিতেন 'আজ ভাত খেয়ে আসিনি, মা এই কাপড়ে মিছরি বেঁধে দিয়েছে, তোমাদেরও দেব খেতে।'"

শিবনাথ বাল্যকালে পিতাকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, তাহার কারণ হরানন্দ শর্ম্মা পুত্রকে যখন তখন সামান্য কারণে গুরুতর প্রহার করিতেন। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে কখনই সাহস হইত না। জননীও বড় শাসন করিতেন। পল্লীগ্রামের ছেলেরা বড় গালাগালি দেয়—শিবনাথও বাল্যকালে গালি দিতে শিখিয়াছিলেন। একবার মাকে অন্যান্য ছেলেদের দৃষ্টান্তে বাপান্ত করেন, তাহাতে গোলোকমণি খোলার কুচি মুখে দিয়া এমন রগড়াইয়া দিয়াছিলেন যে মুখ কাটিয়া রক্তাক্ত হইয়াছিল। সেই অবধি গালাগালি বন্ধ হয়। দোষ করিলে পিতামাতা

কাহারও হস্তে নিষ্কৃতি ছিল না। পিতা ভুলেও ছেলেকে আদর করিতেন না, আর নিকট আদর যত শাসনও তত ছিল। তিনি পুত্রের উপর সর্ব্বদা প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। শিবনাথের পিতা কিরূপ সামান্য কারণে ছেলেকে গুরুতর প্রহার করিতেন তাহার বিবরণ তাঁর আত্মচরিতে দিয়াছেন। বিবাহের পর যে প্রহার করিয়াছিলেন তাহা জননী প্রসন্নময়ী দেখিয়াছিলেন—তখন শিবনাথের বয়স ১২ পূর্ণ হয় নাই। যখন খুঁটিতে বাঁধিয়া কাঠের চেলার বাড়ী প্রহার করিতে লাগিলেন এবং শিবনাথ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, জননী চীৎকার করিয়া "ওরে আমার ছেলেকে মেরে ফেল্লেরে" বলে পুকুরপাড়ে গিয়া পড়িলেন। তখন প্রসন্নময়ী নয় বৎসরের বালিকা, সবে বিবাহের কনে শ্বশুর-বাড়ী আসিয়াছেন, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। তিনি এই কথাই ভাবিতেছিলেন, "ও বাবা! এ কোথায় আমার বিয়ে দিয়েছে; এরা নিজের ছেলে মেরে ফেলছে আমায় না জানি কি করবে।" সেদিনকার ভীষণ অবস্থা অবর্ণনীয়, কিন্তু সেই দিনই হরানন্দ শর্ম্মা পুত্রকে শেষ প্রহার করিলেন। সেদিন পুত্রকে প্রহার করিয়া তাঁর এত অনুতাপ হইয়াছিল যে পুত্রের সম্মুখে উঠানে নাকে খত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর এ জীবনে ছেলের গায়ে হাত তুলিবেন না। প্রাণান্তে আর পুত্রকে প্রহার করেন নাই। শত উত্যক্ত হইলেও আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই।

স্বর্গীয় হরনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, শিবনাথ যখন ৮।৯ বৎসরের বালক—কলিকাতায় গিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন তখন তাঁর হাতে বালা, গলায় পদক, কোমরে কোমরপাটা, নিমফল ছিল। ছেলেরা কাপড়ের তলায় গহনা ধরিয়া টানাটানি করিত। মজিলপুরে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিবনাথকে সংস্কৃত কলেজে দেওয়া হইয়াছিল। শিবনাথের বাল্যকালে গ্রামে নব-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলে একজন ইংরেজ হেডমাষ্টার, জমিদারবাবুদের বাগান-বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। শিবনাথ গ্রামের বালকদের সহিত সাহেবের হাঁস-মুরগী প্রভৃতি দেখিতে যাইতেন। সাহেবের একটি প্রকাণ্ড কুকুর ছিল, সেটাকে দেখিলে বড় ভয় পাইতেন। অত্যন্ত শৈশবে মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া শিবনাথ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আত্মচরিতে লিখিয়াছেনঃ—

"ইহার অল্পদিন পরেই বাবা আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। সেদিনকার কথা আমি ভুলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে, বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হামলায়, তেমনি আমার মা সেদিন হামলাইতে লাগিলেন। আমি বাবার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম। তিনি পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন কোনও দিন ভুলিব না। উন্মাদিনী শালতীঘাট পর্য্যন্ত চিন্তা দাসীর সঙ্গে আসিয়া আমাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। যখন সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, —'পাগ্‌গা দাদা (অর্থাৎ—পাগ্‌লা দাদা) আমার জন্যে পুতুল এনো।' তখন আমি কাঁদিয়া অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল, আমার মনে হইল আমায় বুকের হাড় খুলিয়া লইয়া গেল। আমি পিতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিলাম।"

১৮৫৬ সালে শিবনাথ কলিকাতায় গমন করেন।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

বিদ্যাশিক্ষা ও কলিকাতায় আগমন

১৮৫৬ সালের আষাঢ় মাসে শিবনাথ বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। যে সময়ে শিশু পিতামাতার স্নিগ্ধ কোলে সুখের বাল্যকাল কাটায়, সেই সময়ে তিনি জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কলিকাতা শহরের পূতিগন্ধময় এক গলির ভিতর নির্ব্বাসিত হইলেন। কোথায় বা পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া, বালকসঙ্গীদিগের সহিত খেলাধূলা, আদরের পশুপ্রাণী, বোন উন্মাদিনী, সাধের বিড়াল কুকুর ও পাখী! শিবনাথ যাদের প্রাণের মত ভালবাসিতেন তাদের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ বড়ই বিষম বোধ হইল। তখনকার কলিকাতা অতি ভয়ঙ্কর স্থান ছিল, যে আসিত সেই পীড়িত হইয়া পড়িত! শিবনাথও আসিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মাতাকে সে সংবাদ দেওয়া হইল না। রোগমুক্ত হইলে তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার কথা উঠিল। হরানন্দের ইচ্ছা ছিল যে, পুত্রকে ইংরাজি শিক্ষার জন্য ডেভিড হেয়ারের স্কুলে দেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হরানন্দের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহার পরামর্শেই শিবনাথকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। হরানন্দ শর্ম্মার পরামর্শানুসারে পুত্রকে ডেভিড হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করা হইল না, তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

শিবনাথের দাদামহাশয় তখন চাঁপাতলায় সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে "মহাপ্রভুর বাড়ী" নামক এক বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন। শিবনাথ সেই বাসায় কিছুদিন ছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার মামারা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে আর এক বাড়ীতে উঠিয়া যান। সেখান হইতে ১৮৫৮ সালে বিদ্যাভূষণের "সোমপ্রকাশ" কাগজ বাহির হয়। সেই সময় শিবনাথ তাঁর পিতার সংগে বহুবাজারে বেণিয়াপাড়ায় আর এক বাসায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। সেটাও পুরুষের বাসা। শিবনাথ সেখানে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের সহিত একমাত্র বালক হইয়া কিরূপ ভাবে বাস করিতেন, তাহার বর্ণনা আত্মচরিতে করিয়াছেন। দুই বেলা দুটি মোটা ভাত, তাহাও সময় মত পাইতেন না। রাত্রে ভাত খাইতে এত দেরী হইত যে অধিকাংশ দিন পড়িতে পড়িতে বই হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন; তখন পিতা হরানন্দ আসিয়া প্রহার করিয়া জাগাইতেন, এবং চক্ষের জলে ভিজাইয়া ভাত খাইতে হইত! সেখানকার নৈতিক আবহাওয়া একেবারেই ভাল ছিল না। বালক বলিয়া তাঁহার সম্মুখে পুরুষেরা অত্যন্ত অশ্লীল আলাপ করিতেন। হরানন্দ ভট্টাচার্য্য তাহা শুনিলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন। শৈশবের কুদৃষ্টান্ত জীবনে স্থায়ীভাবে অকল্যাণ করে, শিবনাথ তাহা বিশ্বাস করিতেন। জেলিয়াপাড়ায় থাকিতে থাকিতেই ১৮৫৭ সালের মিউটিনি হয়। সেই সময় সংস্কৃত কলেজ কিছুদিন বহুবাজারে উঠিয়া গিয়াছিল। এই জেলিয়াপাড়ায় থাকিবার সময়ই অনুমান ১৮৬০ সালে রাজপুর গ্রামবাসী নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত শিবনাথের প্রথমবার বিবাহ হয়। তখন প্রসন্নময়ীর বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে, শিবনাথের বয়স ১৩ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের কুলপ্রথানুসারে প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম যখন একমাস তখন আড়াই বৎসরের বালক শিবনাথের

সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই বিবাহের বিষয় শিবনাথ আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"এই বিবাহকালীন সকল বিষয় আমার মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে যে, আমি কাণে মাকড়ী, গলায় হার, হাতে বাজ. ও বালা পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম। বাবা বাজনা ও আলো করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাকে লইয়া যেই আসরে বসাইল, অমনি গ্রামের সমবয়স্ক বালকেরা আসিয়া 'ওরে তুই কি পড়িস কি পড়িস' বলিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল। আমি অল্পক্ষণ মধ্যে বরোচিত লজ্জা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং আমাকে তাহারা ঠকান দূরে থাক, আমিই তাহাদিগকে ঠকাইয়া দিলাম। ইহা স্মরণ আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন 'ছেলেটি বড় জ্যেঠা।' তৎপরে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলে, সমবয়স্ক বালিকাদিগের কানমলা আরম্ভ হইল। সেবার ঠকিয়া গেলাম। কানমলার পরিবর্ত্তে কান মলিয়া দিতে পারিলাম না। নারীদলে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। এত মেয়ে একত্র দেখিয়া ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল।

"বিবাহের পর দিন যখন এক পালকীতে বর কন্যা গৃহাভিমুখে বিদায় করিল তখন আমার মুস্কিল বোধ হইতে লাগিল। মেয়েটি ঘোমটা দিয়া সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, হাত পা ছড়াইতে পারি না, কিছু বলিতে পারি না, মহা বিপদ। অবশেষে পথিমধ্যে একটা পড়ো-বাগানে গিয়া পালকী নামাইল। আমি বাহির হইয়া বাঁচিলাম। বাহির হইয়া দেখি লিচুগাছে লিচু পাকিয়া রহিয়াছে। গাছে উঠিয়া লিচু পাড়িয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। খাইতে খাইতে মনে হইল, মেয়েটি একা বসে আছে, তারও ত খিদে পেয়েছে, তাকে গোটাকতক লিচু দিই। এই ভাবিয়া কতকগুলি লিচু লইয়া প্রসন্নময়ীর অঞ্চলে ফেলিয়া দিয়াই দৌড়— যদি কেহ দেখিতে পায়। ক্রমে পালকী গ্রামের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল। আমার পাড়ার খেলিবার সঙ্গী বালকগণ আগ-বাড়াইয়া লইতে আসিল। পাড়ার দুইটি বালক আমার বড় অনুগত ছিল। তাহারা আসিয়া পালকীর দ্বার খুলিয়া সরু গলাতে বলিল, "ওরে তোর রবা কুকুর ভাল আছে"—শুনিয়া দুর্ভাবনা দূরে গেল, ভারী খুশী হইলাম। ক্রমে পালকী বাড়ীতে উপস্থিত হইল। পাড়ার মেয়েরা বৌ দেখিতে আসিল। মা হলুদ দিয়া ধান, দূর্ব্বা, ফুলচন্দন, ঠাকুরের চরণামৃত প্রভৃতি দিয়া বৌ ঘরে তুলিলেন। আমি পালকী হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি রবাকে দেখিতে ছুটিলাম। বর্ডাপসী, 'ওরে খা ওরে খা' করিয়া পশ্চাতে ছুটিলেন। কে বা মিষ্ট খায় কে বা বৌ লইয়া মেয়েদের মধ্যে বসে? তখন রবা প্রসন্নময়ী অপেক্ষা বহুগুণে আমার প্রিয়।"

এই প্রকারে শিবনাথের প্রথমবারের বিবাহোৎসব সমাধা হইল। শিবনাথের বিবাহের কিছুদিন পরে হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মজিলপুর স্কুলের হেড পণ্ডিতের কাজ পাইয়া দেশে গিয়া বাস করিতে থাকেন। শিবনাথ আবার মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন 'সোমপ্রকাশ' বাহির হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্ব্বদাই বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে আসিতেন। এখানে বালক কুসঙ্গীদিগের সহিত অতিশয় অযত্নে থাকিতেন। রবিবার বিদ্যাভূষণ দেশে যাইতেন, সেই সময় বাসায় শত প্রকার কুকার্য্য ও মাতলামি চলিত। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এই প্রকার কুসঙ্গে বাস করিয়া, এত প্রকার কুদৃষ্টান্ত দেখিয়াও শিবনাথ কি করিয়া এমন নির্ম্মল চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে লোকে কুৎসিৎ আলাপ কুৎসিৎ আচরণ করিত, মদ্যপান করিয়া পশুর মত ব্যবহার করিত—এমন লোকের সঙ্গে বাস করিয়াও তিনি হৃদয়ে এমন উন্নত আদর্শ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাতুলা

রেলওয়ে লাইন যখন খুলিল তখন দ্বারকানাথ বাসা তুলিয়া দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন শিবনাথের আরও দুর্দশা হইল। পিতা সুকিয়া স্ট্রীটে বাদুড়-বাগানে এক আত্মীয়ের বাসাতে পুত্রকে রাখিয়া গেলেন, সে ব্যক্তি অতি দরিদ্র। সামান্য একখানি গোলপাতার ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত। শিবনাথ সেখানে আশ্রয় পাইলেন। সেখানে রাঁধিবার লোক ছিল না। এরূপ স্থির হইল প্রাতে সেই ব্যক্তি এবং রাত্রে শিবনাথ রন্ধন করিবেন, কিন্তু কার্যকালে শিবনাথকেই দুইবেলা রন্ধন, বাটনাবাটা, বাসনমাজা প্রভৃতি সকল কাজ করিতে হইত। অতি শৈশবকালে পাঠের জন্য কলিকাতায় আসিয়া শিবনাথ যে কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, আজকাল অতি দরিদ্র হইলেও লোকের তত কষ্ট পাইতে হয় না।

দুইবেলা দুটি ভাত বই নয় ডাল তরকারি যৎসামান্য—তাও ঠিকমত পাইতেন না। স্কুল হইতে আসিয়া এক পয়সার জলখাবার খাইলেন ত যথেষ্ট হইল। ভগবান তাঁহাকে এমন প্রকৃতি দিয়াছিলেন যে, যখন যেখানে থাকিতেন, সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন। বিদ্যালয়ের বন্ধুদিগকে অকপটে ভালবাসিতেন, তাহারাও শিবনাথকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহাদের বাড়ী গিয়া, তাহাদের মা মাসীকে পাইয়া মাতা ভগিনীর অভাব বিস্মৃত হইতেন। নচেৎ শিবনাথের জীবন বোধ হয় সাহারা মরুভূমি হইয়া যাইত।

বাদুড়বাগানে এই প্রকার কষ্ট ও অসুবিধার ভিতর বাস করিতে হইত। হরানন্দ দেখিলেন এভাবে পুত্রের পড়াশুনা হওয়া অসম্ভব। কাজেই তখন আমাদপুরের জমিদার মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। অতি সুকুমার বয়সে কলিকাতায় আসা পর্যন্ত তিনি যে প্রকার কষ্ট পাইয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে এই বড় আশ্চর্যের কথা যে, তিনি কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—কেবল কি তাই চরিত্র রক্ষাই বা কি করিয়া করিলেন! এমন কষ্টের ভিতর তাঁর ছাত্রজীবন কাটিয়াছিল। মহেশচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে আশ্রয় পাইলেন বটে, কিন্তু কোথায় সংস্কৃত কলেজ আর কোথায় ভবানীপুর! অধিকাংশ সময় ভবানীপুর হইতে কলেজে হাঁটিয়া আসা যাওয়া করিতেন; সে কি অল্প পরিশ্রমের ব্যাপার? তবু চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে এক প্রকার সুখেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। রান্না ভাত দুটি বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন। চৌধুরী মহাশয় অতি সদাশয় উদারচেতা মানুষ ছিলেন। মহেশচন্দ্র চৌধুরীর খুড়তুতো ভাই শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী শিবনাথকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। দুজনের ভিতর সেই সময় প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। শিবনাথের প্রথম কবিতা পুস্তক "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিবনাথ যখন চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ী ছিলেন তখন ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিম্বা অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপাসনা করিতে আসিতেন। শিবনাথ প্রায়ই তাঁহাদের উপদেশ শুনিতে যাইতেন। এই চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ীতে থাকিবার সময়ই তাঁহার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে আলাপ হয়। মজিলপুরে যে সময় বালিকা বিদ্যালয়ের জমি লইয়া—ব্রাহ্ম যুবক কালীনাথ, হরানন্দ উমেশচন্দ্র, শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতির সহিত দত্ত-জমিদারবাবুদিগের তুমুল যুদ্ধ হয় তখন শিবনাথ ভবানীপুরে চৌধুরীবাবুদিগের বাড়ীতে থাকেন। মকদ্দমার ফলে যখন আলিপুরে জমিদারবাবুদিগের ভৃত্য শঙ্কর মোল্লার কয়েদ হয়, তখন হরনাথবাবুর অনুরোধে প্রতি রবিবার শিবনাথ শঙ্কর মোল্লাকে মিঠাই খাওয়াইতে জেলে যাইতেন।

১৮৬৪ সালে আশ্বিন মাসে শিবনাথ মহেশ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী হইতে

পূজাব ছুটীতে দেশে যাইবার সময় যে মহাঝড়ের মুখে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাব বিবরণ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন।

১৮৬৫ সালে ভবানীপুরের একটি ভদ্রসন্তান গুরুতব অপরাধ করিয়া দ্বীপান্তরে যান। সেই ঘটনায় তখনকাব লোকেদের মন অত্যন্ত বিচলিত হয়— শিবনাথের মনেও অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" নাম দিয়া একটি কবিতা 'সোমপ্রকাশে' ছাপিবার জন্য দেন। সেই কবিতাগুলি পাঠ করিয়া শিবনাথের মামা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তিনি শিবনাথকে ঐ প্রকার কবিতা আবও লিখিবার জন্য উৎসাহিত করেন। ক্রমে কবিতা বাড়িয়া চলিল, এবং সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ১৮ বৎসরের বালক শিবনাথ একজন প্রসিদ্ধ কবি হইয়া উঠিলেন। এই সময় প্যারীচরণ সবকাব মহাশয় 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক ও 'সুরাপান নিবারণী সভা'র সভাপতি ছিলেন। শিবনাথ তাঁহার সংসর্গে আসিয়া 'এডুকেশন গেজেটে' সর্ব্বদাই কবিতা লিখিতেন। এস· এন· ডট নাম দিয়া সাহেবীয়ানাকে আক্রমণ করিয়া 'এডুকেশন গেজেটে' অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানেও এখন আর তাহা পাওয়া যায় না। এই প্রকারে কবিতার স্রোতে যখন ভাসিতেছেন তখন হঠাৎ তাঁহাব অদৃষ্টে জীবনেব সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। ১৮৬৫ সালে তাঁহার পিতা আবার তাঁহাকে বিবাহ দেন। বর্দ্ধমান জেলায় দেপুর নামক গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্ব্বে শিবনাথের প্রাণে কোন প্রকার ধর্ম্মচিন্তার উদয় হয় নাই। তিনি লেখাপড়া করিতেন এবং অবকাশ সময়ে কবিতা লিখিয়া নিজের ও বন্ধুদিগের চিত্তবিনোদন করিতেন। শিবনাথ বাল্যাবধি সরল, রসিক, আমোদপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এই ঘটনায় তাঁর জীবনের ধারা একেবারে ফিরিয়া গেল। যে দেশে ব্রাহ্মণের সন্তান দুইটি কেন দশটি বিবাহ করিয়াও মনে কোন অশান্তি বা উদ্বেগ বোধ করে না, সেই দেশেরই ১৭।১৮ বৎসরের বালক শিবনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া মনের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। পিতাকে শিবনাথ বাল্যাবধি যমের ন্যায় ভয় করিতেন। কি করিয়া পিতার অবাধ্য হইতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। সেই পিতা যখন বলিলেন, "আবার তোমার বিবাহ দিব" তখন আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। প্রতিবাদ যে করেন নাই তাহা নয়, তখন বলিলেন "এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে? আমাকেই চিরকাল কষ্ট পেতে হবে।" তখন হরানন্দ শর্ম্মা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া পায়ের চটি খুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "কি পাজি! ফের্!" হায় অদৃষ্ট! শিবনাথ কোন দৈবের বশে ফিরিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা চলুন বাড়ী গিয়ে মার সম্মুখে কথা হবে।" শিবনাথ কাতরভাবে মাকে গিয়া বলিলেন, "মা, একি কাণ্ড হচ্ছে! আমার চিরদিনের যন্ত্রণার ব্যবস্থা হচ্ছে।" যে গোলোকমণি এত বড় "তেজস্বিনী মনস্বিনী" ছিলেন কোন্ দুর্দ্দৈববশতঃ তিনিও আজ বলিয়া বসিলেন, "বাবা জানই ত আমার একটা বই মাথা নেই, আমার এতবড় বুকের পাটা নেই যে কিছু বলি!"—সেই দুর্দ্দিনে গোলোকমণিও নীরব রহিলেন। শিবনাথ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। মনকে বুঝাইলেন যে রামচন্দ্র পিতার আদেশে চৌদ্দ বৎসর বনে গিয়াছিলেন, আমি না হয় চির জীবনের মত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিলাম। বিবাহ হইয়া গেল। প্রসন্নময়ী তখন ১৫ বৎসরের বালিকা, বিরাজমোহিনীর বয়স ১০ বৎসর হইবে। প্রসন্নময়ী যে বয়সে নিতান্ত শিশু ছিলেন তাহা নয় কিন্তু এমন সরলা ও শিশু-প্রকৃতিবিশিষ্টা ছিলেন যে, তিনি যখন শুনিলেন পতি পুনরায় বিবাহ করিবেন তখন কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত হইলেন না। তিনি তখন

দিদিশাশুড়ীর পরম স্নেহের পাত্রী হইয়া চাংগড়িপোতায় মামাশ্বশুরের বাড়ী বাস করিতেছেন। দিদিমা এই বিবাহ যাহাতে না হয় তার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি শিরে করাঘাত করিয়া কত কাঁদিলেন যার জন্য কাঁদিলেন তার কোন দুঃখ নাই। 'দিদিমা, আমি তোমার কাছে চিরদিন থাকিব' বলিয়া ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। শিবনাথ এবং প্রসন্নময়ী বিবাহিত হইয়াও এতদিন পরস্পরের অপরিচিত ছিলেন। প্রায় তাঁহাদের দেখাশুনা হইত না। দাম্পত্য সম্বন্ধ কি তাহা কেহই জানিতেন না, সুতরাং এক কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভিন্ন শিবনাথের এ বিবাহে বাধা কিছুই ছিল না। হরানন্দের সাময়িক ক্রোধের ফলে শিবনাথের জীবনে এত বড় একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। নিরপরাধা বালিকা প্রসন্নময়ী পাত্র কে না-জানিয়াই তাহার দাম্পত্য জীবন বিষময় হইয়া উঠিল। সতেরো বৎসরের বালক শিবনাথ তখনও এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন নাই, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পিতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইলেন। আর বিরাজমোহিনী। দশ বৎসরের বালিকা বিরাজমোহিনী। সেদিন স্বপ্নেও জানিলেন না যে আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত পিপাসাতুর চেনচেলেসের ন্যায় তাহাকে নারীজনবাঞ্ছিত সদাশয় প্রেমিক স্বামী লাভ করিয়াও প্রথম হইতেই দাম্পত্য সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। এই করুণ কাহিনী এই মর্ম্মান্তিক দহনের ইতিহাস স্মরণ করিলেও হৃদয়ে বিষম জ্বালা অনুভব করি। এ একদিন নয় দুইদিন নয় শৈশব প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে এই তিনটি প্রাণের নিদারুণ মর্ম্মযন্ত্রণার চিত্র দর্শন করিয়াছি। যখন জ্ঞান ছিল না, তখন জানি না কিন্তু বালক সময় হইতে বড়াইমা বলিয়া আমি ছায়ার ন্যায় আশৈশব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি। কিসে যে একদিন তাঁহার দগ্ধ হৃদয় শীতল হইত এবং তাহার কতার শোক হুলসিত করিয়া পাঠ করিয়া বুঝিতে পারি। এখন বুঝি কি জন্য লিখিয়াছিলেন -

> 'হায়! হায়! কারে বলি আমার প্রাণের
> কি যে প্রিয় কন্যাগুলি বর্ণিব তা কেমনে
> সুখে ভাস দেখে হাসি তাদের বদনে
> বহু পাপ, বহু কষ্ট আমার সংসারে
> বহু অনুতাপ, তাই ঈশ্বর আমারে
> ভুলাইতে নিষ্কলঙ্ক প্রসন্ন সবল
> সঙ্গীগুলি চারিদিকে দিলেন ঘেরিয়া।'

স্নেহশীল শিবনাথ সন্তান স্নেহের ভিতর ক্ষণিক তৃপ্ত শান্তি অনুভব করিতেন, কিন্তু তাহাতে কি এত বড় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়? অনেক বৎসর পরেও ডায়েরির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গভীর মর্ম্মবেদনার কথা লিখিত হইয়াছে। এ জ্বালা কখন শীতল হয় নাই--চিতাগ্নি কি তাহা শীতল করিয়াছে?—না, তাহাও সংশয় করি।

২৯ জানুয়ারি, ১৮৭৮ সালে লিখিতেছেন ঃ—

'জগদীশ্বর জানেন, আমার হৃদয়ে ভালবাসা কত অধিক। প্রসন্ন এবং বিরাজ উভয়কে কত ভালবাসি। * * * হায়! হায়! এমন কুকর্ম্ম কেন করিয়াছিলাম।" এই অনুতাপ অনুশোচনা চিরদিন হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহের পর হইতেই এই বৃশ্চিকদংশন আরম্ভ হইয়াছিল। দারিদ্র্যের ভিতরও শিবনাথ পরমানন্দে দিনপাত করিতেন। সংস্কৃত কলেজের দুরূহ পাঠ্য কণ্ঠস্থ করিয়া ও কবিতা লিখিয়া আপনার ও বন্ধুদের চিত্তবিনোদন করিতেন। সদানন্দ সদাপ্রফুল্ল শিবনাথের মুখে হাসি ছাড়া কেহ অন্য কিছু দেখে নাই। সেই শিবনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া গেলেন। সে কি গভীর

দুঃখ! সে কি মনস্তাপ!" তখনকার অবস্থা আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"আত্ম-নিন্দাতে মন অধীর যে তার আত্মনিন্দার কথা মনে হইলেও এখন শরীর কম্পিত হয়। আমি আমুদে উপহাসরসিক বন্ধুতাপ্রিয় মানুষ ছিলাম আমার হাস্য পরিহাস কোথায় উড়িয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। পা ফেলিবার সময় মনে হইত যেন কোনও নরকের গর্ত্তে পড়িয়া যাইতেছি। রাত্রি আসিলে মনে হইত আর প্রভাত না হইলেই ভাল হয়।"

তখনও শিবনাথ ছাত্র, এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন নাই। শুনিয়াছি ক্লাশে বসিয়া সম্মুখে বই রাখিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতেন। প্রাণের এই নিদারুণ দুঃখের অবস্থায় আপনা হইতেই ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কথায় বলিতেছি:

আমি বাল্যকাল হইতে পাড়ার সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা বিষয়ে আলোচনা করিতে ভালবাসিতাম। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি ঈশ্বরের সহিত, তাঁহার সম্বন্ধে কখনও গভীরভাবে চিন্তা করি নাই। ঈশ্বর চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক ক্লেশের অবস্থায় প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমার মানসিক অবসাদের কথা অবগত হইয়া আমাকে একখানি থিয়োডোর পার্করের Ten sermons and prayer পাঠাইয়া দেন। পার্করের প্রার্থনাটি ও নির্দেশ আমার মধ্যে নবজীবন আনিল। আমি প্রাতঃকালে ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একখানি করিয়া একটি প্রার্থনা লিখিয়া পাঠ করিয়া শয়ন করিতে লাগিলাম। কেবল তাহা নহে, দিনের মধ্যে প্রত্যেক দশ পনর মিনিট অন্তর ঈশ্বরকে স্মরণ করিতাম ও প্রার্থনা করিতাম।

এই প্রকারে প্রাণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শিবনাথ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া শান্তি লাভ করিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শিবনাথের পিতা নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বন করিয়া পুত্রের নিকট নাস্তিকতা প্রচার করিতেন। কিন্তু শিবনাথের প্রাণে নাস্তিকতা কখনও স্থান পায় নাই। যার অন্তরে যে ভাবের প্রবণতা নাই, তাকে বাহির হইতে কেহ কিছু শিখাইতে পারে না কিম্বা শিখাইলে তাহা স্থায়ী হয় না। শিবনাথের হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্মপ্রবণ, তাই তাতে নাস্তিকতা দাঁড়াইবে কি করিয়া? দুঃখে না পড়িলে কাহারও প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করা যায় না। তাই ত দুঃখ, রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতিকে মানবজীবনের পরীক্ষা বলা হইয়াছে। স্বর্ণে কলঙ্ক থাকিলে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন তাহা উজ্জ্বল হয়—তেমনি যে চরিত্রে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আছে দুঃখ বিপদে পড়িলে তাহা আরও উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হয়। কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে ভস্ম হয় কিন্তু স্বর্ণের বর্ণ আরও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয় একথা কি সত্য নহে?

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

ধর্ম্মচেতনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ

দ্বিতীয়বার বিবাহের পর হইতেই শিবনাথ প্রাণের যন্ত্রণায় ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা কি? কি করিয়া প্রার্থনা করিতে হয় জানিতেন না, আপনা হইতে তাঁহার প্রাণে ব্যাকুল প্রার্থনা উত্থিত হইল। ভগবান সে ডাকে সাড়া

দিলেন। প্রাণের শান্তি আসিল, বল আসিল। হৃদয়ে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া শিবনাথ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন :—

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক থাকে থাক্ ধন মান প্রাণ রে
পিতারে ভাবিয়া রব পদানত সমান রে।

সেই যে শিবনাথ ভগবানের চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন তার পর একদিনের জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্য সংসারদোলায় তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হয় নাই। হৃদয়ে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হইল, তাহা তাঁহার সেই সময়ের লিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। এই স্থানে আমরা তাঁহার সেই সময়ের লিখিত দুই একখানি পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। এই পত্রখানি ১২৭৬ সালে ইং ১৮৬৯ সালে শিবনাথ তাঁহার পিসতুতো ভাইকে লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানির ভিতর তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই আখ্যান মধ্যে এই পত্রখানি অতিশয় মূল্যবান বলিয়া মনে করি। পত্রখানি অতিশয় দীর্ঘ মাঝে মাঝে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মেজদাদা,

আপনার পত্র পাইয়া বড় দুঃখিত হইলাম। * * * আমার যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কথা হয়, তখন যে সে কাজটাকে অতি ঘৃণার্হ বলিয়া বুঝি নাই, এমন নয়। কারণ, যার একটু বুদ্ধি আছে সেই বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বাবাকে এত ভয় করিতাম যে কিরূপে বাবার অবাধ্য হইতে হয় তাহা জানিতাম না। সুতরাং বাবা যখন অনুরোধ করিলেন, তখন "না" বলিতে সাহস হইল না। * * এ বিষয়ে লোকে বাবাকে দোষ দেয় কিন্তু আমি আমাকে অধিক দোষ দিই, বাবা ত ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন। আমি বুঝিয়া সুঝিয়া স্বেচ্ছাভাবে করিয়াছি। কিন্তু সেই বিবাহের সময় আমার কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা আপনার মনে থাকিতে পারে। যখন হাতে হাতে কন্যা সম্প্রদান করে, তখন সেই হস্তের উপর আমার চক্ষের জল পড়ে। সে যাহা হউক বিবাহের পর আমার মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। কোথাও শান্তি পাই না। সে সময়ে বাবাকে যে সব পত্র লিখিয়াছিলাম ফাইল হইতে লইয়া দেখিবেন, তাহাতে হয় ত আজিও চক্ষের জলের দাগ আছে। সেই মনের কষ্টের সময় কে যেন মন হইতে বলিতে লাগিল "তুমি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য পরের উপর নির্ভর করিও না, যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বোধ হয় কর। তোমার দিকে আমি আছি।" আমি তদবধি স্বাধীন ভাবে নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাবিয়া কাজ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। এবং সেই ঘোর মনোযন্ত্রণার সময় আপনা হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে গোপনে ও প্রকাশে সমাজে গিয়া ঈশ্বরোপসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। বাবা কলিকাতায় আসিলেন ও আসিয়া আমাকে সমাজে যাইতে নিষেধ করিলেন, আমি তখন মনের কষ্টে একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম, সুতরাং রুক্ষভাবে বাবাকে আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানাইলাম। সেই আমার আমার প্রথম অবাধ্যতা। আমার আজিও মনে আছে, বাবা সেদিন মনে কি ক্ষোভ পাইয়াছিলেন ও কাঁদিয়াছিলেন। যে পুত্র এত বাধ্য ছিল যে, দাঁড়াইয়া মার খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত, তথাপি একবারও পালাইবার চেষ্টা করিত না, যে পুত্র এত বাধ্য ছিল যে, তাঁহার অনুরোধে মস্তকে চিরজীবনের যন্ত্রণা লইতে কুণ্ঠিত হইল না—সেই পুত্রের অবাধ্যতা নিশ্চয় বাবার প্রাণে সেদিন বড় লাগিয়াছিল। যাহা হউক বাবা একপ্রকার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। * * * তারপর দুই বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন অবাধ্যতা মনে হয় না। কেবল

বাবা কয়েকবার কালীনাথবাবুদের বাড়ীতে উপাসনা করিতে যাইতে নিষেধ করেন, আমার কর্ত্তব্য বোধ হওয়াতে যাই। পরে মহালক্ষ্মীদের সঙ্গে থাকা, এবিষয়ে বাবা আমাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করেন, আমি শুনি নাই। কারণ পূর্ব্বে তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বিপদের সময় ছাড়িয়া যাওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলাম। ফলতঃ সে সময়ে যে বাবার আজ্ঞাপালন না করিতে সাহস হইয়াছিল তজ্জন্য আনন্দিত আছি।

* * * তাহার পর আমার উপবীত পরিত্যাগ। এ বিষয় সম্পর্কে যাহা সত্য ঘটনা তাহা লিখিতেছি। উপবীত ফেলা উচিত ও আমিও যে ফেলিব তাহা আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, শুধু মুখে নয় খাতায় লেখা পড়া ছিল। এতদিন কেবল মার কষ্টের ভয়ে ও বাবার ভয়ে ফেলি নাই। পরে ৭ই ভাদ্র যখন ব্রাহ্মমন্দির খোলে তখন সাধারণের সমক্ষে সমাজে প্রবেশ করি তখনও উপবীত ছিল। ফেলিব কি না ভাবিও নাই। পরে দুই তিন দিন পরে ফেলি। কিন্তু তখনও না ফেলিলে নয় এরূপ হয় নাই। সুতরাং মার অনুরোধে আবার লই। লইয়া অবধি এ বিষয় যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই উচিত বোধ হইতে লাগিল—এবং হৃদয় হইতে কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল "পরিত্যাগ কর, তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমি আছি।" এই কথাগুলি পাগলামির মত বোধ হইবে—কিন্তু সত্য গোপন করা যদি আমার স্বভাব হইত ইহা ত গোপন করিতে পারিতাম। যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল তাহা অকপটে বলিলাম। এইরূপ মনের পরিবর্ত্তন হইলেও যখন লইয়াছি তখন আর শীঘ্র ফেলিব না ভাবিয়া রাখিলাম। মধ্যে বলিয়া রাখি আমার এই মনের পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে আমি নিজে কেশববাবুদিগকে লিখিয়াছিলাম যে, আমি নিতান্ত কর্ত্তব্য ও অবশ্য পরিহার্য্য বোধ না হইলে অনর্থক মা বাপকে এত কষ্ট দিতে ভালবাসি না। অতএব উপবীত রাখা যদি আপনাদের নিতান্ত মতবিরুদ্ধ হয় আপনাদের মণ্ডলী হইতে আমার নাম কাটিয়া দিবেন। আবার উপবীত ফেলিতে কেহ কেহ উপদেশ দেন কিন্তু আমি সকলকেই এক উত্তর দিই। যতদিন অবশ্য পরিহার্য্য না হইতেছে ফেলিতেছি না। অবশেষে সেই অবস্থাই আসিল। আমার বিশ্বাস জগদীশ্বর আদেশ করিলেন আমিও তাহা পালন করিতে বাধ্য হইলাম! * * * এই ত আমার এই কয় বৎসরের ইতিহাস দিলাম। এখন আপনারা বিবেচনা করুন আমি সরল জ্ঞানে কর্ত্তব্য জ্ঞানে বরাবর কাজ করিয়াছি ও করিতেছি কি না? বাহাদুরী দেখাবার যদি ইচ্ছা হইত তাহা হইলে অন্য অনেক উপায় ছিল। মেজদাদা! স্নেহময়ী পুত্রবৎসলা মাতার হৃদয়ে ছুরি দিয়া এত বিরোধেও যে পিতার অনুগ্রহ একদিনের জন্যও কমে নাই তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়া এমন প্রাণপ্রিয় চিরদিনের বন্ধু বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি আমি এতই সুখী হইব যে তাহার জন্য বাবার সহিত সমকক্ষতা করিলাম, একদিকে সাংসারিক কষ্ট আর একদিকে পিতামাতার হাহাকার ও লোকনিন্দা, ইহার মধ্যে কি এমন সুখ পাইব যাহার জন্য এত সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম। তবে কেন এরূপ কাজ করিলাম, উত্তর এই—আমিও সুখের আশায় করি নাই। কর্ত্তব্য বোধ হইল তাই করিলাম। উপবীত ফেলিয়াই যে পদ্য কয়টি লিখি তাহার দুই একটি তুলিয়া দিতেছি তাহা দেখিয়া আমার যথার্থ ভাব বুঝিবেন।

ভাসাবে জীবন তরী বিপত্তির সাগরে,
যাই দেব দেখো দেখো রক্ষা করো আমারে,
মোর পক্ষ ছিল যারা

বিপক্ষ হইল তারা
ঘেরিল সকল দিক অপবাদ আঁধারে।
বহিল প্রবল ঝড় মস্তকের উপরে।
মাতার নয়ন জলে ভেসে গেল ধরণী
নিঃশ্বাস বহিতে আর পারে না গো পরাণী
সর্ব্ব সাক্ষী দয়াময়
দেখিতেছ সমুদায়
হৃদয়ে সংগ্রাম মোর চলে দিবা রজনী
কাতর হইয়া কাঁদি ধর আসি আপনি।
হে ঈশ্বর দয়াময় নাম নাকি ধরিয়া
অপার বিপদ সিন্ধু শিশু যায় তরিয়া
আমি ত বালক বই
জগদীশ কিছু নই
দেও হে অভয় নাম ধরি ভাল করিয়া
হাসি হাসি জলে ভাসি যাই পাল তুলিয়া।

মেজদাদা! এখন বলিলে মানিবেন না। কিন্তু তথাপি আমি বলি যদি কেহ বলেন যে আমা অপেক্ষা তার পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি অধিক তাহা স্বীকার করি না, তবে আমি পিতামাতার আদেশ প্রতিপালন অপেক্ষা ভগবানের আদেশ পালন অধিক উচিত বলিয়া বিবেচনা করি। * * * মেজদাদা! যে সব কথা আমি আজ আপনাদিগকে বলিলাম, দুই ঠোঁট খুলিয়া সে কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না। কেবল ঈশ্বরকেই সকল ডাকিয়া বলি। আরও মনে অনেক দুঃসহ যন্ত্রণার কথা রহিল * * কিন্তু তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহাকেও বলিব না। মরিলে তাহা আবার চিতার সহিত মিশাইবে। মেজদাদা! আমি জানিয়া শুনিয়া পিতামাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আমি যদিও দুর্ব্বল, জগদীশ্বর সে সব সহ্য করিবার শক্তি দিবেন সন্দেহ নাই। তিনি বাবা ও মাকে সান্ত্বনা দিন ও তাঁহাদের মনযন্ত্রণা দূর করুন। তাঁহারা এতকাল আমাকে যে আশীর্ব্বাদ দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এখন আমার প্রিয়তমা ভগ্নীদিগকে ও আপনাদিগকে দিন। যদিও একমাত্র পুত্র হয়ে পিতার গৃহে স্থান পাইলাম না ভাবিলে বড় ক্লেশ হয়, তথাপি জগদীশ্বর তাহাও সহিবার শক্তি দিয়াছেন। এ প্রাণ যতদিন থাকিবে ততদিন সত্য ও সৎ বলিয়া যাহা বোধ হইবে তাহা করিব। কর্ত্তব্য জ্ঞানের নিকট স্নেহময়ী জননীকেও বলি দিতে যে প্রস্তুত, কার সাধ্য তাহাকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত করে, ত্রিভুবনের লোক একত্র হইলেও আমি যাহা উচিত বলিয়া ভাবিব তাহা হইতে আমাকে কেহ ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আমি বার বার পিতার দ্বারে যাইব বার বার তাড়িত হইয়া আসিব, যত কাল তাঁহারা থাকিবেন, এইরূপ করিব। অবশেষে যখন মরিব তখন যদি আপনারা বাঁচিয়া থাকেন কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, "যাহা করিয়াছিলাম, সরল ভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞানেই করিয়াছিলাম। মনে কিম্বা কার্য্যে পারৎ পক্ষে কপটতার লেশ মাত্র রাখি নাই।" আর লিখিতে পারিতেছি না। বাবাকে হাতে পায়ে ধরিয়া এই পত্রখানি শুনাইবেন, কারণ, শুনিয়া যদি তিনি প্রসন্ন হন, পরে লিখিব।

ইতি—
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

এই সালেই স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মাতুলমহাশয়কে লিখিত পত্র হইতেঃ—

"সবিনয় প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,

মহাশয়! একাদিক্রমে বাবার দুইখানি পত্র পাইয়া সমুদয় অবগত হইলাম। আপনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ। বাবা ও মাকে যে স্নেহান্ধ হইতে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। আবার অপরদিকে আমি তাঁহাদের এত কষ্ট বুঝিয়াও যে তাঁহাদেব অভিলাষ মত চলিতে পারিতেছি না. তাহাতে বোধ হয় আপনার ও তাঁহাদের মন হইতে অন্তরিত হইতেছি। কিন্তু আপনি তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বোঝেন, সুতরাং আমার ধর্ম্মালোচনা কেবলমাত্র কুমন্ত্রণার কিংবা বাহাদুরীর ফল না ভাবিয়া আমার সরল বিশ্বাস অথবা ধর্ম্মান্ধতার ফল বিবেচনা করিয়া আমাকে দয়া করিতে পারেন। আপনাকে ও আপনার মত গুরুজনদিগকে বিরক্ত করায় আমার বাহাদুবী অথবা স্বার্থ নাই, অথচ কার্য্যে তাহা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আপনার অনুবোধে ও মাতাপিতার অনুরোধে উপবীত লইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা রক্ষা কবিতে পাবিলাম না। উপবীত লওয়ার পর উপাসনা করিতে গেলেই যেন অন্তর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। * * * উপাসনা না করিলে বাঁচি না, অথচ উপাসনা কবিতেও পারি না। আপনি আমাকে ধর্ম্মান্ধ বলিবেন, কিন্তু আমি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই সবল হৃদযে নিবেদন কবিলাম। এইমাত্র প্রার্থনা যে কপট কাল্পনিক কথা মাত্র বলিয়া লইবেন না। * * *

আমি দেখিলাম যে, জগদীশ্বর আমাকে দুইদিকে থাকিতে দিলেন না, অতএব আমি বিনয়ে বলিতেছি, ঈশ্বরেব মুখ চাহিয়াই ভাসিলাম। * * * আপনাব মত মাতুলের হৃদয় হইতে যাওয়া, পিতামাতাব অসহ্য কষ্ট দেখা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদিগের ঘৃণায় আস্পদ হওযা এ সকল ক্ষতি ধে অন্তরের কোন গুরু অনুরোধে স্বীকার করিতেছি এইমাত্র বিবেচনা করিবেন। * * *

যদি চিরজীবনেব মত আমাকে হৃদয় হইতে দূর কবা উপযুক্ত দণ্ড বিবেচনা করেন করুন। যদি দয়া কবা স্থির হয কবুন। কেবল আমার পিতামাতাকে বলিয়া পাঠান যেন তাঁহাবা আবাব আসিয়া উপস্থিত না হন। আর আমি অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। যাহা হউক আমি জানিয়া শুনিয়া আপনাদের সকলের কথার অবাধ্য হইলাম সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; এবং অনুগ্রহ করিযা আর আমাকে কোন মৌখিক তর্কে লইয়া যাইবেন না। * * *

ইতি—

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য"

উপরের পত্র দুইখানি হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম চিত্র পাঠকগণ দেখিলেন। অতঃপর এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা লেখা ভাল দেখায় না। ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের সহিত পরিচিত হইবার তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না। উপাসনা আরম্ভ হইলে সমাজে যাইতেন, এবং শেষ হইবার পূর্ব্বেই উঠিয়া আসিতেন, পাছে কেহ দেখে। শিবনাথের সহাধ্যায়ী উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (যিনি পরে বিলাতে গিয়া ডাক্তার হইয়া আসেন) এই সময় ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। তিনি শিবনাথের নিকট সর্ব্বদাই কেশবচন্দ্র সেনের গল্প করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদি শিবনাথকে পড়িতে দিতেন। শিবনাথের তাহা বড়ই ভাল লাগিত। একদিন উমেশচন্দ্র শিবনাথ এবং যোগেন্দ্রনাথকে (বিদ্যাভূষণ) কেশববাবুর সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শিবনাথ উমেশচন্দ্রের সহিত কেশব-

বাবুর কলুটোলার বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াও দ্বারদেশ হইতে উমেশচন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া আসিলেন। এমনই তাঁহার লজ্জা ছিল। তখন কেশবচন্দ্র সেন চিৎপুর রোডে কলিকাতা কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একদিন শিবনাথ এবং উমেশচন্দ্র সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে বৃষ্টি হওয়ায় সেই বাড়ীর দ্বারে গিয়া আশ্রয় লইলেন। উমেশচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন 'চল উপরে কেশববাবুর নিকট যাই, দেখাব কি মানুষ তিনি।' শিবনাথ লজ্জায় কিছুতেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। সেখানকার দ্বারবানের সঙ্গে দুজনে কেশববাবুর সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। সেই নিরক্ষর অজ্ঞ ভৃত্য এইটুকু জানিত যে তাহার মনিব এক অসাধারণ ব্যক্তি; তাঁহার কথা শুনিলে লোকের হৃদয় শীতল হয়। উমেশচন্দ্র তাহার প্রভুভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য কেশবচন্দ্রের কল্পিত নিন্দা আরম্ভ করিলেন। সে দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল 'আমার মনিব মানুষ নয় দেবতা, ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন"—সেদিন তাঁহাদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যিনি ভৃত্যের চিত্ত হরণ করেন, ভৃত্য যাঁহাকে দেবতা বলে তিনি কোন্ উপাদানে গঠিত। শিবনাথ অন্তরে ব্রাহ্মদিগের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেও ব্রাহ্মসমাজের কেহই তাঁহাকে জানিতেন না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত শিবনাথের সহাধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহারা তখন ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি—কেশবচন্দ্রের সম্মুখীন হইতে শিবনাথের সাহস হইত না কিন্তু বিজয়বাবুদের বাসায় মধ্যে মধ্যে যাইতেন। এক এক দিন বিজয়বাবুরা শিবনাথকে রাত্রে আর ভবানীপুরে যাইতে দিতেন না, তাঁহাদের বাসায় রাখিতেন, শিবনাথ অন্তরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেও তাঁহাদের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়া রাঁধুনীর হাতে খাইতে বড়ই ঘৃণা বোধ করিতেন—এত বিষম বোধ হইত যে রাত্রে ভাল ঘুম হইত না। হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের শুনিতে আর বাকি থাকিল না যে, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে—শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনে করিলেন কলিকাতায় গিয়া পুত্রকে শাসন করিয়া এই সর্ব্বনাশের বীজ সমূলে উৎপাটন করিবেন। পুত্রকে আসিয়া বলিলেন, "শুনিতে পাই তুমি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করিয়াছ আর ও-কর্ম্ম করিও না, ব্রাহ্মসমাজে যাইতে পারিবে না"—পুত্র বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "বাবা আপনার আজ্ঞা অদ্যাবধি লঙ্ঘন করি নাই, আপনার সকল আজ্ঞা শুনিতে আজও প্রস্তুত আছি—কিন্তু আমার ধর্ম্মজীবনে হাত দিবেন না, আমি ব্রাহ্মসমাজে না গিয়া পারিব না।"—হরানন্দ জীবনে পুত্রের মুখে এমন কথা শোনেন নাই, তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, আর কোনো কথা বলিলেন না; নির্জ্জনে অনেক চক্ষের জল ফেলিলেন। বিষণ্ণমুখে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া গোলোকমণি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন —বলিলেন, "তোমার মুখ কেন এমন; শিবনাথ ভাল আছে ত?"—তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন 'সে মরেছে।" জননী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল "কই শিবুর অসুখের কথা ত শুনি নাই।" হরানন্দ তখন বলিলেন "মরণের বাড়া হয়েছে, সে ব্রাহ্মসমাজে যায়।"

শিবনাথের জীবনে আর এক ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। শিবনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বিশ্বাসানুযায়ী জীবনযাপন করিবেন। সংকল্প এক মুহূর্ত্তে করা যায় কিন্তু তাহা পালন করা অত্যন্ত কঠিন। জীবনের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। গ্রীষ্মের এবং পূজার ছুটীতে বাড়ীতে গেলেই শিবনাথকে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের পূজা করিতে হইত, এবার মনে মনে স্থির করিলেন "আর কাহারও পূজা করিব না।" ছুটীতে বাড়ীতে গিয়া আমাকে নিজ সংকল্পের কথা [illegible] [illegible] বলিয়াছিলেন,

কত কাঁদিলেন; শিবনাথ ক্রমাগত হাত জোড় করিয়া বলেন "মা ক্ষমা করো, আর বোলো না, আর আমা দ্বারা ওসব হবে না।" পিতার কর্ণে এ ভীষণ বার্ত্তা গেল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভীষণ ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, জোর করিয়া পূজা করাইবার জন্য লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিলেন। শিবনাথ ধীর ভাবে বলিলেন "কেন বৃথা মারিবেন, যতই মারুন আমি ধীরভাবে সহ্য করিব কিন্তু পূজো আর করিব না, আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও, আর আমায় ওখানে লইয়া যাইতে পারিবেন না।" হরানন্দ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আধঘণ্টা কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে শিবনাথের মূর্ত্তিপূজা বন্ধ হইল। তবু হরানন্দ আজ্ঞা করিলেন "গ্রামের ব্রাহ্ম ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না।" শিবনাথ উপাসনার সময ভিন্ন আর তাঁহাদের নিকট যাইতেন না। শিবনাথ বলিতেন "তখন কেহ উপাসনা করিবে শুনিলে ৪।৫ মাইল পথ হাঁটিযা গিয়া উপাসনায় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে কিছু কষ্টকর ছিল না।"

যে সমযে শিবনাথ এই অগ্নিপরীক্ষায পাব হইলেন, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে অপরিচিত। গ্রামেব ব্রাহ্ম যুবাকযটি ভিন্ন আব কাহাকেও জানিতেন না। বাহিরের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জানিতেন বিজযকৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্তকে।

এই সকল সংগ্রামেব মধ্যে ১৮৬৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া শিবনাথ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেন ও বৃত্তি পাইলেন। ১৮৬৭ সালের শেষভাগে শিবনাথ মহেশ চৌধুরীব বাড়ী হইতে কলিকাতা শাঁখারিটোলায় জগৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উঠিযা আসেন। ভবানীপুরে চৌধুবী মহাশযদিগের বাড়ীতে বাস কালে জগৎচন্দ্রবাবুব সহিত তাহাব পুত্র মহিমের সূত্রে শিবনাথের আলাপ হয়। মহিমের সহিত কখন কখন এক গাড়ীতে সংস্কৃত কলেজে যাইতেন। মহিমও সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন। মহিম শিবনাথকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন, এবং দাদার মত ভালবাসিতেন। জগৎচন্দ্রবাবুও শিবনাথকে ছেলের মতই ভালবাসিতেন, মহিমেব মাও শিবনাথকে ছেলেব মত আদব যত্ন করিতেন। জগৎচন্দ্রবাবুরা কলিকাতায় উঠিযা আসিলেন, এবং শিবনাথকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবাব জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শিবনাথ তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। কলিকাতায় তাঁহাদেব বাড়ীতে আসিলেন। শিবনাথ মহিমকে পড়াশুনা বলিয়া দিতেন। সেখানে শিবনাথেব অত্যন্ত আদব ছিল. তিনি যে পর সে বাড়ীর কাহারো সে জ্ঞান ছিল না। শিবনাথ চিরদিন নারী জাতির পরম বন্ধু। সে বাড়ীতে মহিমের এক মামাতো বোন কিছুদিনের জন্য আসিয়াছিল। শিবনাথকে সে আপনার ভাই-এর মতই ভালবাসিত, "দাদা" "দাদা" বলিয়া ডাকিত। এই মেয়েটির তখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স। এক বৃদ্ধ স্বামীব হাতে পড়িয়াছিল, শ্বশুরবাড়ীর নাম করিলেই তাহার চক্ষে জলধারা বহিত।

তাই শিবনাথ কখনও তাহার নিকট শ্বশুরবাড়ীর কথা তুলিতেন না—অনুমানে বুঝিতেন শ্বশুরবাড়ীতে তাহার সুখ ছিল না। তখন হইতে বাল্যবিবাহের উপর তাঁহার দারুণ ঘৃণা জন্মিল। এই দুঃখিনী বালিকা শিবনাথের নিকট পড়াশুনা করিত, "দাদা" বলিতে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিত। শিবনাথ যখন শাঁখারিটোলা হইতে উঠিয়া আসেন, বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মহিমের মামাতো বোনটি যখন শুনিল "দাদা" অন্যত্র যাইবে সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইল। যাইবার দিন শিবনাথ যখন বিদায় লইতে গেলেন বালিকাটি গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করে, আর ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। শিবনাথও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জগৎচন্দ্রবাবুর স্ত্রী শিবনাথকে এতই ভালবাসিতেন যে, দুদিন তাঁকে

দেখিতে না পাইলে, অস্থির হইয়া ডাকিয়া পাঠাইতেন। ইঁহার সম্বন্ধে শিবনাথ 'আত্মজীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"আমি জগৎবাবুর পত্নীকে মাসী বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আমাকে ইঁহারা স্বামী স্ত্রীতে যে কি ভালবাসিতে লাগিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণনা হয় না ঃ শেষে এমনি দাঁড়াইল যে আমি দুই চারিদিন দেখা না করিলে মাসী ডাকিয়া পাঠাই-তেন এবং আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিযা তিরস্কার করিতেন। এটা ওটা খাওয়াইতেন, ঘরকন্নার কত কথা শুনাইতেন, আমার নিকট কিছুই গোপন রাখিতেন না। হায়! তাঁহাদের 'কঠিন ছেলে' ব্রাহ্মসমাজেব কাজে ও নানা বিষয়ে মাতিযা কোথায় গিয়া পড়িল, তাঁহারা কোথায় গিযা পড়িলেন! মাসীকে আর কত কাল দেখিলাম না --এখন ভাবিযা দেখি মাসী যে আমাকে 'কঠিন ছেলে' বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিয়াছিলেন।"

শিবনাথ এমনি কবিয়া জগৎচন্দ্রবাবুর পরিবারেব সহিত প্রেমেব বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন। আজীবন শিবনাথ এমনই কবিযা পবকে আপন করিয' গিয়াছেন।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায ॥

বিধবা-বিবাহের আন্দোলন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিতও তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। হরানন্দ পুত্রকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়া অতি শৈশবে কলিকাতায আনিযাছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুসাবে শিবনাথকে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি না করিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। শিবনাথ আশৈশবে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়াছেন, এবং বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শিবনাথেরও জ্ঞানোদয় হইতে না হইতে বিদ্যাসাগর তাঁহাব নিকট এক আদর্শ পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। যখন বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদের তুফান বঙ্গ-দেশে উঠিল তখন শিবনাথের বাসায় লোকেরা বিদ্যাসাগরের সহিত বন্ধুতার খাতিরে অন্তরে বিধবা-বিবাহের সমর্থন করিতে লাগিলেন, শিবনাথও অজ্ঞাতসারে ঐ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। নারীজাতির পরম সুহৃদ শিবনাথ কি বিধবার দুঃখ নিবারণে উদাসীন হইতে পারেন? সংস্কারক হইবার সাধ শিবনাথের ছিল না। প্রাণের আবেগে তিনি বিধবা-বিবাহের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহারই বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে ১৮৬৮ সালে তাঁহার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিধবা-বিবাহ করিলেন।

এই বিবাহের ইতিহাস এই ঃ—

ঈশানচন্দ্র রায় নামক একজন যুবা তখনকার দিনে মেডিকেল কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। মহালক্ষ্মী নাম্নী তাহার একটি বালবিধবা ভগ্নী ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—যিনি শিবনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন—তিনি মহালক্ষ্মীকে পড়াইতেন। ঈশানের ইচ্ছা হইল, তিনি মহালক্ষ্মীকে আবার বিবাহ দেন। শিবনাথের হেমদাদা মেয়েটির অনেক প্রশংসা করিতেন, এবং মেয়েটির

জন্য একটি পাত্রের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। আশ্চর্য্য যোগাযোগে ঠিক এই সময় যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া শিবনাথকে সে কথা বলিতেই শিবনাথ চটিয়া লাল হইলেন। 'যাও তোমাব একথা বলতে লজ্জা হয না? আমার সঙ্গে ওরূপ বোলো না।"—যোগেন্দ্র বিষণ্নমুখে ফিরিযা গেলেন। আর একদিন শিবনাথ নিজেই বলিলেন "ও ভাই যোগেন, বিয়ে যদি কবতে হয, একটি ছোট আট বছরেব মেয়েকে কোন মুখে কববে, একটি বয়ঃপ্রাপ্তা বালবিধবাকে বিয়ে কর।" আশ্চর্য্য শিবনাথেব প্রভাব, যোগেন্দ্র বিধবা-বিবাহ কবিতে সম্মত হইলেন। তখনই শিবনাথ মহালক্ষ্মীব সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থিব কবিযা ফেলিলেন। ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব এ প্রস্তাবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাবই মতে, তাঁহারই সহাযতায ২০।১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটেব বাড়ীতে চুপি চুপি মহালক্ষ্মীব বিবাহ হইযা গেল। বিদ্যাসাগব মহাশয় বিবাহেব ব্যযভার বহন করিলেন, এবং মহালক্ষ্মীকে অলংকাবও দিলেন। শিবনাথের উদ্যোগেই এ বিবাহটি হইযা গেল। কিন্তু ফলস্ববূপ যখন ঘোব নির্য্যাতন আরম্ভ হইল, তাহাও মস্তক পাতিযা সহ্য করিতে হইল। একবাব জীবনেব আব একটি কঠিন পবীক্ষায শিবনাথ পাব হইলেন।

মহালক্ষ্মীব বিবাহেব পব শিবনাথ তাঁহাদেব বাড়ীতে আসিযা বাস কবিতে লাগিলেন। তখন শিবনাথ বৃত্তি পান যোগেন্দ্রও বৃত্তি পাইযা থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে ভিন্ন বাসা কবিযা পবিবাব প্রতিপালন কবা অসম্ভব। শিবনাথ উদ্যোগী হইযা এ বিবাহ দিযাছেন, সুতবাং তাঁহাব প্রখব দাযিত্বজ্ঞান এই নির্দ্দেশ করিল যে, তাঁহাব উৎসাহে যখন এই বিবাহ হইযাছে তখন তিনি ইঁহাদেব সকল প্রকার নির্য্যাতন হইতে রক্ষা কবিতে বাধ্য। ধন মন দেহ প্রাণ দিযা এই উৎপীড়িত দম্পতীর সেবা কবিযাছেন এবং সকল প্রকাব উৎপীড়ন সহ্য কবিযাছেন। যোগেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব আত্মীযস্বজন এই বিবাহের ঘোব বিবোধী ছিলেন—তাহা হইবাবই কথা। শিবনাথেব পিতাও পুত্রেব এই কার্য্যে একেবাবে খড়্গহস্ত হইলেন। লোকে চাবিদিকে ছিঃ ছিঃ কবিতে লাগিল। যোগেন্দ্রচন্দ্রেব নবপবিণীতা পত্নীর কষ্টের একশেষ হইল, কি চাকব, এমন কি ধোপা নাপিত্ত কিছুই পাওয়া যায না। শিবনাথ একাই তাঁহাদের অবিভাবক তাঁহাদের ভৃত্য, তাঁহাদেব সহায় সম্বল সকলই। তিনি বাজাব করিতেন, তেতলায় জল তুলিযা দিতেন, কাঠ কাটিতেন, মহালক্ষ্মীর অসুখ হইলে বন্ধন করিতেন, মহালক্ষ্মীকে পড়াইতেন, ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। মানুষ যে পবেব জন্য এতটা করিতে পাবে, ইহা অদৃষ্টপূর্ব্ব, এবং অশ্রুতপূর্ব্ব। পূজনীয অন্নদায়িনী মাসীমা লেখিকাকে বলিযাছেন, "শিবনাথবাবু মহালক্ষ্মীদের জন্য যা করতেন, তা আমাদের দেখা, মানুষ যে পরের জন্য এতটা করতে পারে তা চক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস কবতে পাবে না। আমার আজও মনে আছে, শিবনাথ-বাবু বাজার করিয়া আনিযা বড় মাছ দেখাইয়া হাসিয়া মহালক্ষ্মীকে বলিতেন, "এই বড় মাছটা জামাইবাবুর (অর্থাৎ—যোগেন্দ্রনাথের), এটা দাদাবাবুর (অর্থাৎ—মহালক্ষ্মীর ভ্রাতা ঈশানচন্দ্রের), আব ছোট্ট ছোট চুনো পুঁটি দেখাইয়া বলিতেন এগুলি আমাদের দুই ভাই বোনেব।"—তখন বলিতে গেলে শিবনাথই সংসারের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন কবিতেন। মহালক্ষ্মীর ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র তখন মেডিকেল কলেজে পড়েন। তিনি প্রায়ই বাসায় থাকিতেন না। যোগেন্দ্রনাথকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট সর্ব্বদাই যাইতে হইত, মধ্যে মধ্যে তিনি বাসায় একেবারেই আসিতেন না। কাজেই এমন ঘটিত যে মহালক্ষ্মীকে লইয়া শিবনাথকে একাকী থাকিতে

হইত। মহালক্ষ্মীর জন্য শিবনাথকে অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। ঘরে বাহিরে নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছে। এই সময়কার কথা বলিতে শিবনাথ চিরদিনই আনন্দ বোধ করিতেন। কি আশ্চর্য্য তাঁর প্রকৃতি ছিল, তিনি যে কত কষ্ট মহালক্ষ্মীর জন্য সহ্য করিয়াছেন. তাহা না বলিয়া বারবারই বলিতেন মহালক্ষ্মী তাঁহাকে কি রকম ভালবাসিতেন। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই মহালক্ষ্মী সধবা অবস্থায় কলেরা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শিবনাথ তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল।

এই বৎসরই অর্থাৎ—১৮৬৮ সালে শিবনাথের প্রথম কন্যা হেমলতার জন্ম হয় —এই বৎসরই শিবনাথ এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নানা কারণে এই বৎসরটি শিবনাথের জীবনে—বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। হেমলতার জন্ম হইলে তিনি এক পত্রে লিখিতেছেন ঃ—

১২৭৫ সাল ১৭ই আষাঢ—"শুনিলাম আমার একটি কন্যাসন্তান হইয়াছে। মাতাঠাকুরাণীকে বলিবেন যেন তিনি তজ্জন্য দুঃখিত না হন। জগদীশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহাই শিরোধার্য্য। আমি পুত্র অপেক্ষা কন্যার অধিক গৌরব করিয়া থাকি। পরে নিবেদন যেন আমার অজ্ঞাতসারে তাহার সম্বন্ধ করা না হয়।" এই সময়ের লিখিত ২রা শ্রাবণ ১২৭৫ সালের পত্রে লিখিতেছেন ঃ—

এ দেহে জীবন থাকিতে কাহারও অনুরোধে অথবা সমাজের ভয়ে আমার দ্বারা আর কোন প্রকার অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে না।" আবার ৮ দিন পরে লিখিতেছেন ঃ—

"কর্ত্তব্য কার্য্যের নিকট লোকভয় নাই, গুরু বা বন্ধুদের অনুরোধ নাই, এবং কালাকালের বিচার নাই। কুল সম্বন্ধ প্রথায় যে বিষময় ফল তাহা আমি দেখিয়াছি শুনিয়াছি ভুগিয়াছি ঠেকিয়াছি, শিখিয়াছি সুতরাং পুনরায় সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত নাক কান কাটার কর্ম্ম। আমি সজ্ঞানে কখনই কন্যার সম্বন্ধ করিতে পারিব না। এত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও হরানন্দ ভট্টাচার্য্য পৌত্রীর সম্বন্ধ করিয়া বসিলেন। শিবনাথের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। এই সময়েই আবার তাঁহার এফ-এ পরীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইল। মহালক্ষ্মীর জন্য সংগ্রাম ও পরিশ্রম করিয়া শিবনাথ পাঠের সময় একেবারেই পাইতেন না, সুতরাং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। সে সময়ে ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা হইত। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিল, শিবনাথের পড়িবার সময় একেবারেই নাই। সেই সময় একদিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি একটা ভাল কাজে আছ কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আমি তোমার জন্য চিন্তিত হয়েছি। তুমি আগামী পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখবে বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্চে তুমি স্কলারসিপ পাওয়া দূরে থাক পাশ হও কিনা সন্দেহ।" শিবনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন ঃ—

"তাঁহার কথা শুনিয়া মনে হইল যেন আমি কোন পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াইয়াছি। আমার সম্মুখে গভীর গর্ত্ত, এক পা বাড়ালেই তাহার মধ্যে পড়িব। আমার সম্মুখে যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত তাহা এক নিমেষের মধ্যে চক্ষের সমক্ষে আসিল। মনে হইল স্কলারসিপ যদি না পাই, তাহা হইলে যাহাদের জন্য এতটা সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাদের আর সাহায্য করিতে পারিব না। [illegible] ও মহালক্ষ্মী সাহায্যের অভাবে কষ্ট পাইবেন, ভাবিয়া চক্ষে জল আসিল। "ঈশ্বর রাখ এই বিপদে রাখ" বলিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া

ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আমার প্রতি একটা অনুগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে একবার জীবন-মরণ পণ করিয়া দেখি।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অনুগ্রহ ?" আমি বলিলাম, "আমি মনে করিতেছি, কলিকাতা হইতে পলাইযা ভবানীপুরে থাকিব, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কলেজে আসিব না, একাগ্র চিত্তে পাঠে মন দিব, এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইব। কলেজে না আসার জন্য আমার স্কলারসিপ যদি না কাটেন, তাহা হইলেই এইরূপ করিতে পারি। তৎপরে তিনি সমুদয় বিবরণ খুলিয়া লিখিযা ডিরেক্টরের নিকট হইতে অনুমতি আনিলেন, এবং আমাকে ছুটী দিলেন।

"আমি যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া আমার শৈশবের আশ্রয়-দাতা ভবানীপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহাদের নিকট আড়াই মাসের জন্য একটি ঘর চাহিলাম, যে ঘরে আমি একাকী থাকিব। প্রাতে একবার স্নান-আহারের সময় বাহিরে যাইতাম ও রাত্রে আহারের সময় আধ ঘণ্টার জন্য যাইতাম, নতুবা দিনরাত্রি ঐ ঘরে যাপন করিতাম। এই আড়াই মাসের মধ্যে শয্যাতে যাই নাই। বড় ঘুম পাইলে দুইচারি ঘণ্টা পুস্তক মাথায় দিয়া সেই ঘরে ঘুমাইতাম। * * * এইরূপ পড়িতে পড়িতে শরীর মন সময় সময় বড় অবসন্ন হইত। তখন পড়া ফেলিয়া দিয়া বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিত। সেই সময় যোগেন ও মহালক্ষ্মীর মুখ মনে করিয়া দুরন্ত প্রতিজ্ঞা আসিত। * * প্রাণ যাক আর থাক্ একবার মরণ বাঁচন চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। অমনি মনে প্রার্থনার উদয় হইত—'হে ঈশ্বর এই সংগ্রামে আমার সহায় হও', তখন দিনের মধ্যে বহুবার প্রার্থনা করিতাম। লোকে যেমন শ্রমের মধ্যে বার বার চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বার বার প্রার্থনা করিয়া সবল হইতাম।"

এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে শিবনাথ এক প্রকার পঙ্গু হইয়াই পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু হায়! যাহার জন্য এই ভীষণ আত্মনিগ্রহ—সেই মহালক্ষ্মী পরীক্ষার একমাস পরেই মারা গেলেন। সেই তীব্র শোকের সময় সংবাদ আসিল, শিবনাথ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ইউনিভার্সিটির প্রথম শ্রেণীর স্কলারসিপ ৩২ টাকা, ভাষার জন্য ডফ স্কলারসিপ ১৫ টাকা, এবং সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্কলারসিপ ১২ টাকা, সর্ব্বসমেত ৫৯ টাকার বৃত্তি পাইলেন। মহালক্ষ্মীর মৃত্যুতে এ সংবাদ শিবনাথের প্রাণে নিদারুণ জ্বালা উপস্থিত করিল। ভাবিলেন, "হায় মহালক্ষ্মী, তোমার জন্যই এত সংগ্রাম করিলাম, এত স্কলারসিপও পাইলাম, তোমার সাহায্যের জন্য তার এক কপর্দ্দকও লাগিবে না!" কিন্তু শিবনাথের জন্য অন্য এক কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করিতেছিল—সেই পরীক্ষার সময় অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইবে। এ স্কলারসিপ মহালক্ষ্মীর জন্য নহে, শিবনাথের নিজের স্ত্রী ও কন্যার জন্যই ব্যয় করিতে হইবে, একথা কেবল বিধাতারই মনে ছিল,—তিনিই তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার বিধান!

১৮৬৮ সালে শিবনাথের উদ্যোগে আবার একটি বিধবার বিবাহ হইল। এক্ষেত্রেও বিপুল দায়িত্বের বোঝা তাঁহাকে বহন করিতে হইল। যেমন যোগেন্দ্র, ঈশান, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তেমনি প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র উপেন্দ্রনাথও শিবনাথের একজন বন্ধু ছিলেন।

তিনিও সেই সময় সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ তখনকার দিনের একজন অত্যগ্রসর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি কিছু দিন মান্দ্রাজে বাস করেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া Indian Radical League নামে একটি সভা স্থাপন করেন। উপেন্দ্রনাথ সংস্কারকদিগের নেতা ছিলেন। ১৮৬৮

সালের মধ্যভাগে হঠাৎ একদিন, উপেন্দ্রের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ কি বলা যায় না। উপেন্দ্র বলিলেন যে কলেরায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উপেন্দ্রনাথ একজন বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। এই মেয়েটি ভবানীপুরে থাকিত। শিবনাথ উপেন্দ্রনাথের সহিত গিয়া তাহাকে চুরি করিয়া আনেন এবং তৎপর দিন উপেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের আনুসঙ্গিক ঘটনা আত্মচরিতে বিবৃত আছে। উপেন্দ্রনাথের পরিবারের জন্য শিবনাথকে অনেক দিন বিব্রত হইতে হইয়াছে। কত যে অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। উপেন্দ্রনাথ অবশেষে পীড়িত হইয়া সপরিবারে শিবনাথের স্কন্ধে পতিত হন। শিবনাথ তখন অতি কষ্টে স্কলারসিপের অর্থ দ্বারা নিজের ব্যয় চালাইতেছেন, এই অবস্থায় আর একটি পরিবারেব সমুদায় ভার তাহার স্কন্ধে পড়িল, তন্মধ্যে একজন পীড়িত। শিবনাথ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর আবার উপেন্দ্রের অনেকগুলি ঋণ তাঁহাকেই শোধ করিতে হইল। এই সময়-কার ঋণ শোধ করিতে তাঁহাকে বহুকাল ধরিয়া অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে কত নিন্দা করিত—প্রতারক প্রবঞ্চকের আশ্রয়দাতা বলিত, কিন্তু শিবনাথ কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। উপেন্দ্রের পত্নী যে ক্লেশ পাইবেন, ইহা প্রাণে সহ্য হইত না। উপেন্দ্রনাথ পরে বিলাত গিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া কারারুদ্ধ হন সেই উপেন্দ্রনাথও শিবনাথেব বন্ধু ছিলেন! এত-গুলি ঘটনার যোগাযোগে ১৮৬৮ সাল শিবনাথের জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া ছিল।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

এফ-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া যশের মুকুট শিরে পরিয়া, শিবনাথ ১৮৬৯ সালে প্রবেশ করিলেন। এই বৎসরের প্রথম ভাগে তাঁহার ক্লাশের ছাত্রগণ সংস্কৃত ‘বেণীসংহার’ নাটক অভিনয় করিবার আয়োজন করিল। শিবনাথ চিরদিন অভিনয দর্শন করিতে ভালবাসিতেন। রঙ্গালয়ে সর্ব্বদাই যাইতেন। যখন হইতে বারাঙ্গণাগণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী হইল তখন হইতে শিবনাথ আর রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন নাই। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে বেণীসংহারের অভিনয় হয়। কলেজের অধ্যক্ষগণ অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন, পরে শিবনাথের উপর সুনীতি রক্ষার ভার দিয়া অভিনয় করিতে অনুমতি দেন। শিবনাথকে এই অভিনয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এই অভিনয়ের ব্যাপার লইয়া ১৮৬৯ সালের আরম্ভ আর শিবনাথের দীক্ষা ব্যাপারে ইহার সমাধা হইল। ১৮৬৫ সালে শিবনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে তাহার জীবনের গতি একেবারে ফিরিয়া গেল। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিলে তিনি কখনই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িতেন না। যেমন দাবানলে দগ্ধকলেবর হইয়া মৃগ প্রাণভয়ে শীতল জলের পার্শ্বে গিয়া পড়ে তেমনি হৃদয়ের তীব্র যাতনায় একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তিনি

ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। এই সময় অতি স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বরের চরণে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যতই প্রার্থনা করেন ততই হৃদয়ে শান্তি ও বল লাভ করিতে থাকিলেন। যেন কে তাঁহার হৃদয়ে অমৃত হস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে সবল করিয়া, আলোক ধরিয়া গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিল। শিবনাথ নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। প্রথম বাণী এই শুনিলেন, "আমার নির্দেশ অনুসারে চল, মানুষের ভয় আর করিও না।" যে শিবনাথ পিতাকে যমের মত ভয় করিতেন, তাঁহার কোন আদেশের অন্যথা আচরণ জীবনে কখনও করেন নাই, তিনি দৃঢ়তার সহিত পিতাকে জানাইলেন যে, ঠাকুরপূজা আর করিবেন না, ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া পরিত্যাগ করিবেন না।

এ সংসারে অকস্মাৎ কিছুই হয় না। প্রত্যেক বস্তুর যেমন ছায়া আছে, প্রত্যেক বৃক্ষের শিকড় আছে প্রত্যেক কার্য্যের তেমনি হেতুও আছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান শিবনাথ- যাহা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা হইলেন কি করিয়া? কেন হইলেন?—ইহাও এক কঠিন প্রশ্ন। হাঁ, এ কথা সত্য বটে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে তাহার স্বগ্রামের উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, হরনাথ বসু ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। মজিলপুর গ্রামের অপর সাধারণ বালকের উপর সে প্রভাব যতদূর উঠিয়াছিল, শিবনাথের উপর তদপেক্ষা অল্প বই অধিক হইবার কথা নহে, কারণ শিবনাথ অধিকাংশ সময়ই কলিকাতায় থাকিতেন। গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয় লইয়া যখন হুলস্থূল ব্যাপার মামলা মকদ্দমা চলিতেছিল, তখন শিবনাথ কলিকাতায়; আর সকল বালককে ছাড়িয়া শিবনাথের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আসিয়া পড়িল কেন?—ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম শিবনাথের জন্মগত প্রকৃতি, দ্বিতীয় শিবনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহরূপ দুর্ঘটনা। শিবনাথ যে হরানন্দ শর্ম্মার পুত্র ছিলেন, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। হরানন্দ সত্যপ্রিয়, নির্ভীক, নির্লোভ সহৃদয় মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মযুবকদিগের প্রতি গ্রামের জমিদারগণ যখন অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন, তখন তেজস্বী হরানন্দের সমুদয় সহানুভূতি উৎপীড়িত ব্রাহ্মযুবকদিগের প্রতি ধাবিত হইল। যে দিন বারুইপুরের আদালতে শুকুর মোল্লা ঘটিত মকদ্দমায় ব্রাহ্মযুবকদিগের জয় হইল, তখন তিনি উমেশচন্দ্রের বাড়ী গিয়া তাঁহার ভ্রাতার নিকট আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, "ধর্ম্মের জয় সুনিশ্চিত।"—শিবনাথ দেশে গিয়া যখন ব্রাহ্মযুবকদিগের নিকট যাইতেন তখন গোলোকমণি পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের নিকট যাইতে বারণ করিতেন। হরানন্দ সে কথা শুনিলেই বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কেন সে সঙ্গে থাকিলে দোষ কি? ওর গায়ে কি সোণার গহনা আছে যে লোকে চুরি করে নেবে।" যাই হোক প্রথম প্রথম হরানন্দ ব্রাহ্মদিগের অনুরক্ত ছিলেন। যখন হইতে শিবনাথের মন ফিরিল তখন হইতে তিনি ব্রাহ্মদিগের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। শিবনাথের ব্রাহ্ম হইবার প্রধান কারণ দ্বিতীয়বার বিবাহ। এদেশে কি ব্রাহ্মণ সন্তানের দুইবার বিবাহ হয় না? না, মজিলপুরের জ্ঞাতিবর্গের ভিতর কাহারও দুই স্ত্রী ছিল না? কিন্তু এমন অনুতাপের কথা কে কবে শুনিয়াছে? কি প্রকার উন্নত হৃদয় হইলে লোকের এ প্রকার তীব্র পাপবোধ হওয়া সম্ভব? তীব্র পাপবোধ আধ্যাত্মিক শুচিবায়ুর লক্ষণ নিশ্চয় বলিতেই হইবে। মানব জন্মমুহূর্ত্ত হইতে নানা প্রকার ভাবপ্রবণতা ও শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহবা কবিত্বশক্তি, কেহবা তীক্ষ্ণ মেধা, কেহবা আধ্যাত্মিকতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। শিবনাথও অপরাপর গুণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতির এইটি বিশেষত্ব—তিনি কবি ছিলেন, মেধাবী ছিলেন, প্রেমিকও ছিলেন, কিন্তু

সর্ব্বোপরি ছিলেন আস্তিক! একথাটি না বুঝিলে তাঁর জীবনের কিছুই বোঝা যাইবে না। প্রাণময় শিবনাথ তাই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া শত বৃশ্চিকের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। তৎপরে ক্রমে কোন সূত্র ধরিয়া কোথায় আসিয়া পড়িলেন তাহা পাঠকবর্গ দেখিবেন। শিবনাথ প্রার্থনাকে জীবনের সম্বল করিয়া যখন লইলেন, তখনও তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব হয় নাই। ভবানীপুরে মহেশ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে যখন থাকিতেন, তখন সেখানকার আদি সমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও পাকড়াশি মহাশয় সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। শিবনাথ সেই সকল উপদেশ শুনিয়া পরম উপকৃত হইতেন। ক্রমে বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুর প্রভাবে দিন দিন ব্রাহ্ম-সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবও এই সময়ে যথেষ্ট কার্য্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে শিবনাথ নিজেই ধরা পড়ি-লেন। তিনি যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন তখন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সকলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছেন। শিবনাথ আত্মচরিতে এ সময়কার কথা লিখিয়াছেন ঃ—

"যতদূর মনে হয় তাহাতে দেখিতে পাই, তখন বিবাদপরায়ণ উন্নতিশীল দল অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি সমাজের দিকেই আমার অধিক আকর্ষণ ছিল। আমার যতদূর স্মরণ হয় আমার জ্ঞাতি দাদা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (যিনি আদি সমাজের ব্রাহ্ম ও তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন এবং আমার নিকট সর্ব্বদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দলের নিন্দা করিতেন) তিনিই এই আকর্ষণের প্রধান কারণ ছিলেন। আমার মাতুল স্বগীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও উন্নতিশীল দলের পক্ষে ছিলেন না। তাহাও একটা কারণ হইতে পারে। সেই কারণে উন্নতিশীলদলের সঙ্গে আমি অধিক সংস্রব রাখিতাম না।"

দেখা যাইতেছে শিবনাথ ব্রাহ্মদিগের বিশেষ সংস্রবে থাকিতেন না। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন, সেই উপলক্ষ্যে নগর-কীর্ত্তন হইবে। শিবনাথ শাক্ত বংশের ছেলে, সংকীর্ত্তনের উপর চিরদিন বীতরাগ। তাঁর মামাও সোমপ্রকাশে নগর-সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন—কীর্ত্তন নেড়া নেড়ীর কাণ্ড এই তাঁহাদের ধারণা। শিবনাথও নগর-সংকীর্ত্তনের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। ভাবিলেন "এ আবার কি।" ১৮৬৮ সালের ১১ই মাঘের উৎসবের দিন শিবনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন। উপাসনার পরে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন, এমন সময় কয়েকজন বাবু বলিতে বলিতে আসিতে-ছেন "মহাশয় দেখলেন না কেশব শহর মাতিয়ে তুলেছেন।" নগর-সংকীর্ত্তনের ব্যাপারে যে হাস্যাস্পদ না হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা শিবনাথের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইল। তাঁহাদের হাতে নগর-সংকীর্ত্তনের কাগজ ছিল, শিবনাথ সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

"তোরা আয়রে ভাই এতদিনে দুঃখের নিশি হল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতির বিচার।" ইত্যাদি

কি কথাই, শিবনাথের প্রাণে প্রবেশ করিল! তিনি অনুভব করিলেন, এ ডাক তাঁহার জন্য! এই ত তাঁর প্রাণের কথা! ভাবিলেন, এমন করে ডাকে যারা তারা ত আমার আপনার জন! অমনি উন্নতিশীল দলের উৎসবে যোগ দিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন! শুনিলেন সিঁদুরিয়াপট্টীতে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে উৎসব হইবে

—অমনি সেই দিকে ছুটিলেন। আদি সমাজে তাঁর আহারের নিমন্ত্রণ ছিল! আর আহার! আর এক ভোজের নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে পেঁাছিয়াছে! গোপাল মল্লিকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখেন, তখন উপাসনা আরম্ভ হয় নাই। ঘর সাজান প্রভৃতি নানা আয়োজন হইতেছে। তখন সেখান হইতে আবার কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে যাত্রা করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শিবনাথকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিযা গলা জড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন—যেন প্রাণের ভিতর পুরিয়া লইলেন। সেখান হইতে আবার তাঁহাদিগের সহিত গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে আসিলেন। সে দিন ব্রাহ্মগণ অভুক্ত রহিলেন। শিবনাথের মনের অবস্থা এইরূপ যে তাঁর আর ক্ষুধা. তৃষ্ণার জ্ঞান নাই। সমস্ত দিন উৎসব চলিল। ভিড়ের মধ্যে বসিবার স্থান নাই। শিবনাথ সারাদিন এককোণে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে উপাসনায় যোগ দিলেন। দিনও গেল—রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিয়া সেই কোণেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরক্তি নাই। সে দিন হইতে শিবনাথ উন্নতিশীলদেব সহিত বাঁধা পড়িলেন। প্রাণে প্রাণে যোগ হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি লজ্জায় কেশববাবুর সম্মুখে যাইতেন না। সেই সময়কার কথা আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন ঃ—

"মধ্যে মধ্যে রবিবার প্রাতে কেশববাবুর কলুটোলার বাড়ীতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম, কিন্তু কীর্ত্তনের সময় ব্রাহ্মদিগেব অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকার চীৎকার করিতেন, ও পরস্পরের পা ধরাধরি করিতেন, কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন এজন্য ভাল করিয়া উপাসনায় যোগ দিবার ব্যাঘাত হইত। সে কারণে সর্ব্বদা যাইতাম না।"

১৮৬৮ সালে মুঙ্গেরে যে নবপূজার আন্দোলন উপস্থিত হয়—কলুটোলার বাটীতেই যেন তাহার সূচনা হইযাছিল মনে হয। যদুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই নবপূজার আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং প্রতিবাদ করিয়া কেশববাবুর দলকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে গিয়া ডাক্তারী ব্যবসায় অবলম্বন করেন। শিবনাথ সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়কার কথা শিবনাথ লিখিয়াছেন ঃ—

"কেশববাবু হইতে আমার চিত্ত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাঁহাদিগকে নরপূজা অপরাধে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই—ব্রাহ্মদিগের আচরণকে কেবলমাত্র ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য বলিয়া মনে হইয়াছিল।" যাহোক ১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত কেশবচন্দ্রের পুনর্ম্মিলন হইল। শিবনাথ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয় মন্দির-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গোস্বামী মহাশয়ের পুনর্ম্মিলনের জন্য কলাইঘাটায় এক উৎসব হয়। শিবনাথ এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। সেই উৎসবের দিন তিনি সর্ব্বপ্রথমে কেশববাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপাসনার পর যখন নরপূজার আন্দোলন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, "মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে কে লেখেন তা আমি জানি না, কিন্তু ঐ পত্রিকাতে যদুবাবুর ও বিজয়বাবুর কথার যে প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার অনুমোদিত হয় নাই।" কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় এক অপরিচিত যুবার মুখে এই প্রকার শুনিয়া বিস্মিত হইয়া, কাহার নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই দিন হইতে শিবনাথকে তিনি বিশেষ ভাবে চিনিয়া রাখিলেন।

১৮৬৯ সালের ৭ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আসিল। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সেই এক মহাদিন। সে দিন যে মহাযজ্ঞ হইল, তাহাতে কত আত্মা চিরদিনের মত ভগবানের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল। সেদিন একুশটি যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তন্মধ্যে শিবনাথও একজন। সেদিন যে সকল

যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীনাথ দত্ত, ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের সকলের নিকট পরিচিত।

প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে শিবনাথের মাতাপিতা মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদের সে সময়কার প্রাণের অবস্থা অবর্ণনীয়। তুমুল আন্দোলন, কঠিন সংগ্রাম আরম্ভ হইল। শিবনাথের জননী চাংগড়ীপোতায় আসিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া শিবনাথের গলায় আবার উপবীত তুলিয়া দিলেন। সামান্য দুইগাছি সূতা, কিন্তু শিবনাথের তাহা কালসর্পের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। তিনি যে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকিয়া প্রাণ শীতল করিতেন তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এখন যেমন ভগবানের নাম করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। এখন যেন ভগবানের নাম আর করিতে পারেন না—শিবনাথের এই সময়কার হৃদয়ের অবস্থা মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে লিখিত এক পত্র হইতে জানিতে পারা যাইবে। 'আমি আপনার অনুরোধে ও মাতাপিতার অনুরোধে উপবীত লইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। উপবীত লওয়ার পর উপাসনা করিতে গেলেই যেন অন্তর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কপটতা জানিয়া একটি বিষয় গোপন করিয়া রাখিয়া ঈশ্বরকে ডাকা যেন উপহাস করা মাত্র বোধ হইতে লাগিল। আমি নিতান্ত কষ্টের অবস্থায় পড়িলাম। যখন একবার লইয়াছি আর শীঘ্র ফেলিব না বলিয়া এক প্রকার সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি যে ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়াছিলাম তাহা আপনার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না জানি সুতরাং এ বিষয় অধিক বলিতে চাহি না। এই মাত্র বলিব যে সে অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া বাঁচিয়াছি। উপাসনা না করিলে বাঁচি না অথচ উপাসনা করিতে পারি না। আপনি আমাকে ধর্ম্মান্ধ বলিবেন, কিন্তু আমি যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই অকপটহৃদয়ে নিবেদন করিলাম। এই অবস্থায় পড়িয়াও আমি সহজে আচার পরিত্যাগ করিতে চাহি নাই, কারণ আমার পরীক্ষা সম্মুখে, মাতার সেই কাতরতা এখনও মনে আসে, এবং আপনার আরও বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা। আমি সকল বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই আবার ফেলিতে পরামর্শ দিলেন না। কেবল জগদীশ্বর যেন অন্তর হইতে অভয় দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট কত বিপদ জানাইলাম কিন্তু তিনি বলিতে লাগিলেন যে 'আমাতে বিশ্বাস করিয়া অটল থাকিলে কোন বিপদই থাকিবে না। আপনি এই কথাগুলি পড়িয়া বোধ হয় আমাকে পাগল ভাবিয়া মনে মনে হাসিবেন। কিন্তু আমার মনে যথার্থই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া আপনার গোচর করিয়াছিলাম। আমি যেরূপ কষ্ট পাইয়াছি তাহার নিকট কোন বিপদের ভয় হয় না। আশা করি আপনি আমাকে প্রকৃত ভাবে লইবেন।"

* * *

বাস্তবিক বলিতে কি ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত সময় শিবনাথের ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাল বলিতে হয়। এই সময় ব্যাকুলতা প্রার্থনাশীলতা, দীনতা প্রভৃতি তাঁর ভিতর উজ্জ্বল ভাবে দেখা গিয়াছিল। তাঁর চিত্ত যখন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন যে ধর্ম্মভাবেরই শ্রীবৃদ্ধি হইল তাহা নহে, একদিকে যেমন বিশ্বাস, ভক্তি, প্রার্থনাশীলতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অপরদিকে তেমনি জ্ঞানানুশীলনে অনুরাগও বর্দ্ধিত হইল। কঠিন মানসিক যন্ত্রণার ভিতর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করিলেন, বিধবা-বিবাহের প্রবল আন্দোলনের ভিতর, বিপন্ন পরিবারের জন্য দিবারাত্রি শ্রম করিতে করিতে এফ-এ পরীক্ষা দিয়া, কি উচ্চ স্থান

অধিকার করিয়া প্রচুর বৃত্তি লাভ করিলেন! আবার ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের ভিতর বি-এ পরীক্ষা দিয়া কি গৌরবই না অর্জ্জন করিলেন! শিবনাথের জীবনের পথ চিরদিনই সংগ্রামময় এবং কণ্টকাকীর্ণ ছিল।

১৮৬৯ সালের আর একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব। দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরেই, শিবনাথের পত্নী প্রসন্নময়ী ও শিশু-কন্যা হেমলতাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। এই সময় শিবনাথ পটলডাঙ্গায় হরগোপাল সরকার মহাশয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করিতেন।

শিবনাথের জীবনে আবার এক নূতন সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কুলবধূ, কখন শহরে আসেন নাই--ব্রাহ্মসমাজ কি জানেন না শিক্ষিতা নারী কিরূপ হয় জানেন না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অশিক্ষিতা। শিবনাথ তখন উৎসাহী যুবক, সমাজ-সংস্কারক, স্ত্রী-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, অন্নদায়িনী ও রাধারাণী (হরগোপাল সরকার মহাশয়ের পত্নী—রাধারাণী লাহিড়ী তাঁর ভগ্নী) প্রভৃতি বঙ্গনারী তাঁর আদর্শ, তিনি সুশিক্ষার জন্য প্রসন্নময়ীকে শিক্ষিতা রমণী-দিগের নিকট আনিয়া রাখিলেন। ভাবিলেন শীঘ্রই প্রসন্নময়ী তাঁদের দৃষ্টান্তে সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার ত্যাগ করিবেন। কিন্তু মানুষের জন্মগত সংস্কার কি সহজে যায়? দেশ হইতে আসিবার সময় পথে শিবনাথ প্রসন্নময়ীকে "নথ" খুলিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। শিবনাথ যতই বলেন "ওগো নথটা খোলো—সেখানে মেয়েরা নথ পরে না।" প্রসন্নময়ী ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছেন কথা কহেন না, কিন্তু মস্তক নাড়িয়া জানাইলেন, নথ খোলা তাঁর ইচ্ছা নয়। নথটি কিছুতেই খুলিলেন না। শিবনাথ তখন বড়ই লজ্জায় পড়িলেন কি করিয়া পাড়া-গেঁয়ে সং লইয়া শিক্ষিতা নারীদের নিকট উপস্থিত করেন! কিন্তু প্রসন্নময়ী যতই অশিক্ষিতা হউন না, নিজের খুঁটিতে শক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া জাতি-বিচার নাই দেখিয়া প্রথম প্রথম তাঁর কি প্রকার কষ্ট হইত, তার বর্ণনা তাঁর মুখেই শুনিয়াছি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে অপর জাতির ভাত খাইলে, না জানি কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, সে ভাত কি পেটে সহ্য হইবে? হয়ত বা প্রাণই যাইবে। অপর জাতির ভাত ব্রাহ্মণের উদর কখন বরদাস্ত করে না এই তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল। একটু গোময়ের জন্য কিরূপ লালায়িত হইতেন, স্বামীকে একটু "গোবর" আনিয়া দিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিতেন—আমরা এসব গল্প শুনিয়া কতই না হাসিয়াছি; কিন্তু বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রথম প্রথম প্রসন্নময়ীর দিন বড় কষ্টেই গিয়াছে তার ফল তাঁর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শিবনাথ এই সময় পত্নী ও শিশুকন্যাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। প্রসন্নময়ীকে শিক্ষিতা করিবার উৎসাহও তাঁহার অল্প ছিল না। প্রসন্নময়ীকে পড়াইবার জন্য একজন মেমকে নিযুক্ত করা হইল। সেই মেম প্রসন্নময়ীকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অধিক উৎসাহী ছিলেন। তিনি আদি পিতামাতা আদম ও হবার গল্প প্রসন্নময়ীকে তাঁর সেই অপূর্ব্ব বাঙ্গলায় বিবৃত করিয়া বলিতেন। দুঃখের বিষয় প্রসন্নময়ী তাঁর কথার মর্ম্ম বুঝিতেন না, মেমের প্রকাণ্ড কুকুর ও তাঁর রক্তমুখ দেখিয়া তাঁর অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত, কোন পড়াই ভাল করিয়া বলিতে পারিতেন না। মেম একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ, শালিখ পাখীর কয়টা পা?" প্রসন্নময়ী কুকুরের দিকে আড়ে আড়ে চাহিতে চাহিতে উত্তর দিলেন, "শালিখ পাখীর চারটা পা।" মেম ত অবাক! তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "টুমি শালিখ পাখী কখনো ডেখিয়াছ?" উত্তর, "হাঁ।" মেম, "টখন চারিটা পা টুমি ডেখিয়াছ?" প্রসন্নময়ী তখন ভাবিয়া দেখেন যে শালিখ পাখীর পা ত দুটি

বই চারটি কখন দেখেন নাই। মেম চলিয়া গেলে প্রসন্নময়ী একা একা হাসিয়া কুটপাট, এমন সময় শিবনাথ ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একাই যে হেসে খুন, ব্যাপারখানা কি!" প্রসন্নময়ী বলিলেন, "কি কাণ্ড করেছি, মেমকে শালিখ পাখীর চারটা পা বলেছি"—

শিবনাথ—তা কি করে বললে?

প্রসন্নময়ী—বাবারে, যে তাঁর বাঘের মত কুকুর, আমি ভয়ে আধমরা হয়ে থাকি।

প্রসন্নময়ীকে সকলেই চিরদিন 'শালিখ পাখীর চারটা পা' বলিয়া ক্ষেপাইতেন, শিবনাথও ক্ষেপাইতে ছাড়িতেন না। এই ত গেল শালিখ পাখীর গল্প, আর একবার আদম হবার গল্প ভুলিয়া গিয়া নিমগ্নচিত্তে পাঠরত স্বামীকে বারবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষের আগে কি ছিল?" এই প্রশ্নে উত্যক্ত হইয়া শিবনাথ অন্যমনস্ক-ভাবে উত্তর দিলেন 'মানুষের আগে বাঁদর ছিল।" প্রসন্নময়ীর এ উত্তর মনঃপূত হইল না, মেমের বিস্তৃত গল্প মোটেই বানরের মত সহজ নয়। পত্নী অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মেম ত তা বলেনি।" শিবনাথ বলিলেন, "মেম না বলুক তুমি ঐ কথা বোলো।" যথা সময়ে প্রসন্নময়ী ঐ উত্তর দিতেই মেমের চক্ষু দুটি কপালে উঠিয়া গেল—তিনি প্রসন্নময়ীকে মারেন আর কি! সেইদিন শিবনাথের সঙ্গে মেমের অনেক তর্ক হইল। এবং সেই শেষ মেমের কাছে প্রসন্নময়ীর বিদ্যাচর্চ্চা। তৎপরে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি আশ্রমের প্রচারকদিগের নিকট পড়িতেন। ভাবিলে অবাক হইতে হয়, এই প্রসন্নময়ী কি হইয়াছিলেন—শিবনাথের যোগ্যা সহ-ধর্ম্মিণীরূপে কি সেবাব্রতই উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন!

স্ত্রী-কন্যাকে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আনিয়াও শিবনাথ মাতা পিতার সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখিতেন তাহার নিদর্শনস্বরূপ সেই সময় ভগ্নীকে লিখিত পত্র-খানি উদ্ধৃত করিলাম।

পটলডাঙ্গা

১২৭৬, ১০ই কার্ত্তিক

ঠাকুরদাসি।

আমি এখানে আসার পর আর চিঠিপত্র লেখ না কেন? তোমরা কে কেমন আছ, তাহা আমি জানি না। মা কেমন আছেন লিখিবে। তিনি যেন হতাশ না হন। তাঁকে বলিবে যে আমরা এখানে উত্তম আছি। খুকির পেটের ব্যারাম সারিয়া যাইতেছে। তিনি যেন সে জন্য চিন্তিত না হন। আপাততঃ আমাকে বড় নির্দ্দয় বলে বোধ হবে, আপাততঃ মনে হবে আর বুঝি আশা রইল না কিন্তু তাঁকে বলিও যে, বিপদের দিন যদিও যায় না, এরূপ কিন্তু তাহা চির দিন থাকে না। বোন, তোমরা কটি বাবা ও মার আদরের ধন হইয়া থাক। আমি তাঁদের স্নেহ হইতে অনেক অন্তর হইব সন্দেহ নাই। কারণ বারবার তাঁদের যেরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতেছি, তাহাতে যে তাঁরা এখনও আমাকে মার্জ্জনা করিয়া স্নেহের চক্ষে দেখিবেন তাহা আশা হয় না। তবে স্নেহ নিম্নগামী। যাহোক তুমি মাঝে মাঝে পত্র লিখিবে এবং নীচের পত্রখানি মাকে পড়িয়া শুনাইবে।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

স্ত্রী কন্যা লইয়া নূতন সংসার পাতিয়া শিবনাথের দিন একপ্রকার সুখেই যাইতে লাগিল—যদিও সংগ্রামের অবসান হইল না।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

ভারতাশ্রম

যে সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় কলিকাতার স্থানে স্থানে পারিবারিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীশ্বর মিত্র শ্যামবাজার ব্রাহ্ম সমাজ, এবং মণিলাল মল্লিক সিন্দুরিয়াপটীর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মণিলাল মল্লিক আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। ইহারই পুত্রদ্বয় গোপালচন্দ্র মল্লিক ও পালচন্দ্র মল্লিক উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়াছিলেন। শিবনাথের দীক্ষাগ্রহণের কিছুদিন পরেই শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপস্থিত। সে সময় কাশীশ্বরবাবু জীবিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পাকড়াশী মহাশয়ের সে উৎসবে আচার্য্যের কার্য্য করিবার কথা ছিল। কাশীশ্বরবাবু, শিবনাথকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে উৎসবে তাঁকে দ্বিজেন্দ্রবাবু ও পাকড়াশী মহাশয়ের সঙ্গে বেদীতে বসিতে হইবে। শিবনাথের উপর উপদেশ দিবার ভার ন্যস্ত হয়। ইতিপূর্বে শিবনাথ কখনও ব্রাহ্মসমাজে মুখ খুলিয়া কিছু বলেন নাই, লজ্জা ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন কিন্তু অসম্মত হইলেন না। উপদেশটি লিখিয়া পড়িলেন। কিন্তু সেদিনকার উপদেশ এমন চমৎকার হইল যে বেদী হইতে নামিতে না নামিতে দ্বিজেন্দ্রবাবু কোলাকুলি করিয়া শিবনাথের উপদেশের অনেক প্রশংসা করিলেন। শ্রোতাগণ সকলেই পরম প্রীত হইলেন। ২১ বৎসর বয়সে এই শিবনাথের প্রথম আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইল। প্রথম উদ্যোগেই এমন সফলতা সচরাচর দেখা যায় না। সকলেই জানিত শিবনাথ কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্র ও কবি তিনি যে ব্রাহ্মসমাজের উৎকৃষ্ট আচার্য্য হইবেন সেইদিন তার লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল। সেদিনকার উপদেশের কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সিন্দুরিয়াপটীর পারিবারিকসমাজে তাঁকে স্থায়ীভাবে আচার্য্যের কার্য্য অনেক দিন করিতে হইয়াছিল। যেথাই থাকুন, প্রতি শুক্রবার সিন্দুরিয়াপটীতে উপাসনা করিতে যাইতেন। এই উপাসনার জন্য সমুদয় সপ্তাহ ধরিয়া প্রস্তুত হইতেন এবং যাহাতে উপাসকগণের বিশেষ উপকার হয় সেজন্য চিন্তা করিতেন। শিবনাথের প্রকৃতিতে দায়িত্বজ্ঞান চিরদিন উজ্জ্বল ছিল যে কোন কাযই হউক লঘুভাবে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। অনেক দিন সিন্দুরিয়াপটীর সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করাতে তাঁর এই মল্লিক পরিবারের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। গোপালচন্দ্র মল্লিক যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন শিবনাথের প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব পোষণ করিতেন। ১৮৭০ সালের প্রথমেই কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত যাত্রা করেন। দীক্ষিত হওয়ার পর কেশবচন্দ্রের সহিত শিবনাথের বিশেষ যোগ স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত গমন করিলে শিবনাথ তাঁর বিচ্ছেদ বড় তীব্রভাবে অনুভব করেন। কেশবচন্দ্রের বিলাত গমনোপলক্ষে তিনি যে কবিতা রচনা করেন তাতে তাঁর সেই সময়কার মনের ভাব কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইয়াছে। কয়েক মাস পরেই কেশবচন্দ্র নব ভাব, নব উৎসাহ নবোদ্যম লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই পরম উৎসাহে নানাবিধ সাধু কার্য্যের সূচনা করিলেন। এই বৎসরেই শিবনাথের দ্বিতীয়া কন্যা অসময়ে জন্মগ্রহণ করিল। ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির তাহাকে বাঁচাইয়া এক অসাধ্য সাধন করিলেন। ইহাকে তুলার উত্তাপে রাখিতে হইয়াছিল, বলিয়া ইহার নাম "তুলী" হইয়াছে। এই কন্যাকে শিবনাথ

কি কষ্টে মায়ের মত যত্ন করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, সে কথা আজও যাঁরা দেখিয়া-ছিলেন তারা বর্ণনা করেন। কোলে শিশুকন্যা ও হাতে বি-এ পরীক্ষার পুস্তক —এই লইয়া শিবনাথ রাত্রির পর রাত্রি কাটাইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অন্নদাযিনী মাসীমা (হরগোপাল সরকার মহাশয়ের পত্নী) বলেন যে, কোন মা যা পারে না শিবনাথ-বাবু তা পারিতেন। কোলে মেয়ে, সম্মুখে আগুনের মালসা, তাহার উপর দুধ —হাতে বই—আর মাঝে মাঝে পলিতা করিয়া শিশুর মুখে দুধ দিতেছেন—বি এ পরীক্ষার জন্য পড়িতেছেন—এমন করিয়া পড়িয়াও শিবনাথবাবু খাসা পাশ হইয়া মুঠো মুঠো বৃত্তি পাইলেন এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। যে কষ্টে লোকে পাগল হইয়া যায় সেই কষ্টে শিবনাথ সদানন্দ আহারের সংস্থান নাই—দারিদ্র্য-যাঁতায় প্রাণ পিষিয়া যাইতেছে রুগ্ন পত্নীর সেবা অপোগণ্ড শিশুদ্বয়কে প্রতিপালন করা পরীক্ষার জন্য পড়া তাহার উপর আবার ব্রাহ্মসমাজের সেবা কেশবচন্দ্রের পারিবারিক উপাসনায় পাঠ [illegible] দেওয়া ইত্যাদি সব এক সঙ্গে চলিত জানিয়া ভগবান [illegible] উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এত শ্রমের শক্তিই বা কোথা হইতে আসিত [illegible] ইহার মূলে আর কিছুই নয় তাঁর প্রাণের অগাধ প্রেম। কি ঈশ্বরের প্রতি কি মানুষের প্রতি।

এস্থানে সে সময়কার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক। মুঙ্গেরে যে সময় নবপুতাব আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল সে সময় শিবনাথ সে আন্দোলনে যোগ দেন নাই—যদিও গোস্বামী মহাশয় তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কলাইঘাটা রাণাঘাটে বিজয়কৃষ্ণের পুত্রের নামকরণোপলক্ষে যে আনন্দোৎসব হয় সেই উৎসবের দিনেই শিবনাথ প্রথম কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই সময়ে অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরাগী বন্ধু ছিলেন কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্টানদিগের অনুকরণে প্রার্থনা ও অনুতাপের আতিশয্য পছন্দ করিতেন না বলিতেন যে আনন্দময়ের ঘরে এত ক্রন্দনের রোল কেন তখনকার ব্রাহ্মগণ উপাসনার সময় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেন এবং নিজ নিজ দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট মুক্তির জন্য কাঁদিতেন। তাঁরা পরস্পরের পা ধরিয়া কাঁদিতেন কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁদের ভক্তির উচ্ছ্বাস অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার ছিল। শিশিরবাবুদের ব্রাহ্মগণ আনন্দবাদী বলিতেন। সদানন্দ শিবনাথ এই আনন্দবাদীদিগের নিকট সর্ব্বদাই যাইতেন। তাঁহারা যখন—

যার মা আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ'

বলিয়া নৃত্য করিতেন সেই নৃত্য দেখিয়া শিবনাথ বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। নবপুজাব ঢেউ যখন ব্রাহ্মসমাজে উঠিল তখন আনন্দবাদীরা সরিয়া পড়িলেন।

কেশবচন্দ্র বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নব উৎসাহে, নব উদ্যমে, ব্রাহ্ম-সমাজের নানাবিভাগের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছিলেন। শিবনাথ সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া কেশববাবুর কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুগণের চেষ্টায় Indian Reform Association স্থাপিত হইল, তার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি নানাবিভাগ যুক্ত হইল। শিবনাথ Temperance প্রচার করিবার জন্য "মদ না গরল" কাগজ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। আবার নারীদিগের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। এক পয়সার "সুলভ সমাচার" কাগজ প্রচারিত হইল—শিবনাথ তার জন্যও লিখিতেন। এই সকল কাজের সঙ্গে নিজের পাঠও চলিল, পরিবার প্রতিপালন চলিল, দারিদ্র্য-ভোগও চলিল। Indian

Reform Association-এর পক্ষ হইতেই ব্রাহ্মবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ ১৮৭২ সালে তিন আইন মতে বিবাহবিধি প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৭১ সালে ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে শিবনাথ সপরিবারে সেই আশ্রমে বাস করিতে থাকিলেন। এখানে ভারতাশ্রমের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি;—জননী প্রসন্নময়ী সর্ব্বদাই ভারতাশ্রমের গল্প বলিতেন। দেশে থাকিতে তাঁকে দুরন্ত শ্রম করিতে হইত, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা প্রভৃতি সহ্য করিতে হইত—আহারে বিহারে বিশেষ কষ্টই ছিল। হায়, আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে বধূদিগের কি দিনই গিয়াছে! এখন আর সেদিন নাই বটে, তবু কি নারীর দুঃখের অবসান হইয়াছে?

প্রসন্নময়ী যে দুঃখে শ্বশুরঘর করিয়াছিলেন তাহা আর বলিবার নহে, তবু আশ্রমে যে দারিদ্র্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, দেশেও তেমন কষ্ট পান নাই। অপোগণ্ড তিনটি শিশু লইয়া দুরন্ত শ্রম করিতে হইত, কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির, আহার্য্য কিছুই নাই—দ্বিপ্রহরে মোটা চালের ভাত ও সামান্য তরকারি, রাত্রেও তাহাই—তাহাতে ক্ষুধা নিবারণ হয় না। আশ্রমে জননী কি যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে কষ্ট হয়। আশ্রমবাসী সকলেরই কষ্ট ছিল, তবে পুরুষগণ কোন ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। উদরের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য গোলদীঘির জল ঘোলা করিয়া প্রচারকগণ কেহ কেহ পান করিয়াছেন তথাপি মুখ ম্লান করেন নাই বা কষ্টের কথা বলেন নাই; কিন্তু আশ্রমবাসী নারীগণের সে অবস্থা ছিল না। তাঁরা ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসেন নাই, পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন এই মাত্র! স্বেচ্ছায় তাঁরা দারিদ্র্য বরণ করিয়া লন নাই, সুতরাং তাঁহাদের অভাববোধ অতিশয় তীব্র ছিল। অপরের কথা জানি না—জননী প্রসন্নময়ী নিদারুণ ক্লেশ বোধ করিতেন। নিজের শারীরিক কষ্ট,—শিশুসন্তানগণকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিতেন না, দুধের অভাবে বাটী বাটী সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া চিনি মিশাইয়া সন্তানদিগকে খাওয়াইতেন। তখন শিবনাথের বৃত্তিমাত্র ভরসা! সেই বৃত্তি হইতে আবার আশ্রমবাসী অপর.পর বন্ধুদিগকে সাহায্য করিতে হইত। নিজের সন্তানেরা যখন দুধ পাইত না তখন শিবনাথ অপর এক বন্ধুর দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতাশ্রমে বাসকালে ১৮৭১ সালের জুন মাসে শিবনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ জন্মগ্রহণ করে। আশ্রমেই তাহার অন্নপ্রাশন হয়। এই বলিলেই সেই সময়কার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে যে, প্রিয়নাথের অন্নপ্রাশনে চারিটি মাত্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। প্রসন্নময়ী অন্নপ্রাশনের আয়োজন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এই আমার ছেলের ভাত! এ ত খোকার শ্রাদ্ধ!" আশ্রমে প্রতিদিন ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত পারিবারিক উপাসনা হইত। কেশবচন্দ্রের দৈনিক উপাসনায় যোগ দেওয়া ব্রাহ্মদিগের এক প্রলোভনের বিষয় ছিল; কিন্তু জননী প্রসন্নময়ী তিনটি শিশুকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া তিন ঘণ্টা উপাসনায় বসিতে অস্থির হইয়া পড়িতেন। উপাসনার পর উঠিয়া দেখিতেন কন্যা তুলী এক একদিন বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়া আছে। একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, "আর আমি উপাসনায় যাবো না, কোন্ দিন দেখব একটা মাথা ফাটাইয়া মরিয়া আছে"—কথাটা কান্তিবাবুর কানে গেল যে, হেমের মা আর উপাসনায় আসিবেন না, তিনি অমনি প্রসন্নময়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত!

"হেমের মা তুমি উপাসনায় যাও নাই কেন?"

উত্তর—"কি করে যাই বলুন, ছেলেমেয়েগুলো কি মাথা ভেঙ্গে মারা যাবে? তাদের দেখবার যে কেউ নেই!"

কান্তিবাবু—"সেকি কথা হেমের মা! অবিশ্বাসের কথা বলতে আছে কি, স্বয়ং ভগবান তোমার ছেলেমেয়েদের দেখছেন তা কি তুমি সন্দেহ কর?"

উত্তর—"কত ভগবান দেখেন? সেদিন ত তুলী পড়ে গিয়েছিল, ভগবান কি ছেলে ধরেন?"

কান্তিবাবু প্রসন্নময়ীর পায়ে পড়িলেন, "তোমার পায়ে ধরছি উপাসনায় চল।" প্রসন্নময়ী উপাসনায় গেলেন। অবশ্য তুলী পড়িয়া মরে নাই। প্রসন্নময়ী আশ্রমের ব্রাহ্মদিগকে দেবতা বলিয়া ভাবিতেন। বিশেষতঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি বার বার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, "অনেক মানুষ এ জীবনে দেখলাম, গোঁসাইজীর মত এমন নিরেট খাঁটি মানুষ আর দেখলাম না।" গোস্বামী মহাশয় অতিশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কাহারও ভয়ে করিয়া কথা বলিতেন না। প্রসন্নময়ীর উপর শিবনাথ কোন অবিচার করিলেই তিনি গোস্বামী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতেন। অন্যায় দেখিলেই বিজয়বাবু তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। শিবনাথকে একদিনও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। বাস্তবিক এমন নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ, ভক্ত সাধক এ সংসারে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে।

জননী প্রসন্নময়ী উপাসনাকালে কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব মুখশ্রীর অনেক বর্ণনা করিতেন। কি করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে উপাসনা করিতেন, আর দুই নেত্রে ধারা বহিত, উপাসনার মর্ম্ম না বুঝিলেও এই স্বর্গীয় দৃশ্যের মর্ম্ম বুঝিতেন। "তেমন উপাসনা আর কখন শুনব না" একথা বার বার বলিতেন। যেমন আশ্রমের উপাসনা তেমনি আশ্রমের দারিদ্র্য তাঁদের হৃদয়ে চিরদিন মুদ্রিত ছিল।

আশ্রমে থাকিতে থাকিতে ১৮৭২ সালে শিবনাথ সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "শাস্ত্রী" উপাধি পাইলেন।

১৮৭২ সালে শিবনাথের জীবনে আর এক ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে তাঁর পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিতে হইল। বিবাহ হওয়া অবধি বিরাজমোহিনী পিত্রালয়েই ছিলেন। শিবনাথ দুই একবার তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না। দীর্ঘ সাত বৎসর তাঁর পিত্রালয়েই কাটিয়া গেল, এই সময়ের মধ্যে তার মাতাপিতার মৃত্যু হইল—তখন তিনি কাকার গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। পিতৃব্য শিবনাথকে সংবাদ দিলেন, "তোমার পত্নীকে লইয়া যাও।" শিবনাথ মনে করিতেন যে দুই পত্নী লইয়া সংসার করা অতি অধর্ম্ম। তিনি এক অদ্ভুত কল্পনা করিলেন যে, উপযুক্ত পাত্রে বিরাজমোহিনীকে বিবাহ দিবেন। নামমাত্র তাঁর বিবাহ হইয়াছে বই ত নয়?

তাঁর এই অদ্ভুত পরামর্শ দুই চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জানাইলেন। মনের সংকল্প মনেই রহিল। বিরাজমোহিনী যথাসময়ে পিত্রালয় হইতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা দিক হইতে এ পরিবর্ত্তন তাঁর নিকট বিষম বোধ হইতে লাগিল। জল হইতে মৎস্যকে উঠাইলে তার যে দশা হয়, বিরাজমোহিনীরও তাই হইল। এই অবস্থার ভিতর এ জগতে তাঁর একমাত্র আপনার জন পতি যখন তাঁর সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে লাগিলেন তখন তিনি আপনাকে একেবারে নির্ব্বাসিত ভাবিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নয়, একদিন পতি বলিয়া বসিলেন, "দেখ, দুই পত্নী গ্রহণ বড় অসম্ভব ব্যাপার! তুমি যে আজীবন কষ্ট পাও তা আমি সহ্য করিতে পারিব না, তোমাকে যদি আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট পাত্রে বিবাহ দিই তাহা হইলে কি তোমার আপত্তি আছে? তোমার সঙ্গে ত আমার নামমাত্র বিবাহ হইয়াছে,

তুমি কেন চিরদুঃখিনী হবে?" বিরাজমোহিনী এ জন্মে এরূপ কিম্ভূত-কিমাকার অদ্ভুত কথা কখন শোনেন নাই। শ্রবণমাত্রেই তিনি আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিলেন, গম্ভীর ভাবে পতিকে বলিলেন, "আমি গলায় দড়ি দিয়া তার আগেই মরিব।" শিবনাথের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, যে পরামর্শ সাত বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, নিমেষে তাহা শূন্যে মিলাইয়া গেল! তিনি ত জানেন না যে, সাত বৎসর ধরিয়া বিরাজমোহিনী তাঁর সেই অপরিচিত স্বামীকে স্বামী বলিয়াই ধ্যান করিয়া আসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ শিবনাথ সুস্পষ্ট বুঝিলেন তাকে দুই পত্নীই গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু অন্তরাত্মা যে তা চায় না—দুই পত্নী গ্রহণের কথা মনে স্থান দিতে পারে না। প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, "আমার আত্মার এ অধোগতি সহ্য করি কি করে? তার চেয়ে দুই জনেরই সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না সেই আমার ভালো।" মনে মনে স্থির করিলেন পত্নীদ্বয় হইতে দূরেই থাকিবেন। সেইভাবে দিন চলিল। শিবনাথ গোলদীঘিতে বেঞ্চের উপর কি কলেজের টেবিলের উপর হাতে মাথা দিয়া রজনীতে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পতিপ্রাণা প্রসন্নময়ী স্বামীর ক্লেশ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বিরাজমোহিনীর ত আশ্রমে আসা পর্যন্ত চক্ষের ধারার আর বিরাম ছিল না। এখন তাঁর অবস্থা দেখিয়া সকলের মনেই ভয় হইতে লাগিল। পত্নীদ্বয়ের দুঃখে শিবনাথ কাতর হইলেন, কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

আশ্রমবাসী সকলেরই প্রাণ অশান্তিতে পূর্ণ হইল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে দুই পত্নীই গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইঁহাদের আশ্রম হইতে অন্যত্র লইয়া যাও। বিবাহ যখন করিয়াছ তখন ইঁহাদের এরূপ ক্লেশ দিবার তোমার কোন অধিকার নাই।" ঠিক সেই সময়, অর্থাৎ—১৮৭৩ সালের প্রারম্ভে শিবনাথের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁকে চাংগড়ীপোতায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি এই সময় বহুমূত্র রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। পেন্সন লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমে যাইবেন এইরূপ সংকল্প করিয়া শিবনাথকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি স্কুলের ও সোমপ্রকাশের ভার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শিবনাথ মামার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইলেন, এমন কি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মামাকে বলিলেন, কেশববাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁকে ফলাফল বলিবেন। কেশববাবুকে বলিলেন যে, আর তিনি আশ্রম-সংশ্লিষ্ট নারী-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে পারিবেন না, মামার কাজের সাহায্যের জন্য তাঁকে হরিনাভি যাইতে হইবে। সেন মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাজ ছাড়িয়া মামার সাহায্যের জন্য যাওয়া তেমন পছন্দ করিলেন না। শিবনাথ হরিনাভি স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার হইয়া সেখানে গেলেন, সঙ্গে প্রসন্নময়ী, তিনটি সন্তান লইয়া চলিলেন। বিরাজমোহিনী কলিকাতায় কোন এক ব্রাহ্ম-পরিবারে রহিলেন।

॥ নবম অধ্যায় ॥

হরিনাভি বাস

১৮৭৩ সালের প্রথমে যখন হইতে শিবনাথ হরিনাভি গিয়া সপরিবারে বাস করিতে থাকিলেন, তখন হইতে তাঁর প্রকৃতভাবে গার্হস্থ্যাশ্রম আরম্ভ হইল বলা যাইতে পারে। আশ্রমে সকলকে এক পরিবারভুক্তের মত থাকিতে হইত। এখানে শিবনাথের স্কন্ধে গুরুতর দায়িত্ব পড়িল। একটি নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সমুদয় ভার 'সোমপ্রকাশ' কাগজের সমুদয় দায়িত্ব তদুপরি নিজ পরিবারের ভার। হরিনাভিতে শিবনাথকে দুরন্ত শ্রম করিতে হইত। এই সময় আবার দক্ষিণাঞ্চলে ম্যালেরিয়া দেখা দিল শিবনাথ অবিলম্বে জ্বরে পড়িলেন। কঠিন শ্রম করিয়া তাঁহার দেহ ভগ্ন হইল। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে হরিনাভিতে শিবনাথের তৃতীয়া কন্যা সুহাসিনী জন্মগ্রহণ করেন। শিবনাথ হরিনাভিতে দেড় বৎসরমাত্র ছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে হরিনাভির স্থায়ী কল্যাণ করিয়া আসিয়াছেন।

প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করে হরিনাভিতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সূত্রপাত করেন। তৎপূর্বে হরিনাভিতে ম্যালেরিয়া পীড়িত দীন-দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসার কোন উপায় ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ শিবনাথের বিশেষ চেষ্টায় হরিনাভিতে একটি ভিন্ন মিউনিসিপালিটি হয় তৎপূর্বে এই স্থান বেহালা মিউনিসিপালিটির অধীন ছিল। হরিনাভি প্রভৃতি স্থানের লোকেরা নিয়মিত ট্যাক্স দিত বটে কিন্তু গ্রামের কোন কাজই হইত না। শিবনাথ অনেক আন্দোলন করিয়া হরিনাভিতে ভিন্ন মিউনিসিপালিটি করেন। তদবধি এই সকল গ্রামের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ তিনি হরিনাভি স্কুলের অশেষ উন্নতি সাধন করেন। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত এরূপ ছিল যে, শিক্ষকদিগের বেতন দিয়া স্কুলের অভাবমোচনের জন্য একেবারেই টাকা থাকিত না। অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ের উন্নতির কোন উপায় করা সম্ভব ছিল না। অর্থ আর কোথা হইতে আসে? শিবনাথ ভাবিলেন, শিক্ষকদিগের বেতন কমাইয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাতে স্কুলের অবশ্যপ্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য হইতে পারে। শিবনাথ ১০০ টাকা বেতনে হরিনাভি স্কুলের হেড-মাষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজে ১০০ টাকার স্থলে ৮০ টাকা করিয়া লইতে লাগিলেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদিগের বেতন কিছু কিছু কমাইয়া দিলেন। ইহাতে শিক্ষকগণ তাঁর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের অসন্তোষ কিছুতেই আর মিটে না। একদিন শিবনাথ সমুদয় শিক্ষকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ঘড়ি খুলিয়া রাখিয়া বলিলেন "এই দশ মিনিট সময় দিতেছি ইহার মধ্যে বলিতে হইবে কে কে স্কুল ছাড়িয়া যাইতে চান। যাঁরা থাকিবেন তাঁরা আর কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। বেতন কমাইবার জন্য যিনি স্কুল ছাড়িতে চান তিনি ছুটী পাইবেন।" একজনও দশ মিনিটের ভিতর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন না। ফলে দশ মিনিটের মধ্যে সমুদয় অভিযোগ অসন্তোষ স্থগিত হইয়া গেল।

চতুর্থতঃ শিবনাথের চেষ্টায় হরিনাভিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও সে সময় হরিনাভির উৎসবে গিয়াছিলেন।

শিবনাথ হরিনাভিতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন; পরে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাকে রক্ষা করেন। হরিনাভিতে বাসকালে ভক্তিভাজন প্রকাশচন্দ্র রায় দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া কিছুদিন সপরিবারে শিবনাথের সংগে ছিলেন। এমন মণিকাঞ্চন যোগ কদাচ হয়। এই সুখময়ী স্মৃতি উভয় পরিবারেই চিরদিন সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। কত ঝড় তুফান উঠিয়াছে, কত বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রকাশ-চন্দ্রের সহিত শিবনাথের সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব একদিনের জন্যও খর্ব্ব হয় নাই। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত শিবনাথ "প্রকাশ" বলিয়া ডাকিলে প্রকাশচন্দ্র "কি ভাই" বলিয়া প্রেমে গদগদ্ হইয়া যে ভাবে উত্তর দিতেন তাহা আর ভুলিবার নয়।

শিবনাথ যখন হরিনাভি স্কুলের হেডমাষ্টার তখন গ্রামের নৈতিক আবহাওয়া ভাল ছিল না। দেশে একটি সখের যাত্রার দল ছিল, তাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত সং সাজিতেন। একজন ভাগিদিদি সাজিতেন। ছেলেরা তাই লইয়া হাসা-হাসি করিত, ক্লাসের বোর্ডে লিখিয়া রাখিত, "ভগিদিদি চোটো না।" শিবনাথ দেখিলেন বড় বাড়াবাড়ি—সার্কুলার জারি করিলেন, "কোন শিক্ষক যাত্রার দলে সং সাজিতে পারিবেন না।" ও দিকে যাত্রার দলের লোকেরা শিবনাথের উপর হাড়ে চটিয়া গেল। ১৮৭৪ সালের চৈত্র মাসের গোষ্ঠযাত্রার দিন, শত্রুরা তাঁর বাড়ী আক্রমণ করিয়া একটি যুবকের মাথা ফাটাইয়া দিল। যাত্রার দিন মেলায় স্কুলের একটি ছেলের পয়সা তাসখেলার দোকানদার ফাঁকি দিয়া সব কাড়িয়া লইল, ছেলেটি কাঁদিয়া শিবনাথকে জানাইল। শিবনাথ গিয়া দোকানদারকে ধমকাইলেন। সে ব্যক্তি জমিদারবাবুদের বাড়ী গিয়া নালিশ করিল। জমিদারগণ শিবনাথকে গ্রাম হইতে তাড়াইবেন বলিয়া জানাইলেন। জমিদারদিগের প্ররোচনায় যাত্রার দলের লোকেরা শিবনাথের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। যখন তারা লাঠি চালাইয়া একজনকে জখম করিল তখন শিবনাথ মহা বিক্রমে তাদের সম্মুখে একাকী আসিয়া দাঁড়ালেন। কি আশ্চর্য্য, তাঁকে প্রহার করা দূরে থাক, তাঁকে দেখিয়াই সকলে সরিয়া পড়িল। শিবনাথ আক্রমণকারীদিগের নামে মামলা আনিলেন না, তাহাতে জমিদারবাবুরা সন্তুষ্ট হইয়া তদবধি স্কুলের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

শিবনাথ হরিনাভি স্কুলের জন্য কত যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। একবার ট্রেনে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় স্কুলের একমাসের খরচের তহবিল চুরি যায়। শিবনাথ ঋণ করিয়া সে ক্ষতিপূরণ করিলেন। নিজে ত বেতন পাইলেন না, অধিকন্তু সেই এক মাসের সমুদয় টাকার দণ্ড দিতে তাঁকে অনেক মাস সপরিবারে কষ্টে থাকিতে হইয়াছিল।

শিবনাথের হরিনাভি বাসকালে আর এক ঘটনা ঘটে। ঢাকা হইতে বৈষ্ণব-কন্যা লক্ষ্মীমণি আসিয়া শিবনাথের পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করে। লক্ষ্মীমণি ঢাকা শহরের এক পতিতা নারীর কন্যা। বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া তার সাধুতার বাসনা প্রাণে জাগ্রত হয়। মায়ের সংগে অনেক সংগ্রাম করিয়া ঢাকার ব্রাহ্ম যুবক নবকান্তবাবুর সাহায্যে কলিকাতায় পালাইয়া আসে। কোন ব্রাহ্মপরিবারে লক্ষ্মীমণির স্থান হইল না। অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া নবকান্তবাবু হরিনাভিতে শিবনাথের আলয়ে তাকে উপস্থিত করেন। শিবনাথের পরিবারে সে যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা অতি আশ্চর্য্য। শিবনাথ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী চিরদারিদ্র্যে বাস করিয়াও কোনদিনই এ কথা উচ্চারণ করেন নাই যে, "আমাদের গৃহে স্থান নাই বা আমাদের অর্থকষ্ট আছে।" লক্ষ্মীমণি চার বৎসর শিবনাথের গৃহে বাস করিয়াছিল, এবং কন্যা-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়াছিল। সেই সময়ে লক্ষ্মীমণির লিখিত একখানি পত্র নিম্নে তুলিয়া দিলাম;—

মান্যবরেষু,

নিশিকান্তবাবু বিলাত যাইবার সময় আমাকে শিবনাথবাবুর বাসায় রাখিয়া গিয়াছেন, একথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি। অল্প কয়েক দিন হইল আমি শিবনাথবাবুর পরিবারের সঙ্গে হরিনাভিতে আসিয়াছি। শিবনাথবাবু এখানকার স্কুলের মাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর আমার কোন কষ্ট নাই। ইঁহাদের ভালবাসায় আমি সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। শিবনাথবাবুর সততায় আমি অনেক সময় ভাবি তিনি মানুষ না দেবতা। রাগ নাই, সুখ দুঃখ জ্ঞান নাই, আপন পর ভেদ নাই: আমাকে ঠিক নিজের কন্যার মত ভালবাসেন। হেমের লেখাপড়ার জন্য তাঁর যেমন যত্ন, আমার জন্যও তদ্রূপ যত্ন করেন। কলিকাতায় থাকিতে একদিন কোন এক ব্রাহ্ম-বাড়ী হইতে সপরিবারে তাহার নিমন্ত্রণ হয়, কিন্তু তাঁরা আমাকে সঙ্গে নিয়া যাইতে তাঁর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া যান; এজন্য শিবনাথবাবু কাহাকেও সে বাড়ী যাইতে দেন নাই, এবং নিজেও সে কার্য্যে যোগ দেন নাই। এরূপ সাধু লোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে আমি আর কোন সুখ চাই না।

আপনার স্নেহের চিরদুঃখিনী
কুমারী লক্ষ্মীমণি

হরিনাভিতে শিবনাথ যতদিন ছিলেন, লক্ষ্মীমণিও ততদিন পরিবারে একজন হইয়া সেখানে ছিলেন। হরিনাভিতে শিবনাথের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৮৭৪ সালে স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শিবনাথকে ভবানীপুরের নব প্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবরবন স্কুলের হেড মাষ্টার করিয়া ভবানীপুরে আনিলেন। তখন উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হরিনাভি স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া হরিনাভিতে গেলেন। বিরাজমোহিনী তাঁহাদিগের সহিত হরিনাভিতে বাস করিতে লাগিলেন। শিবনাথ প্রতি শনিবার হরিনাভিতে যাইতেন এবং রবিবার সেখানে থাকিয়া সোমপ্রকাশের কাজ করিতেন, কিছুদিন পরে সোমপ্রকাশ কাগজ এবং ছাপাখানা ভবানীপুরে উঠাইয়া আনিলেন।

॥ দশম অধ্যায় ॥

ভবানীপুরে বাস

১৮৭৪ সালে শিবনাথ সাউথ সুবরবন স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শিবনাথ যেখানে যাইতেন, বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্র তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যাইত। ভবানীপুরে আসিয়াই নানাবিধ কার্য্য লইয়া মাতিলেন। স্কুলটির সমুদয় ভারবহন করা, তদুপরি প্রতি শনিবার হরিনাভি গিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদন করা ইত্যাদি কাজ ত ছিলই, তদুপরি ১৮৭৪ সালের নবেম্বর মাস হইতে "সমদর্শী" নামে এক দোভাষী সংবাদপত্র বাহির করিতে লাগিলেন। শিবনাথ ইহার সম্পাদক এবং প্রধান লেখক ছিলেন। "সমদর্শী" স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বাধীন ভাবে, নির্ভিকচিত্তে, সত্যের আলোচনার জন্য জন্মগ্রহণ করে। প্রথম হইতে ইহাতে কেশবচন্দ্র সেনের কোন কোন মতের সমালোচনা আরম্ভ হইল।

"সমদর্শী"র কথা বলিবার পূর্ব্বে কেশবচন্দ্রের সহিত যুবকদলের যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়, তার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

১৮৬৮ সালে মুঙ্গেরে নরপূজার যে আন্দোলন উত্থিত হয়, তার উল্লেখ করিয়াছি। তখন হইতে এক দল ব্রাহ্মের মন কেশবচন্দ্রের প্রতি উত্তেজিত হয়। এবং সেই সময় আনন্দবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি "আনন্দবাদী" ব্রাহ্মদল ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়েন। এই নরপূজার আন্দোলনের ভিতর শিবনাথ ছিলেন না, তখন তিনি বলিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশই করেন নাই।

১৮৭২ সালে অন্নদাচরণ খাস্তগির, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীনাথ রায়, লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় প্রভৃতি স্ত্রী-স্বাধীনতার দলের ব্রাহ্মগণ মন্দিরে পর্দার বাহিরে পরিবারস্থ মহিলাদের লইয়া বসিতে ইচ্ছুক হইলেন। এবং একদিন উপাসনার সময় সপরিবারে পর্দার বাহিরে বসিতে গেলেন। মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ নিষেধ করিলে তারা মন্দিরে আসাই পরিত্যাগ করিলেন, এবং কেবল পরিত্যাগ করা নয়, খাস্তগির মহাশয়ের বাড়ীতে এক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রায় এক বৎসর এই স্বতন্ত্র সমাজের কার্য্য চলিয়াছিল, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এই সমাজের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই স্ত্রী-স্বাধীনতার দল শিবনাথকে ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে উপাসনা করাইতেন। এই সময়ে শিবনাথের হৃদয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাব তত জাগ্রত হয় নাই। তিনি এইমাত্র বুঝিতেন যাঁরা পর্দার বাহিরে বসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের জোর করিয়া পর্দার ভিতর বসান কখনই উচিত নয়। আত্ম-চরিতে লিখিয়াছেন, "দ্বারিকবাবুর ন্যায় মনে করিতাম না যে বাহিরে বসিতে দিলেই পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।" স্ত্রী-স্বাধীনতার দলের সকলের সঙ্গেই তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। তিনি তাহাদের অনুরোধ কখনও উপেক্ষা করেন নাই। যাই হোক শিবনাথের হরিনাভি যাইবার পূর্ব্বেই এই গোলমাল মিটিয়া যায়—স্ত্রী-স্বাধীনতার দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে পর্দার বাহিরে, পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া বসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহিত অত্যগ্রসর ব্রাহ্মদলের সংঘর্ষ এত সহজে মিটিবার নয়। স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ লইয়া আবার মতভেদ উপস্থিত হয়। আশ্রমে যে মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্র তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শানুযায়ী করিতে চাহেন নাই। বালিকাদিগকে জ্যামিতি পড়ান হয় তিনি ইহা ইচ্ছা করিতেন না। কিন্তু অত্যগ্রসর দল মহিলাদিগের উচ্চতম শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ দল নারীদের উচ্চতম শিক্ষার জন্য হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। বিলাত হইতে নবাগতা কুমারী একুয়েড ইহার প্রথম তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়া বালীগঞ্জে ১৮৭৬ সালে বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় নামে আর একটি বালিকাদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, দুর্গামোহন দাস, ও আনন্দমোহন বসু মহাশয়, এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক শক্তি ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের একজন উৎসাহী শিক্ষক ছিলেন। শিবনাথ যখন সাউথ সুবরবন স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া ভবানীপুরে আসিলেন তখন এই বিদ্যালয় চলিতেছে। গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে ছয় সাত বৎসরের বালিকাকন্যা হেমলতাকে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার করিয়া দেন।

বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে ইংরাজ লেডি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ছিলেন। মেয়েরা সারাদিনে একটিও বাঙ্গলা কথা বলিতে পারিত না। যে বাঙ্গলায় কথা বলিত,

তার গলায় কৃষ্ণবর্ণ এক পদক ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। দিনান্তে যার গলায় কৃষ্ণবর্ণ পদক দুলিত সেই black mark পাইত। এই বিদ্যালয়ে ইংরেজি ধরণে শিক্ষা দেওয়া হইত। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় কিছুদিন স্বাধীনভাবে চলিয়া অবশেষে ১৮৭৭ সালে বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হয়। তখন হইতে স্ত্রীশিক্ষার জগতে এক নবযুগের অবতারণা হইয়াছে।

অনুমান ১৮৭৪ সালে, শিবনাথ যখন হরিনাভিতে বাস করিতেছিলেন, তখন আশ্রমে এক পরিতাপের কারণ উপস্থিত হয়। শিবনাথের স্বগ্রামস্থ বন্ধু হরনাথ বসু মহাশয়, আশ্রমে বাস করিতেন। হরনাথবাবু যথাসময়ে আশ্রমের খরচের টাকা দিতে পারিতেন না। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইলেন। আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় ঋণ পরিশোধের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে বসু মহাশয় একদিন স্ত্রীপুত্রকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। হরনাথের পত্নী বিনোদিনী গাড়ীতে উঠিয়াছেন এমন সময়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের আদেশে ভৃত্য আসিয়া গাড়ী ধরিয়া বলিল, "ঋণ শোধ না করিলে গাড়ী ছাড়িব না।" বিনোদিনী আপনাকে অপমানিতা মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শেষে গলার অলঙ্কার ঋণশোধের জন্য দিয়া তবে নিষ্কৃতি পাইলেন। হরনাথবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মবিদ্বেষী এক কাগজে এ সকল বিবরণ প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্রের আশ্রমের বিরুদ্ধে সেই সংবাদপত্রে অনেক কুৎসা বাহির হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্র সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া সেই সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের নামে মানহানির মকদ্দমা আনিলেন। বোধ হয় এই মকদ্দমা আদালতে উঠে নাই, আপোষে মিটিয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনা লইয়া আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই দুই দল হইল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দল আশ্রমের অধ্যক্ষের উপর চটিয়া গেলেন। এই বিষয়ের সুবিচারের জন্য কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্মদিগের এক সভা ডাকিতে অনুরোধ করিলেন। ঠিক সেই সময় ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশিত হইল, প্রচারকগণ ঈশ্বরনিযুক্ত—বিষয়ী ব্রাহ্মগণ কখন তাঁদের বিচার করিতে পারেন না। এই বিবাদ হইতে আর এক মহা বিবাদের সূত্রপাত হইল। এইবার আর ঘটনা লইয়া বিবাদ নয়, মত লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। গুরুবাদ আদেশবাদ প্রভৃতি লইয়া বহুদিন হইতে ব্রাহ্মদিগের ভিতর আলোচনা চলিতেছিল। অতঃপর বিষয়ী ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিবেন না ইহা প্রচারিত হইল। উন্নতিশীল যুবকগণ সমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন করিতে-ছিলেন, (শিবনাথ এই দলে ছিলেন) কিন্তু কিছুতেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিলেন না। ভারতবর্ষীয় মন্দিরের ট্রাষ্টী নিযুক্ত হয়, ইহাও তাঁদের আর এক অভিপ্রায় ছিল—তাহাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এইরূপ নানা বিষয় লইয়া উত্তেজনা ও অসন্তোষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছিল। ঠিক সেই সময় শিবনাথ হরিনাভি হইতে ভবানীপুর আসিয়া পড়িলেন। শিবনাথ চিরদিনই স্বাধীনতার উপাসক—নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং অচিরে উন্নতিশীল দলের সহিত তিনি মিলিত হইলেন।

ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন—

"In fact henceforth in the Brahmo Somaj there were two strong parallel parties always present, one of whom honoured Kesub almost to the point of worship, and the other consistently undervalue him, suspected his principles and denied him his true position. Of these two parties Kesub unreservedly

preferred and trusted the former. The latter he was strongly inclined to accuse of rationalism and infidelity."

ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিতেছেন, "বরাবরই ব্রাহ্মসমাজে দুটি দল ছিল—একটি কেশবচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরক্ত আর একটি মতবাদী এবং সমালোচক। শিবনাথ কেশবচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়াও ক্রমে দ্বিতীয় দলে আসিয়া পড়িলেন।"

তিনি কেশবচন্দ্রকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিলেও, নরপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। নরপূজার ব্যাপারের ভিতব তিনি ছিলেন না বটে, কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার দলের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। স্বাধীনতাপ্রিয়তা শিবনাথের প্রকৃতিগত ভাব। প্রত্যেক মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নিয়মতন্ত্রপ্রণালীমতে সম্পন্ন হয় ইহা তাঁর চিরদিনের ইচ্ছা ছিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়ও কেশবচন্দ্র তাঁর প্রতি ভগবানের আদেশের কথা বলিয়াছিলেন, তখনই শিবনাথ তাঁর সহিত এই বলিয়া অনেক সময় তর্ক করিতেন, "যাহা আপনার পক্ষে আদেশ, তাহা অপরের পক্ষে আদেশ বলিয়া বোধ না হইলে, তাকে আপনি আপনার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার জন্য জোর করিতে পারেন না। প্রত্যেকেরই চিন্তায় স্বাধীনতা আছে।" ভারতাশ্রমের সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সহিত শিবনাথের অনেক বিষয়ে মতের অনৈক্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রতি আন্তরিক টান শিথিল হয় নাই। একথার সাক্ষ্য দিবার জন্য আমি ১৮৭৫ সালের মার্চ্চ মাসের "সমদর্শী" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। যখন "সমদর্শীতে" শিবনাথ কেশবচন্দ্রের অনেক মতের প্রতিবাদ করিতেন, তখনও তাঁর সম্বন্ধে কিরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন, পাঠকগণ একবার দেখুন। "ধর্ম্মপ্রচারক" নামক প্রস্তাবের একস্থানে শিবনাথ লিখিয়াছেনঃ—

"প্রচারক-জীবনই ব্রাহ্মের শ্রেষ্ঠ জীবন, ক্রমেই এই সংস্কার ব্রাহ্মদিগের মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইতেছে। ইহাতে একমাত্র তাঁহার মতে কিরূপে সমুদায় সমাজের মত পরিবর্ত্তিত করিতেছে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একটু গভীব ভাবে আলোচনা করিলেই ব্রাহ্মসমাজের অস্থি মজ্জার মধ্যে তাঁরই জীবন ও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মদিগের মিতাচার, ব্রাহ্মদিগের উৎসাহ, ব্রাহ্মদিগের সাচ্চরিত্রতা অনুসন্ধান করিলে ইহার অধিকাংশেরই মূলে বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মসমাজের সৌভাগ্যের বিষয় যে ইহার শৈশবাবস্থায় তাঁর ন্যায় ব্যক্তির হস্তে নেতৃত্বভার পড়িয়াছে।"

এই প্রবন্ধেব ভিতর কেশবচন্দ্রের প্রতি শিবনাথের হৃদ্‌গত ভাবটি সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে।

শিবনাথ ভবানীপুরের সাউথ সুবরবন বিদ্যালয়ের কাজ লইয়া আসিয়া যখন বসিলেন তখন ব্রাহ্মগণের ভিতর স্বাধীন-চিন্তা অত্যন্ত জাগ্রত। তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রতিনিধিসভা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন; এবং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরটি ট্রাষ্টীদিগের হস্তে অর্পণ করিবার চেষ্টাও চলিতেছিল। এই উভয়বিধ চেষ্টার সহিতই শিবনাথের সহানুভূতি ছিল। ব্রাহ্মগণ সর্ব্বদাই মিলিত হইয়া এই সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। অধিকাংশ সময়ই শিবনাথের গৃহে এই সকল সভা হইত। দেখিতে দেখিতে সমদর্শীর একটি ঘনানবিষ্ট দল প্রস্তুত হইয়া উঠিল—লাহোরের পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কালীনাথ দত্ত, কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলভুক্ত ছিলেন। শিবনাথ কেবল সম্পাদক ছিলেন না, তিনি ইংরাজি বাঙ্গালায় অধিকাংশ প্রবন্ধই

লিখিতেন, শ্রদ্ধেয় অনন্দমোহন বসু "সমদর্শীর" দলে যোগ দেন নাই, একটু দূরে দূরেই ছিলেন। কিন্তু তিনিও সমাজের কার্য্যে নিয়তন্ত্রপ্রণালী স্থাপন ও ট্রাষ্টী নিয়োগসম্বন্ধে একমত ছিলেন। "সমদর্শী" যখন স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, তখন রবিবাসরীয় মিরারে তাহার প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রাচীন আর নবীন দুই দল ব্রাহ্ম, দুই কাগজে পরস্পরের মতের সমালোচনা, কটাক্ষ, বিদ্রূপ ইত্যাদি করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময় কেশবচন্দ্রের কোন কোন মতের প্রতিবাদ করিবার জন্য ট্রেনিং একাডেমী নামক স্কুলগৃহে কেশববাবুর বিরুদ্ধে দুইটি বক্তৃতা হইল। একটি শিবনাথ ও অপরটি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিলেন। শিবনাথের বক্তৃতায় কেবল মতের সমালোচনা ছিল, কেশবচন্দ রবিবাসরীয় মিরারে উদার ভাবে তাঁর প্রশংসা করিয়াছিলেন কিন্তু নগেন্দ্রনাথের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করেন। সমদর্শী কিছুদিন অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়া পরে উঠিয়া যায়। কিন্তু সমদর্শীর দলটি রহিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিযমতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভবানীপুরে বাসকালে শিবনাথ তাঁর নিজের বাড়ীতে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিলেন।

১৮৭৫ সালের নবেম্বর মাসে ভবানীপুরে শিবনাথের শেষ সন্তান সরোজিনী জন্মগ্রহণ করিল।

শিবনাথের গৃহে লক্ষ্মীমণি ছিলেন, আবার একদিন একটি বিধবা বৌচিকা বুচকীসহ হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। ইহার নাম "কুসুমকুমারী", সে নিজের যে ইতিহাস বলিল তাহা ভিন্ন তার পরিচয় দিবার আর কেহই ছিল না। এই কুসুমও শিবনাথের গৃহে রহিয়া গেল। জননী প্রসন্নময়ী নিজের পাঁচটি সন্তান ও সংসারের সমুদায় কাজকর্ম্ম লইয়া নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন, তার উপর আবার এই দুইটি বয়স্থা কন্যার ভার পড়িল। প্রসন্নময়ী ইহাদিগের কোন সেবাই লইতেন না, সহজে সংসারের কোন কার্য্য করিতে দিতেন না। ইহাদের প্রতি শিবনাথের আদর ও সদ্ব্যবহারের কথা কি বলিব? এই সুখের দিনের স্মৃতি ইহারা কখনই ভুলিতে পারে নাই।

বাহিরের ঘটনাই ত মানবের প্রকৃত জীবনের চিত্র নহে, প্রকৃত জীবন আত্মার ইতিহাস। এই ভবানীপুরে বাস কালে তাঁর হৃদয়ে একদিকে খৃষ্টীয় ভাব অপরদিকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। হাই চর্চ্চের একজন পাদ্রীর সহিত তাঁর বন্ধুত্ব জন্মে। তিনি সর্ব্বদাই শিবনাথের নিকট আসিতেন এবং জন্ হেনরি নিউম্যানের পুস্তক প্রভৃতি পড়িতে দিতেন। আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "নিউম্যান কিরূপে সত্যানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে গিয়া পড়িলেন তাহা দেখিয়া আমার মনে বিষাদ মিশ্রিত এক আশ্চর্য্যের ভাব হয।"

শিবনাথের গৃহে প্রতিষ্ঠিত ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী যাইতেন, এবং পরমহংসদেবের আশ্চর্য্য বিবরণ শিবনাথকে আসিয়া সর্ব্বদা বলিতেন। কালীমন্দিরের সামান্য একজন পূজারি হইয়া তিনি ধর্ম্মলাভের জন্য কি কঠোর সাধনা করিয়াছেন, তাহা ভক্তি গদগদ কণ্ঠে শিবনাথের নিকট বর্ণনা করিতেন। এমন আশ্চর্য্য সাধককে দেখিবার জন্য শিবনাথ সংকল্প করিলেন। কি আশ্চর্য্য, ঠিক সেই সময় কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি প্রকার প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, মিরারে তার এক বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আর বিলম্ব না করিয়া শিবনাথ সেই বন্ধুটির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতে উত্তরে উত্তরের মন কাড়িয়া

লইলেন। বাস্তবিক শিবনাথ এই আশ্চর্য্য সাধককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। রামকৃষ্ণদেব ধর্ম্মসাধনের জন্য যে প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, এ যুগে আর কেহ তেমন করিতে পারে নাই বলিয়া শিবনাথের বিশ্বাস ছিল। কঠোর সাধনার ফলে তিনি একদা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন, এবং চিরদিনের জন্য মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত হন। শিবনাথ তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই, আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিতেন, এবং কখন কখন তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শিবনাথের বুকের উপর পড়িয়া যাইতেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব শিবনাথের জীবনে সামান্য হয় নাই। রামকৃষ্ণের প্রভাবে শিবনাথের মনে উজ্জ্বল ভাবে এ সত্য মুদ্রিত হইল যে, "ধর্ম্ম এক রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র"—কারণ ধর্ম্মের উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। একদিন শিবনাথের খৃষ্টান বন্ধুও তাঁর সঙ্গে পরমহংসদেবকে দেখিতে গেলেন। তাঁকে দেখিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া পরমহংসদেব বলিলেন, "যীশুর চরণে আমার শত শত প্রণাম।" কেবল তাই নয়—রামকৃষ্ণ বলিলেন "ভগবানের অবতার অসংখ্য, তার মধ্যে যীশু প্রভৃতি মহাজনদিগের ভিতর ঐশী শক্তির প্রকাশ দেখা যায়; সুতরাং তাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলিতে দোষ নাই।" বাস্তবিক তখন রামকৃষ্ণদেবের সহিত শিবনাথের অন্তরের যে নিগূঢ় টান দেখা গিয়াছিল, তার প্রভাব শিবনাথের জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল, ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা তিনি বিশেষভাবে রামকৃষ্ণের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

ভবানীপুরে বাসকালে দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের পরিবারের সহিত, বিশেষতঃ তাঁর সাধ্বী পত্নী ব্রহ্মময়ীর সহিত শিবনাথের পরিবারের অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ব্রহ্মময়ী মাঝে মাঝে শিবনাথের বাড়ী আসিতেন। একদিন আসিয়া দেখেন প্রসন্নময়ী জলের জালায় মুখ দেখিয়া চুল বাঁধিতেছেন। ব্রহ্মময়ী বলিলেন, "এ আবার কি চুল বাঁধিবার রীতি? জলে মুখখানা খুব ভাল দেখাচ্ছে?" প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, "আয়না ভেঙ্গে গেছে, এমাসে টাকার অভাব—আসছে মাসে কেনা হবে।" ব্রহ্মময়ী একথা শুনিয়া আর বাড়ী ফিরিলেন না, তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে অতি সুন্দর একখানা আয়না কিনিয়া উপস্থিত। তখন প্রসন্নময়ী আর লজ্জা রাখিবার স্থান পান না। নারীজাতির চিরবন্ধু শিবনাথ দুর্গামোহনবাবু অপেক্ষা তাঁর পত্নী ব্রহ্মময়ীকে অধিক প্রীতি করিতেন। ব্রহ্মময়ীও তাঁর সকল শুভকার্য্যের সহায় ছিলেন। বাস্তবিক ব্রহ্মময়ীর ন্যায় এমন দয়াময়ী, পরোপকারিণী নারী সংসারে দুর্লভ। তাঁর হৃদয়ের উদারতা বিশালতার কথা আর কি বলিব? দুর্গামোহন দাস, তাঁর উদারতা ও দানশীলতার জন্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, তাঁর সাধ্বী পত্নী ব্রহ্মময়ীও নারীকুলে চিরস্মরণীয়া। তিনি যে কত অনাথা বিধবাকে কোলে স্থান দিয়াছেন, তাঁর সুখের সংসার যে কত লোকের প্রাণ জুড়াইবার স্থান ছিল, তার উল্লেখ এখানে করা সম্ভব নয়। এই সাধ্বী নারী, ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মময়ী ১৮৭৬ সালের নভেম্বর মাসে, স্বামী পুত্র কন্যা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মাসাবধি গৃহে দুইবেলা, এমনভাবে উপাসনা সঙ্গীত চলিয়াছিল, যেন মনে হইত মৃত্যুও যেন এক আত্মিক উৎসব ব্যাপার। এই সময় শিবনাথ নিত্য নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন।

তখনকার এই সঙ্গীতটি কি সুন্দর।

"রজনী প্রভাত হল, জাগিল জীব সকল,
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল।" ইত্যাদি

ব্রহ্মময়ীর শ্রাদ্ধবাসরে দুর্গামোহনবাবু বাহিরের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে লইয়া পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। কি আশ্চর্য্য কেশবচন্দ্রের উদারতা এবং ব্রহ্মময়ীর প্রতি শ্রদ্ধা! উপাসনান্তে সকলে চক্ষু খুলিয়া দেখেন যে অনিমন্ত্রিত হইয়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনায় যোগ দিতেছেন।

শিবনাথ যখন ভবানীপুরে ছিলেন, তখন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্ত্রীপুত্র লইয়া বড়ই কষ্টে পড়েন। শিবনাথ নগেন্দ্রবাবুর কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁকে সপরিবারে আসিয়া তাঁর সঙ্গে বাস করিতে অনুরোধ করেন। নগেন্দ্রবাবু অনেকদিন সপরিবারে শিবনাথের গৃহে ছিলেন। যেমন করিয়াই হোক শিবনাথ তাঁদের ভার বহন করিতে লাগিলেন। এখানে বাস কালে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভক্তিভাজন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষয় কার্য্য ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া চিরদিন দারিদ্র্য ভোগ করিয়াছেন। শিবনাথ দুই বৎসর মাল সাউথ সুবরবন স্কুলে কাজ করিয়া ১৮৭৬ সালের প্রথম হইতে হেয়ার স্কুলে গমন করেন।

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা
১৮৭৬—১৮৭৮

১৮৭৬—১৮৭৮ হেয়ার স্কুলে কাজ লইয়া শিবনাথ সপরিবারে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া উন্নতিশীল দলের সঙ্গে তাঁর যোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইল। বিশেষতঃ কেদারনাথ রায়, নগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ, উমেশচন্দ্র দত্ত ও কালীনাথ দত্ত, এই পাঁচটি উৎসাহী ব্রাহ্ম সর্ব্বদাই নির্জ্জনে সাধন, ভজন ও সদালাপ করিতেন। মাঝে মাঝে ইঁহারা ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট যাইতেন। মহর্ষি আদর করিয়া ইহাদিগকে "পঞ্চপ্রদীপ" বলিয়া ডাকিতেন।

শিবনাথ এদিকে যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ তিনজনে মধ্যবিত্ত লোক-দিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন। ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটের নীচের একটি ঘর ভাড়া করিয়া "ভারত সভা" স্থাপিত হইল। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও এই সভায় যোগ দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইহার ভিতর আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। আনন্দবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় এই সভার কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু "ভারত সভা" স্থাপিত হইবার সময়েই তাঁরা "ইণ্ডিয়ান লীগ" নামে আর একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিলেন। অ্যালবার্ট হলে যেদিন "ভারত সভা" প্রথম স্থাপিত হয় সেদিন সুরেন্দ্রবাবুর একটি পুত্রের মৃত্যু হয়! সুরেন্দ্রনাথ সেই ঘোর দুর্দিনেও ভারত সভার অধিবেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাতে সকলের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় ভারত সভার প্রথম সম্পাদক এবং সুরেন্দ্রনাথ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। শিবনাথ ভারত সভার জন্য অর্থ সংগ্রহের

ভার লইয়াছিলেন, সেজন্য তাঁকে পরিশ্রম যথেষ্ট করিতে হইয়াছিল। ভারত সভার প্রতিষ্ঠা কার্য্যে শিবনাথের হাত যে কতদূর ছিল তাহা এখন অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন।

১৮৭৫ কি ১৮৭৬ সালে শিবনাথের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক "পুষ্পমালা" প্রকাশিত হয়। ভবানীপুরে থাকিতে সমদর্শীতে ইহার অধিকাংশ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবনাথ প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক নির্জ্জন উদ্যানে গিয়া বসিতেন এবং এই সকল কবিতা লিখিতেন। অনেকদিন প্রাতে হেমলতাকে সঙ্গে করিয়া বাগানে যাইতেন, তাকে বাগানে বেড়াইতে বলিয়া নিজে একান্তে বসিয়া কবিতা লিখিতেন। সেই সময় হইতে "পুষ্পমালা"র অধিকাংশ কবিতা আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে।

১৮৭৭ সালে হরিনাভিতে উমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার নামকরণোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হরিনাভিতে সেই সময় গিয়াছিলেন। রাত্রে উপাসনা ও আহারাদির পর যখন সকলে মিলিত হইলেন তখন রাজনারায়ণবাবু ও শিবনাথের হাসির গল্পের ফোয়ারা খুলিয়া গেল। কেহ কাহাকেও হারাইতে পারেন না। লোকের হাসিতে হাসিতে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইল। রাত্রি ২টার পূর্ব্বে এই গল্পের মজলিস ভাঙ্গিল না। কিন্তু শিবনাথের পক্ষে এই ঘটনা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। কলিকাতায় আসিয়াই জ্বরে পড়িলেন এবং কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিতে আরম্ভ করিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলিলেন, ক্ষয়কাশের সূত্রপাত। শিবনাথ নিজের শরীরের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন। ভাবিলেন এ যাত্রা আর বাঁচিবেন না। দেশে মাতাপিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। শিবনাথের পিতা হরানন্দ শর্ম্মা বহু বর্ষ পুত্রের মুখ দর্শন করেন নাই; কিন্তু ছেলে জীবনসঙ্কট এ সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ছেলের চিকিৎসার জন্য গোলোকমণি নিজের গহনা বন্ধক দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলোকমণি পাগলের মত ছেলের রোগশয্যা পার্শ্বে আসিয়া ছেলের চেহারা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরানন্দ গাড়ী হইতে নামিয়াই কবিরাজ ডাকিতে গেলেন। কবিরাজ বাড়ীর ভিতর শিবনাথকে দেখিতে আসিলেন, তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন না। বাড়ীর নিকটে এক দোকানে বসিয়া রহিলেন। কবিরাজ শিবনাথকে দেখিয়া যখন বাহিরে আসিলেন তাঁর মুখে ছেলের রোগের অবস্থা শুনিলেন। কবিরাজ বলিলেন, "শিবনাথের পীড়া কঠিন. বহু চিকিৎসার আবশ্যক।" গোলোকমণি একটা ভিন্ন বাড়ী ভাড়া করিয়া পীড়িত পুত্র ও পুত্রবধূ বিরাজমোহিনীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সে যাত্রা গোলোকমণির যত্নে ও সেবায় শিবনাথ সারিয়া উঠিলেন। কবিরাজের কথা মত চলিলে শিবনাথ আর বাঁচিতেন না, কবিরাজ অতি সামান্য লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। গোলোকমণি তাহা শুনিতেন না. লুকাইয়া তার তিন চারি গুণ অধিক আহার দিতেন। প্রচুর পরিমাণে সুপথ্য পাইয়া শিবনাথ রোগমুক্ত হইলেন। দেখা গেল রোগ আর কিছুই নয়, ক্ষয়কাশও নয়, যক্ষ্মাকাশও নয়, অনাহারে, অনিদ্রায়, দুরন্ত শ্রম করিবার ফলেই শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শিবনাথ দীর্ঘাকৃতি ছিলেন বটে, কিন্তু আজন্ম রুগ্ন ছিলেন। শরীরের অবস্থা এমন ছিল যে, কোন দিন জীবনবীমা করাইতে পারেন নাই। চিকিৎসকেরা তাঁকে "দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে না" বলিয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালের শেষে রোগমুক্ত হইয়া, বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সপরিবারে মুঙ্গেরে গেলেন। যে দিন মুঙ্গেরে পেঁৗছিলেন, তারপর দিনই, শিশু-কন্যা সরোজিনী দোতলার ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া মারা গেল। সে কি হৃদয়-বিদারক ব্যাপার! জননী প্রসন্নময়ী শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তখন রাজকুমার

বিদ্যারত্ন মহাশয় মুঙ্গেরে ছিলেন, তিনি সরোজিনীর মৃতদেহ কোলে লইয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া আসিলেন। তাঁর সঙ্গে যায় এমন লোক আর কেহ ছিল না। শিবনাথও হৃদয়ে অল্প বেদনা পান নাই! সরোজিনীর মৃত্যু উপলক্ষে একটি অতি সুন্দর কবিতা রচনা করেন, তার কিয়দংশ এই ঃ—

সংসাব উদ্যানে,
ফুটিল যেকটি ফুল, পবিপূর্ণ প্রাণে
ডালা সাজাইয়া; আমি হাসিতে হাসিতে
আনন্দ তবঙ্গে যেন ভাসিতে ভাসিতে
উতবিনু তব পাশে।
* * * আশা ছিল বন্ধুগণ সনে
কবিব ব্রহ্মেব পূজা, উদ্যানে কাননে
গিবিপৃষ্ঠে নদীতটে, কিন্তু সে বাসনা,
সে বাসনা হায মোব সফল হোলো না!
আমাব ফুলেব ডালা অকালে আঁধাব
কবি' কাল তুলে নিল ফুলটি আমাব।
তখন আমি ত নিজ আাখবে বুঝাযে
বেখেছিনু, অশ্রু মোব বাখিনু লুকাযে,
কিন্তু প্রাণে বড় ব্যথা পেযেছি মুঙ্গেবে।
হায! হায! কাবে বলি? আমাব প্রাণেব
কি যে প্রিয কন্যাগুলি! বর্ণি' তা কেমনে?
সুখে ভাসি, দেখে হাসি তাদেব বদনে।
বহুপাপ, কণ্টকণ্ট আমাব সংসাবে,
বহু অনুতাপ, তাই ঈশ্বব আমাবে,
ভুলাইতে নিষ্কলঙ্ক, প্রসন্ন, সবল,
সঙ্গীগুলি চাবিদিকে দিলেন ঘেবিযা।
হাবাব সে ধনে আমি এমন কবিযা
কে জানিত? চাবি দন্তে আধ আধ হাসি,
আধ ভাষা, বর্ণে বর্ণে যেন সুধাবাশি,
কে জানিত "সবোজিনী" এমন মৃণালে
বাধা ছিল, কাল যাহা ছিঁড়িবে অকালে।

এই প্রকাবে মুঙ্গেবে পদার্পণ করিয়াই আদরেব ধন "সবোজিনীকে" হারাইলেন। কিছুদিন পরে পুত্র প্রিয়নাথও ছাদ হইতে পড়িয়া কপালের হাড় ভাঙিল। প্রিয়-নাথের প্রাণ লইয়া টানাটানি। যাই হোক ভগবানের কৃপায প্রিয়নাথ সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিল। মুঙ্গেরে শিবনাথের পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য খোদাই সঙ্গে আসিয়াছিল। শিবনাথের পীড়ার সময় সে বিনা বেতনে সেবা করিত। কেবল তাই নহে, প্রসন্নময়ীর অভাব দেখিলে কোথা হইতে অর্থ আনিয়া দিত। তখন এমনও দিন গিয়াছে যে, শিশু সন্তানদের লইয়া অনাহারে থাকিবার উপক্রম অনেকবার হইয়াছে। যিনি উপার্জক তিনি পীড়িত, অর্থের অভাবে তাঁর চিকিৎসা বন্ধ হয় নাই—কারণ মা আসিয়া বুক দিয়া পড়িয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী ভিন্ন বাড়ীতে শিশুদের লইয়া থাকি-তেন, অভাবের কথা কাহাকেও বলিতে পারেন না, চাকরকে বলিবেন কি? খোদাই মুখ দেখিত—সে যখনই দেখিত হাঁড়ি আর চড়ে না, অমনি কোথা হইতে টাকা আনিয়া

প্রসন্নময়ীর হাতে দিয়া বলিত, "মা এই টাকা নাও কি কি আনিতে হইবে বল ?" প্রসন্নময়ীর তখন কৃতজ্ঞতায় চক্ষু ফাটিয়া জল আসিত, বলিতেন, "সে কি খোদাই, তুমি টাকা আনলে কোথা হতে, এ টাকা আমি নেব না।" খোদাই হাত জোড় করিয়া বলিত, "মা, বাবু আমার বেঁচে উঠুন, আমার সব ধার শোধ হবে, মা তুমি ছেলেদের বাঁচাও।"

এই খোদাই সরোজিনীর মৃত্যুতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেল। তার বিশ্বাস হইল ভূতে সরোজিনীকে ফেলিয়া দিয়াছে। শিবনাথ মুঙ্গেরে যে বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিলেন, সেটা ভূতের বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সে বলিত ভূতে তাকে দেখা দিয়া বলিয়াছে, "আমার বাড়ীতে এসে উপদ্রপ কেন? তোমরা দূর হয়ে যাও, নয় ত আরও বিপদ হবে।" শিবনাথ সে বাড়ী হইতে উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু খোদাই-এর মাথা ঠিক হইল না। নূতন বাড়ীতে আসিয়া আবার প্রিয়নাথ যখন পড়িয়া গেল—খোদাই দিনে দুপুরে লাঠি লইয়া ছুটিয়া যাইত, "আবার এখানেও এসেছিস, দূর হ!" লোকে দেখিত শূন্যদৃষ্টিতে সে কি দেখিয়া আতঙ্কে চীৎকার করিতেছে। খোদাই সকল কার্য্যের বাহির হইয়া গেল। ক্রমে শয্যা লইল, দেশে গিয়াই সে মারা গেল। এই প্রভুভক্ত ভৃত্যকে শিবনাথ তাঁর "মেজ বৌ" পুস্তকে অমর করিয়া গিয়াছেন। সে অমর হইবার যোগ্য ভৃত্য বটে। শিবনাথের সদয় ব্যবহারে আজীবন ভৃত্যগণ তাঁর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিত। পরিবার পরিজনকে মুঙ্গেরে রাখিয়া আবার হেয়ার স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

১৮৭৭ সালে কয়েকজন ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া অতি গোপন ভাবে একটি ঘন নিবিষ্ট দল গঠন করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র, ময়মনসিংহের শরচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। ইঁহাদের অনুরোধে শিবনাথও এই দলভুক্ত হন। একদিন বরাহনগরে এক নির্জ্জন উদ্যানে বিশেষ উপাসনার পর নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে সংস্কর করিয়া ভগবানের নাম লইয়া অগ্নি জ্বালিয়া, সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে, নিজ নিজ নাম লিখিয়া নিক্ষেপ করেন। শিবনাথ আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "ইঁহারা যখন ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন আশ্চর্য্য বল ও আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল।"

প্রতিজ্ঞাপত্রটির বাক্যগুলি এইরূপ ছিলঃ—

প্রথম—তাঁরা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন।

দ্বিতীয়—গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিবেন না।

তৃতীয়—পুরুষের ২১ বৎসরের ও কন্যার ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবেন না, বা সেরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন না।

চতুর্থ—জাতিভেদ রক্ষা করিবেন না। ইত্যাদি—

এই ঘননিবিষ্ট দলটি গঠিত হইতে না হইতে প্রবল ঝড়ের ন্যায় কুচবিহার-বিবাহ আসিয়া পড়িল। ১৮৭৭ সাল হইতেই শিবনাথের গবর্ণমেণ্টের চাকুরি ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য প্রাণে প্রবল বাসনার উদয় হয়। মনের কথা বন্ধু আনন্দমোহন বসুকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "সে কি হয়, আপনার পরিবার পরিজনের উপায় কি হবে? তাদের জীবনধারণের ব্যবস্থা না করে আপনি চাকরি ছাড়তে পারেন না।" শিবনাথের বয়স তখন ঠিক ত্রিশ বৎসর। কেবল পাঁচ বৎসর মাত্র শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। শিবনাথ অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন—যে তাঁর কাছে পড়িয়াছে সে কখন তাঁর অধ্যাপনা ভুলিতে পারে নাই। তাঁর অধ্যাপনার রীতি অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু পাঁচ বৎসরের

মধ্যেই তাঁর সংসার ধর্ম্ম যেন ফুরাইল। কাজ কাজ ছাড়ি ছাড়ি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় কোথা হইতে কুচবিহার-বিবাহ আসিয়া তাঁকে কোন্ পথে উড়াইয়া লইয়া গেল। এমন এক আবর্ত্তে পড়িলেন যে পরিবারের ভাবনা, অর্থচিন্তা কোথায় ভাসিয়া গেল!

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

কুচবিহার-বিবাহ

১৮৭৮ সালটি শিবনাথের জীবনে চিরস্মরণীয়। এই একটি বৎসরের মধ্যে যে ঘোর পরিবর্ত্তন তাঁর জীবনে আসিয়া পড়িল, এমন আর কখন হয় নাই। কি আশ্চর্য্য, কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্বে হইতেই তিনি ডায়েরি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ডায়েরিতে দিনের পর দিন কুচবিহার-বিবাহের আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁর ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত করিয়া তখনকার ঘটনা বলিব।

৩০এ জানুয়ারি। ১৮৭৮ ১৮ই মাঘ ১২৮৪ বুধবার ডায়েরিতে লিখিতেছেন।—

"ইতিমধ্যে বাবু লোকনাথ মৈত্র এক নূতন সংবাদ লইয়া আসিলেন। কুচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার শীঘ্র বিবাহ হইতেছে। কমিশনার সাহেব নাকি আগামী ৬ই মার্চ্চ বিবাহ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কেশববাবু এখনও শেষ উত্তর দেন নাই। আগামী মার্চ্চে বিবাহ হইলে বড় পুটীর বয়স চৌদ্দও সম্পূর্ণ হইবে না। বিশেষ এ স্থলে বোধ হয় ১৮৭২ সালের তিন আইন খাটিবে না। এই আইন মতে বিবাহ করাইবার জন্য প্রচারকগণ লোকের উপর যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই আইন পরিত্যাগ করা হইবে।"

এই প্রকারে ১৮৭৮ সালের ৩০এ জানুয়ারিতে কুচবিহার-বিবাহের গুজব রাষ্ট্র হইতেছিল। তখন শিবনাথ হেয়ার স্কুলে কাজ করেন, এবং প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের চেষ্টায় রত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ এই বিবাহের সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পরদিনই আবার ডায়েরিতে লিখিতেছেন ঃ-

৩১ জানুয়ারি, ১৮৭৮; ১৯এ মাঘ, ১২৮৪—বৃহস্পতিবার।

"ক্রমেই শুনিতেছি কেশববাবু নাকি সত্যই রাজার সহিত তাঁর কন্যার বিবাহ শীঘ্র দিতেছেন। তাঁহার কন্যার বয়ঃক্রম আজিও চতুর্দ্দশ পূর্ণ হয় নাই, রাজারও বয়ঃক্রম সপ্তদশের অধিক হয় নাই। এরূপ স্থলে বিবাহ হওয়া আমার মতে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ আইনটি পরিত্যাগ করা কেশববাবুর পক্ষে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য বোধ হয় না। তাহলে আর কাহাকেও সে পথে প্রেরণ করা দুষ্কর হইবে। কেশববাবু যে কেন এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। তাঁহাকে Principled man বলিয়া বড় শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধাও আর থাকে না। তাঁহার এরূপ কার্য্যে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। অতএব ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করা আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে সমাজের মুখ রক্ষা হইবে। কিন্তু প্রতিবাদপত্রটি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে একবার বন্ধু ভাবে তাঁহার নিকট

গিয়া সবিশেষ সংবাদ লওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে যদি কেহ সাহায্য না করেন, তথাপি এ আন্দোলন করিতে হইবে। অভাব পক্ষে আমার একাকী যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিব।"

২রা ফেব্রুয়ারি। ২১ মাঘ শনিবার।

"পরে লোকনাথবাবু আসিলেন, শুনিলাম কেশববাবু আগামী মার্চ্চ মাসে কন্যার বিবাহ দিতে রাজি আছেন, তবে কতকগুলি condition দিয়াছেন। এ condition গুলি জানিবার উপায় নাই। সন্ধ্যার সময় বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, বাবু কালীনাথ দত্ত, এবং আমি কেশববাবুর নিকট গেলাম। তাঁহার বাহিরে আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। তিনি প্রায় ৯টার পর বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন এখন condition লইয়া কথাবার্তা চলিতেছে, কিছু স্থির হয় নাই। আমি কেশববাবুকে সকল সমাজ হইতে যেরূপ প্রার্থনা জানাইবার কথা মনে করিয়াছি, দুর্গামোহনবাবু তাহাতে সম্মত নন। তিনি বলেন বিবাহ হইয়া গেলে কেশববাবুকে অধিনায়কের পদ হইতে চ্যুত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার বোধহয় তৎপূর্ব্বে আমাদের অভিপ্রায় বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে একবার জানান কর্ত্তব্য। দ্বারিবাবুর এই মত। আনন্দমোহনবাবুর সহিত পরামর্শ আবশ্যক।"

কি আশ্চর্য্য কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবার জন্য শিবনাথের হৃদয়ে ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল! কি কি কার্য্য করিবেন তাহার আভাষ হৃদয়ে লাভ করিতেছিলেন।

৪টা ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ লিখিতেছেন—

"নিদ্রাভঙ্গে প্রার্থনান্তে ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও সে সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য কি, এই চিন্তা গুরুতর রূপে হৃদয়কে আক্রমণ করিল। Students fortnightly meeting, বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের বালিকাদের ধর্ম্মশিক্ষা এবং প্রতিনিধি সভা—এই তিন কার্য্যের ভার বিধিপূর্ব্বক আরম্ভ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ হইতে লাগিল।"

৫ই ফেব্রুয়ারি ২৩এ মাঘ মঙ্গলবার—

"অদ্য প্রত্যূষে উঠিয়া আনন্দমোহনবাবুর নিকট গমন করিলাম, তাঁহার সঙ্গে তিন বিষয়ের কথা হইল, প্রথম Students fortnightly sercice, দ্বিতীয় বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ভার, তৃতীয় প্রতিনিধি সভা। তিনি Students service-এর সঙ্গে অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে স্থির হইল যে আগামী এপ্রেলের প্রথমাবধি আমার কর্ম্ম পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ। কারণ এ সকল কর্ম্ম অনন্যকর্ম্মা হইয়া না লাগিলে চালান দুষ্কর হইবে।

* * *

স্কুলের পর বাসায় গিয়া জমা গেল। ক্রমে মহলানবিশ, রাধাকান্তবাবু, যদুবাবু, দ্বারিকাবাবু, দুর্গামোহনবাবু, আনন্দমোহনবাবু জমিলেন। এখান হইতেই কেশববাবুর আচরণের প্রতিবাদ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বোধ হইল। পরদিন সন্ধ্যার সময় আবার meeting করা স্থির করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। আমার উপর চিঠিগুলি ছাপিতে দিবার ভার রহিল।"

৬ই ফেব্রুয়ারি। বুধবার ২৪এ মাঘ—

"পরে কেশববাবুর নিকট যে protest পাঠাইতে হইবে তাহা লিখিতে বসিলাম। সেটি লিখা হইলে নগেন্দ্রবাবুকে দেখাইবার জন্য তাঁর বাসাতে গেলাম। * * *

"অদ্য আমার জীবনের এক বিশেষ দিন। ভাবিয়া দেখিলাম যে, যেরূপ

কার্য্যের ভিড় উপস্থিত হইতেছে, সম্পূর্ণরূপে অনন্যকর্ম্মা হইয়া না লাগিলে, কার্য্যও হইবেনা, অথচ স্কুলের কার্য্যের পর তাহা করিতে গেলে শরীরে সহিবে না। অনেক চিন্তার পর আর এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। অদ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। * * * স্কুলের পর ঘরে আসিয়া বিশ্রামান্তে একে একে সকলে জুটিতে লাগিলেন,—শিবচন্দ্র দেব, আনন্দ-মোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কালীনাথ দত্ত, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুচরণ মহলানবিশ, হরকুমার চৌধুরী, কামাক্ষ্যাচরণ ঘোষ এবং আমি এই কয়জনে উপস্থিত ছিলাম। প্রথমে protest এবং মফস্বলের পত্রখানি সংশোধিত হইল। তৎপরে পরে কি কর্ত্তব্য তাহা লইয়া বাগ-বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। দুর্গামোহনবাবু ও দ্বারিবাবু বলেন, অবশেষে কেশববাবুকে বেদী হইতে তাড়াইতে না হয় মন্দির পরিত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নন, তাহাদিগের সহিত স্বাক্ষর করিব না। এমতে আমরা রাজি হইলাম না। পরে স্থির হইল তাঁহাদিগের দুইজনকে বাদ দিয়া স্বাক্ষর করান হইবে। পরে এই সকল মীমাংসা হইতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল।"

ইহার তিনদিন পরে ৯ই ফেব্রুয়ারি Indian Mirror-এ কুচবিহার বিবাহ স্থির এ সংবাদ প্রকাশিত হইল। সেইদিনই গুরুচরণ মহলানবিশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং কালীনাথ দত্ত, তিনজনে গিয়া প্রতিবাদপত্রখানি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তে দিয়া আসিলেন। পরিশিষ্টে এই পত্রখানি সন্নিবিষ্ট হইল। যে তেইশজন ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শিবনাথও একজন। কিন্তু এই protestখানি শিবনাথই যে লিখিয়াছিলেন তার প্রমাণ ডায়েরিতেই দেখিতেছি। পরে সকলে মিলিয়া কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই প্রতিবাদ-পত্রখানির কোন উত্তর প্রদত্ত হয় নাই।

এক সপ্তাহের মধ্যে চারিদিক হইতে প্রতিবাদপত্র আসিতে লাগিল। কুমারী কলেটের দ্বারা প্রকাশিত ১৮৭৮ সালের Brahmo Year Book-এ দেখিতেছি যে, শিবচন্দ্র দেব-প্রমুখ সাতাইশ জন ব্রাহ্মের সাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র ব্যতীত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সীতানাথ দত্ত, দয়ালচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দের সাক্ষরিত প্রতিবাদ-পত্র, কুড়িজন ব্রাহ্মিকার প্রতিবাদপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার রায়, কালী-নারায়ণ গুপ্ত, রামপ্রসাদ সেন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঢাকা হইতে প্রতিবাদ করেন, এবং বিক্রমপুরের ব্রাহ্মিকাগণও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আনন্দমোহন বসু ও হরগোপাল সরকার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে চারিদিক হইতে প্রতিবাদপত্র আসিতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। এদিকে শিবনাথ হেয়ার স্কুলের কর্ম্ম ছাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে বোনাস (Bonus) রূপে স্কুল-ফাণ্ড হইতে অনেকগুলি টাকা পাইতেন, এবং বলিতে গেলে সে সময় তাঁরও অর্থের বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু তিনি আর দুইটা মাসও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। দুইমাস অপেক্ষা করা তাঁর নিকট এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এমনি তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা! ১৮৭৮ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাকর্ম্মের আবর্ত্তে পড়িলেন। তদবধি কি করিয়া নিজের পরিবার পালন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া আসিয়াছেন সে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

এই সময় সমদর্শী কাগজ ছিল না। ১৮৭৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে কুচবিহার-বিবাহের সমালোচনার জন্য মুখ্যভাবে "সমালোচক" বলিয়া এক সংবাদ-

পত্র প্রকাশিত হয়। শিবনাথ ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন, পরে দ্বারকানাথ গাংগুলী ইহার সম্পাদক হন। মার্চ্চ মাস হইতে Brahmo Public Opinion প্রচারিত হয়, দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের ভ্রাতা ভুবনমোহন দাস মহাশয় তার সম্পাদক ছিলেন। কুচবিহার বিবাহের কথা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে তুমুল ঝড় আরম্ভ হইল। সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ তোলপাড় হইয়া দুই ভাগ হইয়া গেল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কথা বলিবার পূর্ব্বে, তার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে বিষয় কিছু কিছু বলিতেছি। যখন চারিদিকেই কলরব, প্রতিবাদ, উত্তেজনা, সমালোচনা চলিতেছে: কে কি করে, কে কি বলে কিছুই ঠিক নাই, তখন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ধীর স্থির ভাবে কার্য্য করিবার জন্য ভার দেওয়া স্থির হইল। সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটি নামে এক সভা হইল। এই সভা করিবার জন্য প্রতিবাদকারীগণ কেশববাবুর নিকট হইতে আলবার্ট হল চাহিয়া লইলেন। কেশববাবু তার সম্পাদক ছিলেন, এই সম্বন্ধে শিবনাথের ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত করি:—

২৩শে ফেব্রুয়ারি। শনিবার—

"অদ্য প্রাতে উঠিয়া অপরাপর কার্য্যের পর আলবার্ট হলে গেলাম। সেখানে বাবু রামচন্দ্র সিংহকে কেশববাবুর অনুমতি পত্র দেখাইলাম। কেশববাবু ১৫ই তারিখে উক্ত পত্রে আমাদিগকে সভা করিবার জন্য অনুমতি দেন। * * * পরে বাসায় আসিয়া আহারাদির পর আলবার্ট হলে চেয়ার ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য গেলাম। সেখানে চেয়ার ইত্যাদি সাজাইতে ক্রমে লোক আসিতে আরম্ভ করিল। দুর্গামোহনবাবু ও আমি সমুদয় লোকদিগের নাম লিখাইয়া ছাড়িতে লাগিলাম। বেলা অনুমান ৪॥টার সময় বাবু রামচন্দ্র সিংহ গ্যাস জ্বালাইবার আয়োজন করিয়া রাখিবার জন্য আমারই সমক্ষে হলের চাকরকে আদেশ করিলেন এবং আমার নিকট হইতে দুইটি পয়সা চাহিয়া তাহাকে দিলেন। ক্রমে বেলা প্রায় ৫॥টা বাজিয়া গেল—তখন শুনিলাম যে কেশববাবু গ্যাস জ্বালাইতে বারণ করিয়াছেন। সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি কিছু বাতি আনা হইল, কিন্তু বাতি দিবার স্থান ছিল না। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু কালীনাথ দত্ত তাড়াতাড়ি কেশববাবুর বাড়ী গেলেন। এদিকে রাত্রি উপস্থিত। সময় অতীত হইল, লোকগুলি অন্ধকারে বসিয়া রহিল, অবশেষে সেদিন সভা বন্ধ করাই স্থির হইল। আনন্দমোহনবাবু সভা বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিতে উঠিবার সময় দেখা গেল যে কেশববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি কতকগুলো ছেলে গোল করিবার জন্য আসিয়াছে। তারা অত্যন্ত কোলাহল আরম্ভ করিল। চেয়ার ভাঙ্গিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল। রাত্রে বাসাতে আসিয়া ছাত্রেরা অনেকে জুটিল, সকলকে লইয়া উপাসনা করা গেল। রাত্রে কালীনাথবাবু আসিলেন, তাঁর কাছে শুনিলাম যে তিনি যখন কেশববাবুর নিকট আলোর অনুমতি আনিতে গিয়াছিলেন তখন কান্তিবাবু তাকে "তোর বাবার মিটিং, যাও চ'লা যাও" বলিয়া তাড়াইয়া দেন।

"কেশববাবুও অনেক বিলম্ব করিয়া অবশেষে অনুমতি প্রদান করেন। যাহোক সেদিন (২৩এ ফেব্রুয়ারি) মিটিং হইল না, পরে ২৮এ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে সভা করিয়া "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি" প্রতিষ্ঠিত হইল। ১লা মার্চ্চ সেই কমিটির প্রথম মিটিং হয়।"

এই সময় শিবনাথের পরিবার পরিজন সকলে মুঙ্গেরে, তিনি ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটের বাসায় থাকিতেন। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি তখন এই বাসায় থাকিতেন।

২৩ তারিখে আলবার্ট হলে প্রতিবাদকারীদিগের সভা হইতে পারিল না কিন্তু

২৪এ তারিখে বিবাহের সমর্থনকারীগণ আলবার্ট হলে এক সভা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা এই সভার সভাপতির কার্য্য করেন। সমর্থনকারীদিগের ভিতর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা	রাজকৃষ্ণ মিত্র
নবগোপাল মিত্র	রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	কানাইলাল পাইন প্রভৃতি

২৮এ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে ব্রাহ্মসমাজ কমিটির যে বিরাট অধিবেশন হয় তার বিবরণ কুমারী কলেটের Brahmo Year Book হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি ২রা মার্চ্চের Indian Mirror ও ১লা মার্চ্চের Indian Daily News হইতে এই বিবরণটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যথা—

হলটি ৩০০০ দর্শকে পূর্ণ হইল। একটি সংগীত হইয়া সভার কাজ আরম্ভ হয়। পরে শিবচন্দ্র দেব মহাশয় কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি অতি সুললিত ভাষায় একটি বক্তৃতা করিলেন, তৎপরে দুইটি resolution হয়—প্রথমটি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্থাপন করেন এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ তাহা সমর্থন করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি শিবনাথ উত্থাপন করেন এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ কমিটি গঠিত হয়।

রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	দুর্গামোহন দাস
শশিপদ "	সর্ব্বানন্দ "
রামকুমার ভট্টাচার্য্য	কালীনাথ দত্ত
শিবনাথ "	উমেশচন্দ্র "
আনন্দমোহন বসু	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী
ভগবানচন্দ্র	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	গুরুচরণ মহলানবিশ
হরকুমার রায়চৌধুরী	জগনাথ রায়
যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	নবীনচন্দ্র
প্রসন্নকুমার রায়	

এই ঘটনার ৬ দিন পরে ৬ই মার্চ্চ কুচবিহারের তরুণ মহারাজের সহিত কেশব চন্দ্রের কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ এই স্থানে দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাহা সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা। এই বিবাহের ফলস্বরূপ যে বিরাট ব্যাপারের সূত্রপাত হইল এবং যার সহিত শিবনাথের জীবন গ্রথিত এবং যাহা শিবনাথকে পাইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং যে কার্য্যের ভিতর দিয়া শিবনাথের অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি সার্থকতা লাভ করিল তারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

কুচবিহার-বিবাহের পরেই শিবনাথের জীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। এই প্রবল কর্ম্মময় যুগের ইতিহাস দিবার পূর্ব্বে একবার শিবনাথের ধর্ম্ম-জীবনের বিষয় ভাবিয়া দেখি। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহের পরেই তাঁর

আত্মা ধর্ম্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, এই উদ্বোধনের ভিতর কেশবচন্দ্রের কোনো হাত ছিল না। প্রাণের ব্যাকুলতায় তিনি কেশবচন্দ্রের উপাসনা ও বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন,—ক্রমে কেশবচন্দ্রের প্রভাব তাঁর হৃদয়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৮৬৯ সালে আরও বিশ জন যুবাপুরুষের সহিত তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হন—তখন হইতে প্রকৃত পক্ষে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তার পর ১৮৭১ সালে যখন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলন্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে বিবিধ সাধুকার্য্যের সূচনা করিলেন তখন শিবনাথ সমগ্র মন প্রাণ দিয়া কেশবচন্দ্রের সকল অনুষ্ঠানে হৃদয় ঢালিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্রের সকল প্রকার সাধু অনুষ্ঠানের সহিত শিবনাথের প্রাণের যোগ থাকিলেও তিনি সেই ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের সহিত সকল বিষয় একমত হইতে পারিতেন না,—দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যখন কেশবচন্দ্র বলিলেন, 'আশ্রম স্থাপন করা ভগবানের আদেশ বলিয়া মনে করি"—তখন শিবনাথ বলিলেন, 'আপনার পক্ষে আদেশ হইতে পারে, কিন্তু অপরে যদি আদেশ মনে না করে, আপনি জোর করিতে পারেন না।' ক্রমে নানা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সহিত মতের অমিল হইতে লাগিল। কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্বে হইতেই ব্রাহ্মসমাজে নানাবিধ ভাব ও মতামতের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছিল; এবং কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যথা—স্ত্রী-স্বাধীনতার দল, সমদর্শীর দল, নিয়মতন্ত্রের দল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং দুর্গামোহন দাস স্ত্রী-স্বাধীনতার দলের অগ্রণী হইলেন। শিবনাথের এ দলের সহিত কোন বিরোধ ছিল না, বরং ইঁহাদের মতের সমর্থন করিতেন, তবে নিজে তখন স্ত্রীস্বাধীনতার পাণ্ডা ছিলেন না। পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মগণ অধিকাংশই এই স্ত্রীস্বাধীনতার দলে ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—"সমদর্শী"র দল—শিবনাথ এই দলের পাণ্ডা ছিলেন। তিনি "সমদর্শী"র সম্পাদকতা করিতেন। এতদিন পরেও "সমদর্শী" পড়িতে আমাদের কি কৌতূহল বোধ হয়, দেখিতে পাই শিবনাথ ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধ নিজেই লিখিতেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি কি সুলিখিত! যেমন চিন্তা! তেমনি ভাষা! যথার্থই "সমদর্শী" অতি উৎকৃষ্ট কাগজ ছিল। "সমদর্শী" কয়েক বৎসর চলিয়া কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্বেই উঠিয়া যায়। তৃতীয়তঃ—নিয়মতন্ত্রের দল—এই দলটিতে পূর্ব্ব পশ্চিম বঙ্গ একত্র মিলিত হয়। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ই এই নিয়মতন্ত্রের কথা তুলিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এই পুরাতন কথা লইয়া কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আন্দোলন উঠে এবং নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগ চলিতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। কেশবচন্দ্রের নিকট এ চেষ্টা একেবারেই আদৃত হয় নাই। অনেক চেষ্টার পর ১৮৭৭ সালের বার্ষিক সভায় প্রতিনিধি সভা স্থাপনের চেষ্টা আংশিকভাবে সফল হইল। কেশবচন্দ্র সভাপতি মনোনীত হইলেন—আনন্দমোহন বসু সম্পাদক এবং শিবনাথ সহকারী সম্পাদক হইলেন। কিন্তু কার্য্যে কিছুই পরিণত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে চারিদিকেই অসন্তোষের অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, সহসা কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনে তাহা প্রবল দাবানলের আকার ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে কুচবিহার-বিবাহের গুজব শহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদীগণ আলবার্ট হলে সভা করিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে বিরাট সভা হইয়া "ব্রাহ্মসমাজ কমিটি" স্থাপিত হয়, ৬ই মার্চ্চ কুচবিহার-বিবাহ হইয়া যায়।

এই বিবাহের পরে বিরোধীগণ ভারতবর্ষীয ব্রাহ্মসমাজের কার্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁরা ক্রমাগত উপাসক সভার সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদককে একটি সভা ডাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। তার ফলে ২১-এ মার্চ একটি সভা আহূত হইল বটে, কিন্তু তার কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারিল না। প্রথমেই কে কে ভারতবর্ষীয ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সেই কথা লইয়াই মহা বাগবিতণ্ডা আরম্ভ হয়, তার পর কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আচার্য্যের কার্য্য হইতে অপসৃত করিবার প্রস্তাব লইয়া মহা তর্ক উপস্থিত হয়। তার পর কে সভাপতি হইবেন সেই প্রশ্ন লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিবাদ হয। প্রতিবাদীগণ দুর্গামোহন দাস মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয তাতেও সম্মত হইলেন। দুর্গামোহনবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রতিবাদী দলের মুখপাত্র হইযা শিবনাথ যেই প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন, অমনি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয সদলে মন্দির পরিত্যাগ করিযা চলিযা গেলেন। তৎপরে প্রতিবাদীগণ রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতিকে আচার্য্য মনোনীত ইত্যাদি কার্য্য করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। ইহার পরের রবিবার ভারতবর্ষীয ব্রহ্মমন্দির লইয়া তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। ব্রহ্মমন্দির লইয়া ব্রাহ্মদিগের এই তুমুল সংগ্রাম দেখিবার জন্য শহরের লোক ভাঙিয়া পড়ে। প্রতিবাদীগণ বেদী অধিকার করিতে পারিলেন না। মন্দির হইতে পুলিশের দ্বারা তাড়িত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁরা ভারতবর্ষীয ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হইযা অন্যত্র উপাসনার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজ পূর্বেই দ্বিধা হইয়াছিল আবার ত্রিধা হইয়া গেল। এখানে একটি কথা বলিযা রাখি, শিবনাথ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অধিকার স্থাপন করিতে যান নাই। সেই দিনকার মারামারি সংগ্রামের ভিতর তিনি ছিলেন না, মন্দিরের পার্শ্বে উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশযের বাড়ীতে বসিযা ছিলেন। মন্দির হইতে তাড়িত হইয়া সকলে যখন উপস্থিত হইলেন তখন সকলকে লইযা তিনি উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা করিলেন। তারপর প্রতি রবিবার সেই গৃহেই তাঁরা উপাসনার জন্য সমবেত হইতেন। প্রতিবাদীগণ মফঃস্বলের ব্রাহ্মসমাজসমূহে পত্র লিখিযা তাদের মতামত সংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবনাথ এই সকল পত্র লিখিতেন—এই সময় তাঁকে দুরন্ত শ্রম করিতে হইত। ১৮৭৮ সালের Brahmo Year Book-এ কুমারী কলেট মফঃস্বলের সমাজসমূহের মতামত নিবন্ধ করিযাছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, আশিটি মফঃস্বলের সমাজে পত্র লেখা হইয়াছিল। সাতান্নটি সমাজ হইতে উত্তর পাওযা যায়, তন্মধ্যে তিনটি সমাজ (বাঁচি, গযা, চুঁচুড়া) কুচবিহার-বিবাহে আপত্তি নাই বরং সহানুভূতি আছে বলিয়াছিলেন।

পরে ১৫ই মে টাউন হলে বিরাট সভা আহূত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। এইস্থানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের দৃশ্যটা বর্ণনা করি ঃ—

বুধবারে ১৫ই মে ৫॥টার সময় প্রকাশ্য সভা আহূত হইয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" প্রতিষ্ঠা হইল। সভায় চারি শতের অধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে রাজনারায়ণ বসু, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায উপস্থিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন Mr. Macdonald, Rev. Mr. Hectar সাহেব ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে নূতন রচিত একটি সংগীত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ভগবানের

বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া সভার সূচনা করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় বলিলেন "অদ্য যে প্রকাশ্য সভা আহবান করিয়া আমাদিগকে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইল—তাহা বাধ্য হইয়াই করিতে হইতেছে। যাতে এরূপ বিচ্ছেদ না হয় তার জন্য বিধিমতে চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। মফঃস্বল হইতেও ছাব্বিশটি সমাজের পত্র পাওয়া গিয়াছে—তন্মধ্যে তেইশটি সমাজই নূতন সমাজ স্থাপনের পক্ষে, কেবল, মুঙ্গের, ভাগলপুর আর গয়া সমাজের ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ৪২৫ জন ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা নিয়মতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য নূতন সমাজস্থাপনের পক্ষপাতী। ব্রাহ্মসমাজে প্রায় ২৫০টি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবার আছেন; তন্মধ্যে ১৭০টি পরিবার নূতন সমাজপ্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মসাধারণের সম্মতিক্রমে আমরা নূতন সমাজপ্রতিষ্ঠা করিতেছি।" তৎপরে সভাপতি মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হৃদয়ের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলেন। সেই প্রাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাবও উল্লেখ করিলেন। তাতে প্রতাপবাবু বলিয়াছিলেন যে, ভিন্ন সমাজ স্থাপনের কোন আবশ্যকতা নাই।

প্রথমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না, সেখানে একনায়কত্বের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্মসাধারণের জন্য এই "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপিত হইল। এখানে প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য এ সমাজের প্রত্যেক সভ্য দায়ী থাকিবেন।" নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শিবনাথ দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহা এই—"ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস আছে—এমন কোন ব্যক্তি আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে, ন্যূন কল্পে বৎসরে আট আনা চাঁদা দিলে এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। মফঃস্বলের সমাজসকল নির্দ্দিষ্ট চাঁদা দিলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।"

ঢাকার রজনীকান্ত ঘোষ বি-এ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৃতীয় প্রস্তাব আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উত্থাপন করেন। যথাঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব—এই সমাজের সম্পাদক এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ইহার সহঃ-সম্পাদক নিযুক্ত হউন। এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হউন। তাঁরা ইচ্ছা করিলে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

সভ্যগণের নামঃ—

রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবচন্দ্র দেব
শশীপদ "	কালীনাথ দত্ত
রামকুমার ভট্টাচার্য্য	উমেশচন্দ্র "
শিবনাথ " (শাস্ত্রী)	দুকড়ি ঘোষ
আনন্দমোহন বসু	গণেশচন্দ্র "
ভগবানচন্দ্র বসু	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
শ্রীনাথ চন্দ	পদ্মহাস গোস্বামী (গৌহাটী)
আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	বরদাকান্ত হালদার

নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	গুরুচরণ মহলানবিশ
হরকুমার রায়চৌধুরী	আনন্দচন্দ্র মিত্র
যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	রামদুর্লভ মজুমদার
নবকুমার "	রজনীকান্ত নিয়োগী
ভুবনমোহন দাস	মধুসূদন রাও (কটক)
দুর্গামোহন "	শালীনারায়ণ রায়
পার্ব্বতীচরণ " (পূর্ণিয়া)	ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়
সর্ব্বানন্দ " (বরিশাল)	রজনীনাথ "
ভুবনমোহন সেন	চণ্ডীচরণ সেন
কালীশংকর সুকুল	

রজনীকান্ত নিয়োগী এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

চতুর্থ প্রস্তাবটি দুর্গামোহনবাবু উত্থাপন করেন এবং লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় সমর্থন করেন। তাহা এই—

"দুই মাসের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনের জন্য নূতন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়া সভ্যসাধারণের বিচারের জন্য উপস্থিত করা চাই।'

এই সমুদায় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে রাত্রি ৮৷৷টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

আজ দেখিতেছি যাঁরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবল ভক্তিভাজন শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ চন্দ, ভুবনমোহন সেন, রজনীকান্ত নিয়োগী ও ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় জীবিত আছেন।

যাঁরা এ পৃথিবীতে ধর্ম্মের জন্য এত সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁরা আজ সকলে পরপারে মহামিলনের রাজ্যে গিয়াছেন। আজ সেখানে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার, প্রভৃতি এবং আজ সেখানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণও। আজও কি সে রাজ্যে কোন বিরোধ আছে? হায! তাঁদের এই মহামিলন দেখে সাধ্য কার! আজ এই মহাবিরোধের কথা লিপিবদ্ধ করিতে করিতে স্মরণ হইল, যাঁদের বিরোধ বর্ণনা করিতেছি—তাঁদের মহামিলনের কথা প্রাণে জাগিতেছে কেন? সে রাজ্যেও কি এ সকল বিরোধ মানুষ বহন করিয়া লইয়া যায়? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। ভালই হইল। প্রতিবাদ কি মৃত্যুর চিহ্ন? কখনই নয়! ব্রাহ্মসমাজের প্রাণশক্তি ছিল তাই এই প্রকাশ! নদী স্রোতমুখে যেমন সব ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি এই উন্নতির স্রোতমুখে কোন বাধা স্থান পাইল না। আর যাহা হউক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে প্রাণের পরিচয় জীবন্তভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ইহা একটি সজীব সমাজ। ইহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামকরণ সার্থক হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মসাধারণের! ইহা সকলের! সকলের আপনার! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ, বিস্তর ব্যক্তিগত কলহ আছে, তবু ত ইহা ভাঙ্গিয়া যায় নাই—যাঁহার মতে মিলিতেছে না; মন খুলিতেছে না, তিনি সরিয়া পড়িতেছেন, কিন্তু ভাঙ্গিতে কেহ পারেন নাই। যিনি একদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রচণ্ড শক্তি ছিলেন, সেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত সেই তেজস্বী বিজয়কৃষ্ণ, প্রেমিক ভক্ত সেই বিজয়কৃষ্ণও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া গেলেন; তখন নূতন সমাজের শৈশব, এ ঘোর বিপদও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সহ্য করিয়া টিকিয়া রহিল। রামকুমার ভট্টাচার্য্য "উদাসীন সত্যশ্রবা", যিনি সন্ন্যাসীর মত আসামের বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া প্রাণপাত

করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া গেলেন। মৃত্যু অনেককে হরণ করিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণশক্তি কেহ হরণ করিতে পারে নাই। এত আঘাত সহ্য করিয়া, আজও দণ্ডায়মান আছে। সেই ব্রাহ্মসমাজকে বিধাতার বিধান বলিয়া মনে করি। রক্তক্ষরণ না করিলে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হয় না। ভক্তের রক্ত চাই। রামমোহনের হৃদয় শোণিত ক্ষরিত হইয়া যার মূলে রসসঞ্চার করিয়াছিল৷ সে অক্ষয় বীজ মাটির তলায় পড়িয়া ছিল। কেহ দেখিয়াও দেখে নাই। শুভক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি আজীবন সেই অক্ষয় বীজ কত অনুরাগ বর্ষণ করিয়া পুষ্ট করিয়াছেন। কোথায় ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র! সেই বীজটি বক্ষে ধারণ করিয়া, দুর্জ্জয় শক্তিতে বিশাল ভারতরাজ্য কাঁপাইয়া তুলিলেন। সে বীজ মরিতে আসে নাই। মুষ্টিমেয় নগণ্য লোক কেশবচন্দ্রের প্রভাবে হৃদয়ে অমিতবলের সঞ্চার অনুভব করিয়া সত্য রক্ষার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। একি সামান্য কথা! আজ আমি বলিব, মুক্তকণ্ঠে বলিব, শিবনাথের হৃদয়ে যে দুর্জ্জয় বল আর বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য প্রাণে যে অদম্য বাসনা, সাধুকার্য্যে যে অবিচলিত নিষ্ঠা, তা তিনি তাঁর যৌবনের গুরু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকট যাহা যৌবনে শিখিয়াছিলেন, তাই সমুদয় জীবন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। তারপর কেশবচন্দ্র আর যাহাই বলিয়াছেন, তাহা শোনেন নাই। বিধাতার বিধানে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপিত হইল। কুচবিহার-বিবাহের আন্দোলনের সময় ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ হইতে 'সমালোচক' বলিয়া একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়—তার স্থানে ২৯এ মে হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র-স্বরূপ 'তত্ত্ব-কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশিত হইল। রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" নামে এক কাগজ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা"—কেশবচন্দ্রের কাগজের নাম "ধর্ম্মতত্ত্ব"। শিবনাথ মনে করিলেন তাঁহাদিগের সমাজ রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সকলের উত্তরাধিকারী সুতরাং ঐ "তত্ত্বকৌমুদী" নামটির ভিতর রামমোহনের "কৌমুদী", ঐ "তত্ত্বোধিনী" এবং "ধর্ম্মতত্ত্বের" "তত্ত্ব"টুকু প্রচ্ছন্ন রহিল। শিবনাথ যখন নূতন সমাজের কাজ লইয়া মাতিলেন তাঁর পরিবার পরিজন তখন মুঙ্গেরে। এই সময় বিপুল কর্ম্মের আবর্ত্তে তাঁর দিন রাত্রি কোথা দিয়া যাইত তার ঠিকানা নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র তিনি ইহার প্রচারক, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য এবং 'তত্ত্বকৌমুদী'র সম্পাদক হইলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ১০ দিনের মধ্যেই প্রচারযাত্রা করিলেন। ডায়েরীতে লিখিতেছেন :—

"The 24th of May 1878, Friday—১২ই জ্যৈষ্ঠ আহারাদির পর আফিসে আসিয়া তত্ত্ব-কৌমুদীর জন্য একটু সংবাদ লিখিতে ও যাত্রার আয়োজন করিতে বেলা গেল৷ তাড়াতাড়ি যাত্রা করা গেল। সর্ব্বপ্রথমে চন্দননগরে নামিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা। চন্দননগর নামিয়া দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দেবেন্দ্রবাবুর সে রাত্রি কিছু অসুখ ছিল, কিন্তু তিনি আমাকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন তাঁর ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়া উঠিল! কত কথাই বলিলেন, কত উপমা, কত দৃষ্টান্তই দিলেন সমুদায় স্মরণ রাখাই দুষ্কর; তবে যথাস্মৃত কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। তিনি নানক হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "পরমেশ্বরের নাম যতক্ষণ করি, ততক্ষণ জীবিত থাকি, আর যখন তাঁহাকে বিস্মৃত হই তখন মৃত্যু। সেই সত্যনামের কথাই শ্রেষ্ঠকথা।" তিনি বলিলেন, "আমার হৃদয় তোমাদের সঙ্গে,

যেরূপে তোমরা কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, এবার তোমরা ব্রাহ্মসমাজকে একটি পাকা constitution-এ বন্ধ করিবে। তোমরা যেমন সব কথা লোককে ভাঙ্গিয়া বলিতেছ—আমি যদি সমুদয় ভাঙ্গিয়া বলিতাম তাহা হইলে লোকে প্রকৃত ন্যায়বিচার করিতে পারিত; কিন্তু আমার কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় নাই, এখনও বলিবার ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর তোমাদিগকে তুলিয়াছেন, তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা কর। ঈশ্বরের কার্য্যের সহিত যদি কোন প্রকার স্বার্থচিন্তা বা দুরভিসন্ধি প্রবিষ্ট না কর তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় জয়যুক্ত হইবে।" ইত্যাদি

চন্দননগরে মহর্ষিদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিবনাথ প্রচার-যাত্রা করিলেন, এই তাঁর প্রথম প্রচার-যাত্রা। এই সময়কার ডায়রীতে এই প্রচার-যাত্রার বিবরণ বর্ণিত আছে। ২৩এ মে ১২ই জ্যৈষ্ঠ যাত্রা করিয়া রামপুরহাট, ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, মোকামা, মজঃফরপুর, মতিহারী, সমস্তিপুর, বাঁকিপুর, দুমরাও, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় শিবনাথ যে কি কঠিন পরিশ্রম করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অধিকাংশ স্থানে তৃতীয় কি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেন, পথে আরাম বা বিশ্রাম কাহাকে বলে জানিতেন না। দুই এক দিনের জন্য যেখানে থাকিতেন অতিশয় পরিশ্রম করিতেন। বিশেষভাবে প্রস্তুত না হইয়া তিনি কখন বক্তৃতা বা উপদেশ দিতেন না। তাঁর নোটবই-গুলি তার নিদর্শন। এইগুলি পাঠ করিলে বিশেষ জ্ঞানলাভ করা যায়। এই প্রকারে প্রচার-যাত্রা করিয়াও তিনি কলিকাতার কর্ম্মক্ষেত্রসম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। এত শ্রম ও ব্যস্ততার মধ্যেও তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেদিন সংস্থাপিত হয়, সেদিনকার প্রস্তাব অনুসারে নূতন সমাজপরিচালনের জন্য নূতন নিয়মাবলী রচনা করিয়া সভ্যসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার এক প্রস্তাব ছিল। সেই নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে আনন্দমোহন বসু ও গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলকেও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। শিবনাথ কাজের ভিড়ে অনুপস্থিত থাকিলেও আনন্দমোহন বসু মহাশয় শুনিতেন না—তাঁকে চিঠির উপর চিঠি দিয়া ডাকিতেন। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ—অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এই নিয়মাবলী প্রস্তুত হইত। শিবনাথ আত্মচরিতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্লান্তিতে তাঁর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িত, নিদ্রায় চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইত—তবু নিস্কৃতি নাই। একদিন বড় অবসন্ন হইয়া টেবিলের তলায় গিয়া আস্তে আস্তে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রথমে কেহ দেখেন নাই—পরে তাঁর খোঁজ পড়িল, তখন সকলে দেখেন তিনি টেবিলের তলায় নিদ্রায় অচেতন। সকলে তাঁর পা ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন—তখন আবার চোখে জল দিয়া নিয়মাবলীর প্রশ্নে মাথা ঘামাইতে বসিলেন। বাস্তবিক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী বিশেষভাবে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কীর্ত্তি।

আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি যে এই নিয়মাবলী প্রণয়ন-ব্যাপারে তাঁরও কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। স্বামীর আহার নাই, নিদ্রা নাই—তিনি ক্রমাগত স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। রাত্রে স্বামীর শয়নের অবসর হইত না—তিনি বসিয়া বসিয়া হয়রাণ। তাঁর শয়নগৃহের ভিতর শিবনাথ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতে করিতে এক একদিন আনন্দমোহনবাবুর পাশেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। এমন করিয়া কত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া নিয়মাবলী

প্রস্তুত হইয়া উঠিল। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবামাত্র চারিজনকে প্রচারক মনোনীত করা হয়, যথা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, রামকুমার বিদ্যারত্ন, এবং শিবনাথ। ইঁহারা সে সময় যে ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে চির-স্মরণীয়। ১৮৮৬ সালে বিজয়বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রামকুমার বিদ্যারত্নও ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়েন। অতি অল্প দিন পরেই গণেশবাবুর মৃত্যু হয়। রহিলেন কেবল শিবনাথ!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থাতে Brahmo Public Opinion-ই তার ইংরাজী কাগজ ছিল। দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই সংবাদ-পত্রের সমুদয় ভার বহন করিতেন।

নূতন সমাজে নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া গেল। শিবনাথ তার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ভিতর আপনাকে ঢালিযা দিলেন। শিবনাথের জীবনের কাহিনী অতঃপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেব গঠনের ইতিহাস। ক্রমে তাহাই বলিতে হইবে।

॥ চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥

ধর্ম্মবীর—কর্ম্মক্ষেত্রে

মহা সংগ্রামের ভিতর ১৮৭৮ সাল কাটিয়া গেল। ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের মাঘোৎসবের সময় নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইহার পূর্ব্বেই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর একখণ্ড জমি ক্রয় করা হইয়াছিল। নূতন মন্দির নির্ম্মাণের জন্য সকল সভ্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যেরা প্রত্যেকে এক এক মাসের মাহিনা এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট হইতে শিবনাথ ৭০০০ টাকা আনিলেন। ইহা ভিন্ন সিন্ধিয়া, পাঞ্জাবের সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতি মুক্তহস্তে এ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের সময় মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সময় এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল।

ভোর না হইতে হইতে শহরের চারিদিক হইতে নরনারী, বালকবালিকা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৭টার সময় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ একটি প্রস্তরখণ্ডে সেই দিনকার ঘটনা খোদিত করিয়া সেইটি হাতে লইয়া উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে প্রস্তরখানি নিহিত করিতে হইবে তাহার চারিদিকে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। শিবনাথ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সেদিনকার মহৎ কার্য্যের সূচনার বর্ণনা করিলেন। যে সত্যের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, যে সত্য-স্বরূপের পূজার জন্য মন্দির নির্ম্মিত হইবে তার বর্ণনা করিলেন। তারপর সকাতরে ভগবানের চরণে সফলতার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সকলের প্রাণে গভীর ভাবোচ্ছ্বাস হইল, চক্ষের জলে সকলের বুক ভাসিয়া গেল! আজ আর কৃতজ্ঞতা কারো প্রাণে ধরে না। শিবনাথ প্রস্তরখানি হাতে ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহাতে যাহা লেখা আছে পাঠ করিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি অক্ষর সকলের প্রাণে

গিয়া বিদ্ধ হইল। শিবনাথের কৃতজ্ঞতা প্রাণে আর ধরে না, তিনি ভক্তির সহিত গম্ভীরভাবে প্রস্তরখানি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলেন—সমবেত সমুদয় নরনারী এমন কি শিশুসন্তানগণ পর্য্যন্ত ভিত্তি স্থাপন করিল। আমার স্মরণ আছে, আমি দশ বছরের বালিকা হইলেও চূন সুরকি কর্ণিকে করিয়া ভিত্তির উপর দিয়াছিলাম। শিবনাথের কার্য্য শেষ হইলে ভক্তিভাজন বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব একটি প্রস্তরের পাত্রে, সমালোচক, তত্ত্বকৌমুদী, Brahmo Public Opinion প্রভৃতি সংবাদপত্রের এক এক খণ্ড এবং পার্চমেন্ট কাগজে লিখিত অনুষ্ঠান-পত্র ভূগর্ভে নিহিত করিলেন।

১১ই মাঘ এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। মন্দিরের ট্রাষ্টী নিযুক্ত কবার কার্য্যে তৎপরে সকলে মনোযোগী হন। এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী নিযুক্ত হনঃ আনন্দমোহন বসু, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, সর্দ্দার দয়াল সিংহ, উমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্কাড়ি ঘোষ, ভগবানচন্দ্র বসু, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

১৮৭৯ সালের মাঘোৎসবের ঠিক পূর্ব্বে ১৯এ জানুয়ারি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা শিবনাথ প্রভৃতির বিশেষ আগ্রহে আহূত হয়। এই সভায় তিন সমাজের মিলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। আদি এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মিলিত হইলেন বটে কিন্তু নববিধান সমাজের তরফ হইতে দুই একজন দর্শকরূপে আসিযাছিলেন এই মাত্র। স্বয়ং মহর্ষিদেব কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

এই জানুয়ারি মাসেই আর এক কার্য্যের সূত্রপাত হয়। বালকদিগের সুশিক্ষার জন্য সিটি স্কুল স্থাপিত হইল। এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বালকদিগের প্রাণে জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের নীতিশিক্ষা দেওয়া। যাহাতে বিদ্যালয়টির আবহাওয়া এমন হয় যে বালকগণ তরুণ বয়স হইতে ধর্ম্ম এবং নীতি সম্বন্ধে উন্নত ভাব হৃদয়ে লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে ধার্ম্মিক চরিত্রবান তেজস্বী শিক্ষকসকল নিযোগ করা হয। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান-পত্রখানি আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথের নামে বাহির হয়। শিবনাথ এই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষকতা করিতেন, আর আনন্দমোহন ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। সিটি স্কুল সংস্থাপন বিষয়ে শিবনাথের অদম্য উৎসাহ ছিল। প্রতিদিন স্কুলের সময় বিদ্যালয়ে গিয়া সমুদয় পরিদর্শন করিতেন। ছেলেদের ভিতর সদ্ভাব সঞ্চারের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সিটি স্কুলের সুনাম প্রতিষ্ঠার দিন হইতে পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক সিটি স্কুলে পুত্রদিগকে ভর্ত্তি করিয়া দিল। বলিতে গেলে প্রথম মাস হইতেই সিটি স্কুল একটা জাঁকাল স্কুল হইয়া পড়িল। এই স্কুলের জন্য শিবনাথের সে সময় আহার নিদ্রার অবসর ছিল না। সিটি স্কুল স্থাপন করিয়াই শিবনাথ এবং তাঁর বন্ধুগণ নিশ্চিন্ত হইলেন না, আর একটি মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত হইল।

১৮৭৯ সালের ২৭এ এপ্রিল তারিখে শিবনাথ আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির বিশেষ চেষ্টায় ছাত্রসমাজ স্থাপিত হয়। কুচবিহার-বিবাহের পূর্ব্ব হইতে, যখন শিবনাথ হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তখন হইতে ছাত্রসমাজ স্থাপন করিবার বাসনা তাঁর প্রাণে উদিত হয়। তখন দেখিতেছি তিনি আনন্দমোহন বসুর নিকট ছাত্রদের জন্য একটি Students Fort-nightly meeting করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রস্তাব করিতেছেন। যাই হোক এখন সেই প্রিয় কার্য্যটি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই কার্য্যে তাঁর বন্ধুগণ বিস্তর সহায়তা করিলেন। বিশেষতঃ আনন্দমোহন বসু মহাশয় অত্যন্ত সাহায্য করিতে

লাগিলেন। প্রথমে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে সিটি স্কুলের ঘরে ছাত্রসমাজের কাজ চলিল। ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা-সকল হইতে লাগিল। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল বক্তৃতা দিতেন, তাহা যে কতদূর চিত্তাকর্ষক, ও উদ্দীপক হইত বলা যায় না। কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ এই মনোমুগ্ধকর বক্তৃতাসকল শুনিবার জন্য দলে দলে আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মিত হইলে সিটি স্কুল হইতে ছাত্রসমাজ উঠিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তখন হইতে শনিবার সন্ধ্যাকালে ছাত্রসমাজেব কাজ হয়। অবশ্য ছাত্রসমাজের সে দিন আর নাই। আজ কে হিসাব দিতে পারে যে তখনকার ছাত্রসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া কত যুবার জীবনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। তখনকার ছাত্রসমাজেব কত সভ্য আজ আমাদেব দেশের জ্ঞানীগুণী, সত্যব্রত লোকদিগের অগ্রণী—কত মহামূল্য জীবন ছাত্রসমাজের সংশ্রবে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিয়াছে। ছাত্রসমাজের সংশ্রবে শিনবাথ যে কার্য্য করিয়াছেন, তার মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ। তাঁর সেই সময়কার বক্তৃতাসকল বাঙ্গালাভাষার অমূল্য নিধি। ছাত্রসমাজের বক্তৃতা-স্থলে শিবনাথ যে সকল বক্তৃতা দিতেন, তার তুলনা নাই, তাহাতে ভাষা, চিন্তা, ওজস্বিতা, সবসতা, মাধুর্য্য যে কত ছিল, তা যাঁরা না শুনিয়াছেন তাঁদের নিকট বর্ণনা করিয়া বলা যায় না। তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, তারা কখন প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তির অনুভব কবিত, কখন চক্ষের জল ফেলিত, কখন অট্টহাস্যে বিশাল গৃহ নিনাদিত করিত। আব অনবরত করতালিধ্বনি আর hear hear শব্দ শ্রুত হইত। আজও মনে হয় যে সেই প্রাণ-উন্মাদিনী আবেগময়ী বাণী শুনিতেছি। ছাত্রসমাজের বক্তৃতামঞ্চে শিবনাথ প্রমাণ করিয়া দিলেন যে তিনি বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। এমন সারবান বক্তৃতা কি বাঙ্গালী যুবক আর শুনিয়াছে? কেনই বা হইবে না, শিবনাথ প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা দিতেন বটে কিন্তু তার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেন, গভীর চিন্তা করিয়া মন্তব্য লিখিতেন। এমন সুসংবন্ধ চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা কি সাময়িক উত্তেজনায় হইতে পারে? শিবনাথের দায়িত্বজ্ঞান অতিশয় প্রখর ছিল, তিনি লঘুভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেন না। কাজেই তাঁর পরিশ্রমের আর অন্ত ছিল না। ছাত্রসমাজ এখনও আছে বটে কিন্তু তার সে দিন নাই। তখন ৩০০।৪০০ ছাত্র কখনও কখনও বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতিতে যাইতেন, কত সান্ধ্য সম্মিলন, কত আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইত। এই ছাত্রসমাজটির জন্য শিবনাথ অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। কেবল সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা, ছাত্রসমাজ স্থাপন প্রভৃতি কাজেই শিবনাথ ব্যস্ত ছিলেন না, ১৮৭৯ সালে আবার প্রচার-যাত্রা করিলেন। এবার বিহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বোম্বে, গুজরাট প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। এইবারকার প্রচার-যাত্রার বিষয় ডায়েরিতে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। ডায়েরিতে দেখিতেছি ঃ—

"২৯এ আগস্ট শুক্রবার বোম্বাই নগরে উপস্থিত হই। শনিবার রাত্রে Mr. Bala Mongesh Wagle মহাশয়ের বাড়ীতে প্রার্থনা-সমাজের সভ্যদিগের একটি Conversazyonie হয়। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মুখে বক্তৃতা করি।"

"৩১শে রবিবার, অদ্য প্রার্থনা-সমাজে ইংরাজিতে একটি উপদেশ দিই। কি জন্য জানি না, অদ্য যেন খুলিল না। কিন্তু রজনীবাবু বলিলেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

"২রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। অদ্য Bengal as it is এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করি। অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। অদ্যও বক্তৃতাটি আমার সন্তোষজনক হইল না।"

"৪ঠা বৃহস্পতিবার। অদ্য ইংরাজিতে উপাসনা ও উপদেশ। অদ্যকার উপদেশে অনেকে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এমনকি High Court-এর একজন উকীল নাকি বলিয়াছেন What could Father Ramington say more—এরূপ বলা কিন্তু অত্যুক্তি বোধ হয়।"

'৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার। প্রাতে প্রার্থনা-সমাজ মন্দিরে হিন্দীতে উপাসনা করা হয়, এবং বৈকালে ইংরাজীতে উপদেশ দেওয়া যায়। মন্দ হয় নাই।"

'৯ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। Age of Independence বিষয়ে ইংরাজি বক্তৃতা।"

'১১ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। অদ্য প্রাতে Lord Bishop-এর সহিত সাক্ষাৎ হয়। বৈকালে Elphinstone কলেজের বালকদিগকে Free Education সম্বন্ধে বলা যায়। কলেজের Principal সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"

শিবনাথ বোম্বাই হইতে আমেদাবাদ যাত্রা করেন। এই যাত্রা-বিবরণে বোম্বের প্রার্থনা-সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

প্রার্থনা-সমাজ (১৮৭৯)

বোম্বাই প্রার্থনা-সমাজ আজিও ব্রাহ্মসমাজের ভাব গ্রহণ করে নাই। ইঁহাদের যত্নরক্ষিত স্বতন্ত্রতাই ইহার একটি প্রধান কারণ। ইঁহাদের অভিমান আছে যে বঙ্গদেশের সমাজের সহিত ইঁহাদের কোন সংশ্রব নাই। ইঁহাদের সমাজ স্বাধীনভাবে জন্মিয়াছে, এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ইঁহারা সর্ব্বদা ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার ফল এই হইয়াছে যে বঙ্গদেশের সমাজের উপর দিয়া যে সকল উন্নতির স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তাহা ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইঁহারা উদাসীনের ন্যায় পার্শ্বে বসিয়া সে সকল স্রোত গণনা করিয়াছেন মাত্র। কিছুদিন হইল প্রতাপবাবু ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাতে তিনি অনেকের অপ্রীতিভাজনও হইয়াছেন। * * * সভ্যদিগের মধ্যে তিন চারিজনের প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। Mr. Bala Mongesh Wagle—ইঁহার সরল সপ্রেম অমায়িক ব্যবহার অতিশয় আনন্দজনক। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডরঙ্গকে দেখিলেই ভক্তি করিতে হয়, প্রাচীন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে স্মরণ হয়। ইঁহার চরিত্রে humbug-এর লেশমাত্র নাই। হৃদয়ের আন্তরিক সৌজন্য ও সাধুতা যেন চেহারাতে মাখান রহিয়াছে। প্রকৃতিতে চাতুরী প্রদর্শনাভিলাষ ও আত্মম্ভরিতার লেশমাত্র নাই। ইঁহার পুত্র বিধবা বিবাহ করিয়াছেন, একজন খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন, এক কন্যা বিধবা হইয়া গিয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তি নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ, কি চমৎকার লোকটি—বিদ্যাবুদ্ধি ও বিজ্ঞতাতে সকলের মান্য কিন্তু কি স্বাভাবিক প্রদর্শনস্পৃহাশূন্য সাধুতা। এমন অহঙ্কারশূন্য খাঁটি ভদ্রতা অল্প দেখা যায়। এইরূপ লোক দেখিলে হৃদয় উন্নত হয়। বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অনুকরণীয় দেখিতেছি, তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। (১ম) আনন্দমোহন বসু (২য়) উমেশচন্দ্র দত্ত (৩য়) নবীনচন্দ্র রায় (৪র্থ) প্রকাশচন্দ্র রায় (৫ম) শিবচন্দ্র দেব (৬ষ্ঠ) ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাঙ্গা (৭ম) নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ (৮ম) রাও সাহেব ভোলানাথ সারাভাই।"

এই প্রচার বিবরণীর ভিতর শিবনাথের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব এবং মহৎভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। তিনি বাল্যকাল হইতে আজীবন অতিশয় গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। অপরের ভিতর কিছুমাত্র সদ্ভাব দেখিলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, এবং শতমুখে তার প্রশংসা করিতেন। অপরের স্তুতিবাদে কখনই কৃপণতা করিতেন না। শিবনাথ বোম্বে হইতে গুজরাট গমন করেন।

"১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাত্রে আমেদাবাদ উপস্থিত হই, রাও সাহেব ভোলানাথ সারাভাই ও পঞ্জাবের মাধোরাম উভয়ে আমার অভ্যর্থনার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। মাধোরামের গৃহে রাত্রিযাপন করা গেল।"

"১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার। অদ্য প্রার্থনা-সমাজের সভ্যদিগকে একত্র করিয়া কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাদি মৌখিক বর্ণনা করা গেল।"

"১৬ই মঙ্গলবার। অদ্যরাত্রে Hemabhai Institute নামক স্থানে India's Greatest Need বিষয়ে বক্তৃতা করা গেল। বক্তৃতা স্থলে একজন ইউরোপীয় পাদরী ও একজন ইউরোপীয় মহিলা ও অনেক দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।"

"১৭ই বুধবার—সারাভাই মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা এবং বৈকালে শাস্ত্রীদের সহিত বিচার।"

"১৮ই বৃহস্পতিবার। রাত্রে প্রার্থনা-সমাজ মন্দিরে ইংরাজী উপাসনা ও উপদেশ। এমন উৎকৃষ্ট উপদেশ কোথাও দিই নাই। লোকের সন্তোষের অবধি নাই। সকলেই চারিদিক হইতে আর একটি বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তদনুযায়ী পরদিন শনিবার ৩রা পৌষ ১৯এ সেপ্টেম্বর একটি বক্তৃতা ও তৎপর রবিবার পুনরায় ইংরাজি উপদেশ দিবার ইচ্ছা ছিল। শনিবার প্রাতঃকাল হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শয্যাই থাকি।"

"২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার। বরোদাতে উত্তীর্ণ হই। অনেকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তৎপূর্ববর্ত্তী সোমবার আমার আসিবার কথা ছিল হঠাৎ পীড়িত হওয়াতে আসিতে পারি নাই। শুনিলাম দেওয়ান Sir T. Madhava Rao আমার আগমন সম্ভাবনা শুনিয়া আমাকে দরবারের আতিথ্য প্রদান করিবার অনুমতি করেন। তদনুসারে যে দুই দিন বরোদাতে ছিলাম সেইদিন এক গাড়ী ও দুই অশ্বারোহী পুরুষ আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল।"

"২৬শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার--Travellers' Bungalow নামক স্থানে ইংরাজিতে একটি উপদেশ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের বিষয় মৌখিক ব্যাখ্যান হয়। প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।"

"২৭শে সেপ্টেম্বর। The Sources of National Life—এ বিষয়ে ইংরাজি বক্তৃতা করি। দুর্য্যোগ নিবন্ধন পূর্ব্বদিনের ন্যায় তত লোক উপস্থিত ছিলেন না। অদ্যপ্রাতে মাধবা রাও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পৌত্তলিকতার বিষয় অনেক বিচার হয়। Sir T. Madhava Rao বলেন কোন প্রকার মূর্ত্তির কল্পনা ভিন্ন ঈশ্বরের চিন্তা করা দুষ্কর। আমি বলিলাম, "The consciousness of an encompassing presence সম্ভব।"

এই প্রচারযাত্রাই ১৮৭৯ সালের প্রধান ঘটনা। এই প্রচার-বিবরণী হইতে তাঁর প্রবাসকালের দুরন্ত শ্রমের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। এত খাটিয়াছিলেন যে জ্বরে পড়িলেন। আপনার শরীর বাঁচাইয়া কাজ করিতে তিনি একেবারেই জানিতেন না। ১৮৭৯ সালের শেষে কলিকাতায় ফিরিয়া আবার নানা কার্য্য লইয়া মাতিলেন।

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

পত্নী প্রসন্নময়ী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শিবনাথের বয়স একত্রিশ বৎসরমাত্র। দেহমনের তখন পূর্ণতেজ। প্রচারকব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি বাস্তবিক কঠোর সংযমী তপস্বীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এত উত্তেজনা, এত পরিশ্রম বোধ হয় বয়সের গুণেই সহ্য হইয়াছিল—নচেৎ এমন অমানুষিক শ্রম কি রক্তমাংসের দেহে সহ্য হয়? তিনি কি করিয়া শ্রান্তিহারা হইয়া দিনরাত পরিশ্রম করিতেন, তাহা আমার স্মরণ আছে। এমন সর্ব্বদাই হইত, হয় ত প্রাতে উপাসনা, দ্বিপ্রহরে কোন সভা, সন্ধ্যায় বক্তৃতা, তারপর নিশীথ রাত্রে ২টা ৩টা পর্যন্ত তত্ত্বকৌমুদী, এবং ইংরাজি কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। লিখিযাই নিষ্কৃতি পান নাই, প্রুফ দেখা ত ছিলই, তার উপর ক্রমাগত প্রেসে গিয়া তাগাদা করা, প্রকাশ করা, ডাকে পাঠান—তাও দেখিতে হইয়াছে। কলিকাতায় যখন থাকিতেন তখন এই, প্রচার-যাত্রা যখন করিতেন তখন কি করিয়া পরিশ্রম করিতেন, পূর্ব্বে অধ্যায়ে তার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকরূপে বাহিরে তাঁকে এই দুরন্ত পরিশ্রম করিতে হইত, ঘরে তাঁর কি ভাবে দিন যাইত? বাহিরে ত মানুষের আসল পরিচয় মিলে না। বক্তৃতামণ্ডে উদ্দীপনাময় বক্তৃতা শুনিযাই ত মানুষেব বিচার করা চলে না। গৃহে তাঁকে যে-মূর্ত্তিতে দেখিয়াছি সেই তাঁর আসল স্বরূপ। দারিদ্র্য যিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিযাছিলেন দারিদ্র্যের ভিতর তিনি প্রসন্নচিত্তে থাকিবেন—তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু তিনি যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, যে সদাব্রত পালন করিযাছিলেন, তাহা কখনই সম্ভব হইত না যদি পত্নী প্রসন্নময়ীর সাহচর্য্য লাভ না করিতেন। বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই শিবনাথ কিন্তু গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পান নাই।

নিজের সংসারটি বড় ক্ষুদ্র ছিল না, তাব উপর কত অনাথা বালিকা, কত বন্ধুর কন্যা তাঁর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রসন্নময়ী তাঁর ক্ষুদ্র জীবনে ২২টি বালিকাকে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন। ভৃত্য রাখিবার সামর্থ্য বড় ছিল না, আজীবন নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া প্রসন্নময়ী সকলকে খাওযাইয়াছেন—আর কি ভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াছেন যাঁরা না দেখিয়াছেন, তাঁদের বোঝান দুষ্কর। শিবনাথের জীবনের অপূর্ব্ব বিকাশের কথা বলিতে গিয়া তাঁর আজীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী প্রসন্নময়ীর কথা না বলিলে এই কাহিনীর মর্ম্মকথাটি সুপ্রকাশ হইবে না। শিবনাথের সকল সাধন ভজন লোকসেবা পণ্ড হইয়া যাইত, যদি তাঁর দুঃখের সংসারে এই অন্নপূর্ণা প্রসন্নময়ী মা আমাদের না থাকিতেন। পিতা নাকি মাকে কখন কখন ঠাট্টা করিয়া "শঙ্করী" বলিয়া ডাকিতেন। প্রায় বলিতেন "সাবাস শঙ্করী", শঙ্করী যে শিবের অন্নপূর্ণা গৃহিণী ছিলেন তাতে আর সন্দেহ নাই। শিবনাথের অনেক কীর্ত্তি এ জীবনে আছে, অনেক মানুষ তিনি গড়িয়া গিয়াছেন, যাঁরা আজ দেশের গৌরব—কিন্তু তাঁর প্রভাবে আমাদের জননী যাহা হইয়াছিলেন, সেই তাঁর মহাকীর্ত্তি।

এইখানে প্রসন্নময়ীর জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রসন্নময়ীর বয়স যখন একমাস, তখন হইতে তিনি আড়াই বৎসরের বালক শিবনাথের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন। দশম বৎসরে বিবাহিত হইয়া তিনি আজীবন শিবনাথের সংসারে দুঃখ দারিদ্র্যের ভার বহন করিয়া গিয়াছেন। প্রসন্নময়ীকে

জন্ম-দুঃখিনী বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কুলীন হইলেও তাঁর পিতৃ-পরিবার অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। সে দারিদ্র্যের তুলনা হয় না। সুতরাং প্রসন্নময়ী পিতৃগৃহে অতি অযত্নে প্রতিপালিত হইয়াছেন।

বাল্য হইতে তিনি এমনই সেবাপরায়ণা ছিলেন যে, পাড়াপ্রতিবেশীর জ্ঞাতি-বৌদের অনেক গৃহকর্ম্ম করিয়া দিতেন। তারা আদর করিযা প্রসন্নময়ীকে কিছু খাইতে দিলে, তিনি কখনই তাহা মুখে দিতে পারিতেন না, কারণ হয় ত গৃহে দেখিযাছেন মা সেদিন অভুক্ত! ঘরে হাঁড়ি চড়ে নাই। অমনি দৌড়িয়া আসিয়া কর্ম্মরতা মার মুখে পিছন হইতে সে মিষ্টান্নটুকু গুঁজিয়া দিয়াছেন। আমাদের কাছে পরিণত বয়সে সেই গল্প করিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিতেন, "ছোটবেলার স্মৃতির সঙ্গে আমার জন্ম-দুঃখিনী মার দুঃখের কথা প্রাণে আঁকা আছে—আমি মার কষ্ট বুঝিতাম, মাকে কেউ গাল দিলে আমার বুক ফাটিয়া যাইত। পাড়ার বৌদের কাহারো কোন কাজ করিযা দিলে, তারা আদর করিয়া আমার হাতে কোন খাবার সামগ্রী দিলেই আমি ছুটিয়া আসিয়া মার মুখে গুঁজিয়া দিতাম, নিজের মুখে কিছুতেই তুলতে পারিতাম না।" প্রসন্নময়ীর চরিত্রের এই হইতেছে মূল সুর। তিনি আশৈশব দয়াময়ী স্নেহময়ী—তাঁর বাল্যের কথায় শুনিয়াছি যে তাঁদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। সেই কয়দিন সকলে আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, কিন্তু বলির সময প্রসন্নময়ী কানে আঙ্গুল দিয়া পাড়া পার হইয়া ছুটিয়া যাই-তেন। তিনি বলিতেন, "সকল ছেলেরা পাঁঠাবলি দেখবার জন্য উপস্থিত হইত—আর তাঁর কানে যেই "মাগো ব্রহ্মময়ী" শব্দ প্রবেশ করিত, অমনি যেন তাঁর বুকের পাঁজর খুলিযা আসিত।" তিনি এই বলির ব্যাপারে বড় ক্লেশ বোধ করিতেন, অনেক ধমক দিয়াও কেহ তাঁকে স্থির করিতে পারিত না। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা প্রসন্নময়ী দশ বৎসর হইতে না হইতে বিবাহিত হইয়া শ্বশুরবাড়ী গেলেন। প্রথমদিন হইতে শিবনাথের জননীর দরিদ্রের ঘরের এই কালো মেয়েটির উপর বিষম অপ্রসন্ন দৃষ্টি পতিত হইল। প্রসন্নময়ী প্রাণপণে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা যত্ন করিয়া তাঁদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁর শ্বশুর-পরিবার সম্পন্ন না হউক, বেশ স্বচ্ছন্দ অবস্থায় ছিলেন। তবু সেখানে প্রসন্নময়ী কষ্টেই বাস করিতেন। ভোর ৪টা হইতে রাত্রি পর্যন্ত একা সমুদয় গৃহকার্য্য করিতেন। ছড়া-ঝাঁট, উঠান নিকান, বাসন মাজা, জল তোলা, ঠাকুরসেবার ব্যবস্থা করা, তারপর রন্ধন। সকল প্রকার গৃহকর্ম্মে তিনি অতিশয় দক্ষ হইয়া উঠিলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বৌ-এর কার্য্য-কুশলতার শতমুখে প্রশংসা করিতেন, বলিতেন, "কাঠবিড়ালী সেতু বেঁধেছিল, আর আমার একরত্তি বৌ এত বড় সংসার একা মাথায় করে রেখেছে।" তখন প্রসন্নময়ী আনন্দে গলিয়া যাইতেন। গ্রামে যখন বড় বড় যজ্ঞের আয়োজন হইত, লোকে প্রসন্নময়ীকে রন্ধন করিবার জন্য লইয়া যাইত, প্রসন্নময়ী স্নান করিয়া গলবস্ত্রে উননের সম্মুখে প্রণত হইয়া. সারাদিন একা অক্লান্তভাবে রন্ধন করিয়া উঠিতেন। লোকে যখন "ধন্য ধন্য" বলিত তখন সারাদিনের ক্লান্তি অবসাদ নিমেষে ভুলিয়া যাইতেন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা শ্রমেব পর নিজে কিছুই খাইতে পারিতেন না, তবু প্রসন্নমুখে গৃহে আসিয়া মনে করিতেন এমনি করিয়া প্রতিদিন খাটিতে হইলেও কোন দুঃখ নাই।

গোলোকমণি দেবী অতিশয় সুনিপুণ গৃহিণী ছিলেন। তিনি প্রসন্নময়ীকে অতিশয় কার্যকুশলা করিয়া তুলিয়াছিলেন। কর্ম্মেই প্রসন্নময়ীর আনন্দ ছিল। আর ছিল প্রসন্নময়ীর সদানন্দ প্রকৃতি। তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্নমুখে থাকিতেন, সর্ব্বদাই হাসিতেন। অতিরিক্ত হাসির জন্য শাশুড়ী তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "কোথাকার

বেহারা তুই, গাল দি, যা করি, উনি হেসেই আছেন, কি করলে তোর হাসি যায় বল ত?" সে হাসি কখনো যায় নাই। তাঁর ১৫ বৎসর বয়সে শিবনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। স্বামী আবার বিবাহ করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। কারণ তখনও স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। কি আশ্চর্য্য বিধাতার বিধান! দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পর একমাস যাইতে না যাইতে শিবনাথের মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি মনের যাতনায় পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। কলিকাতা হইতে দৌড়িয়া মামার বাড়ীতে আসিয়া দিদিমার কোলে কাঁদিয়া পড়িলেন। তখন সেখানে প্রসন্নময়ী উপস্থিত, তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। বৃদ্ধার আর তখন আনন্দ ধরে না, তিনি আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। প্রসন্নময়ীর গাল টিপিয়া আদব করিয়া বলিলেন, "ও নাতবৌ, তোর সুদিন এসেছে, শিবনাথ তোকে দেখতে চায়। আমি ত বলেছি দিদি, তোর সুদিন আসবেই আসবে, তোকে শিবনাথ ভাল বাসবেই বাসবে, তোর কোলে পাঁচটা হবেই হবে। তুই সংসারের রাণী হবিই হবি, তোকে কেউ দূর করতে পারবে না। আমি যদি যথার্থ বামণের মেয়ে হই আর যদি সতী সাধ্বী হই দেখিস তুই, দেখিস তখন' আমি মরে যাব, কিন্তু তুই তখন বলবি বুড়ি দিদিমা একথা বলেছিল।" বাস্তবিক প্রসন্নময়ী শেষ জীবনে তাঁর সন্তানদের লইয়া বসিয়া এই কথা বলিতেন আর চক্ষের জল মুছিয়া বলিতেন, "সত্যি বলছি, এ জীবনে যত মানুষ দেখেছি, আমার দিদিশাশুড়ীর মত মানুষ আর দেখি নাই।" কি করিয়া তিনি কর্ম্মরতা প্রসন্নময়ীর মুখ তুলিয়া চুম্বন করিয়া বলিতেন, "কে বলে আমার নাতবৌ কালো, আমি ত এমন সোনার মুখ দেখিনি।" গোলোকমণির জননী, এই মহীয়সী রমণীর তুলনা নাই। এদেশে এমন মহীয়সী রমণী সেকালে ছিলেন। তাই এ দেশ এখনো জাহান্নামে যায় নাই।

শিবনাথের দ্বিতীয়বার বিবাহের পরে প্রসন্নময়ীর সহিত তাঁর মিলন হইল। প্রসন্নময়ী তখন হইতে জানিলেন, তাঁর স্বামীর প্রাণে কি বিপুল প্রেম। প্রসন্নময়ীর আঠারো বৎসর বয়সের সময় মজিলপুরে আমাদের পৈতৃক ভিটায় আমার জন্ম হইল। তখন পিতা আমার মনে মনে ঘোর ব্রাহ্ম—উপবীত আছে বটে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের উপাসনায় সর্ব্বদা যোগ দেন, নিজেও উপাসনা করেন। তিনি গোপনে প্রসন্নময়ীকে তাঁর ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলেন. প্রসন্নময়ী তা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। আরও বলিয়াছিলেন যে. "দেখো, আমি চাই আমার মেয়ে হয়, আমি ছেলে চাই না, আমার যে মেয়ে হবে তাকে আমি খুব লেখাপড়া শেখাব, ইংরাজি পড়াবো।" প্রসন্নময়ী ত শুনে অবাক. ছেলে হল আরাধনার ধন, স্বামী সেই ছেলে চান না, একটা মাটির ভাঁড় মেয়ে চান, সাধ ত বড় অদ্ভুত, আবার তার বড় বড় বই পড়েই বা কি হবে? প্রসন্নময়ী কিন্তু চুপ করিয়া রহিলেন। যথাসময়ে শিবনাথের বড় সাধের কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। গোলোকমণি যেই শুনিলেন নাত্নী হইয়াছে অমনি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হরানন্দ শর্ম্মা তামাক খাইতেছিলেন, হুঁকা হাতে দৌড়িয়া আসিলেন—"কি হল, মরা ছেলে হলো নাকি?"—যখন শুনিলেন দুর্ঘটনা আর কিছুই নয় এক নাত্নী ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তখন পত্নীকে ধমক দিয়া বলিলেন, "এখনই চুপ করো! জাননা কি, একমাত্র ছেলে আমাদের, তার প্রথম সন্তান, ওই আমার নাতী হয়েছে, এখনই অলক্ষণে কান্না থামাও।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বংশে চিরদিন পুত্রের চেয়ে কন্যার আদর—এই বংশে কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করা কিছুমাত্র দুর্ভাগ্য নহে। আমার এক বৎসর বয়স হইতে না হইতে শিবনাথ পত্নীকে কলিকাতায় ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের নিকট আনিয়া রাখিলেন। সেটা প্রসন্নময়ীর পক্ষে

অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা হইল। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের বৌ, আজন্ম বিশেষ শুচিতা শিক্ষা করিয়াছেন। সে সকল তাঁর অস্থিমজ্জাগত সংস্কার হইয়া পড়িয়াছে। শিবনাথ তাঁকে একদিনে নিজের মতাবলম্বিনী করিতে পারেন নাই। তিনি ব্রাহ্ম-পরিবারে আচার বিচারের অভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেন। বড়ই তাঁর কষ্ট হইত। স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন না। ফলে তাঁর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই ভগ্নদেহে অসময়ে দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিনী ভূমিষ্ঠা হইল—তখন প্রসন্নময়ীর প্রাণ লইয়া টানাটানি। শিবনাথ তখন কলেজের ছাত্র, বৃত্তিমাত্র সহায়। রুগ্না পত্নী সদ্যজাত শিশুকন্যা আর কন্যা হেমলতাকে লইয়া বিব্রত। একটি দাসী রাখিবার অর্থ নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, একাকী পীড়িতা পত্নীর সেবা, শিশুকন্যাকে দেখা, অসময়ে প্রসূত ক্ষীণপ্রাণা আর এক কন্যার লালন পালন, তখনকার সেই অবস্থা পুরাতন বন্ধুরা কেহ ভোলেন নাই। সেই প্রসন্নময়ী পরে কি হইয়াছিলেন? তার জন্য আমরা শিবনাথের সাধুবাদ না দিয়া আর কাকে দিব? অবশ্য জন্মগত প্রকৃতি সর্ব্বোপরি, কিন্তু শিবনাথের ভিতর যে সকল মহৎ ভাব ছিল, তাহা পত্নীর ভিতর সংক্রামিত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। যে প্রসন্নময়ীর গোঁড়ামির অন্ত ছিল না, যিনি শিবনাথের গৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবা-বিবাহ দেখেন নাই, বিবাহে দেশসুদ্ধ লোকের জন্য একা রন্ধন করিলেন কিন্তু বিবাহ-সভার ত্রিসীমায় গেলেন না, বলিলেন, "বিধবার বিবাহ দেখলে পাপ হবে আমি তা দেখব না"—সেই প্রসন্নময়ী নিজে উদ্যোগী হইয়া কত বালবিধবার বিবাহ দিয়াছেন! স্বামীর ধর্ম্ম, স্বামীর সেবার ভার তিনি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশ্রমে যখন ছিলেন তখন উপাসনার মর্ম্ম বুঝিতেন না, কিন্তু পরে তিনি ভগবানের পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ভোরে উঠিয়া তাঁর প্রথম কার্য্য ছিল স্নান, তারপর উপাসনা। তবে তিনি গৃহকর্ম্মে হাত দিতেন। কি মধুর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর! ভোরে বিছানায় শুইয়া তাঁর মুখে মধুর সঙ্গীত শুনিতাম। লোক-দেখান ধর্ম্ম তাঁর ছিল না। শিবের গৃহিণী তিনি, দারিদ্র্য তাঁর চিরসঙ্গী ছিল। ও দিকে শিবনাথ চিরদিন পরদুঃখকাতর। তাঁর গৃহের দ্বার সকলের জন্য মুক্ত। অতি সামান্য আয়ে, এ সকল সদাব্রত কি সম্ভব? সম্ভব যে হইয়াছিল তাহা প্রসন্নময়ীর গুণে। শিবনাথের গৃহে তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা ছিলেন, তাঁর গুণে সে গৃহে অন্নকষ্ট কোন দিন ছিল না। সুগৃহিণী সংসারে অনেক দেখা যায় কিন্তু এমন করিয়া গৃহধর্ম্মপালন সহজে কেহ করিতে পারে না। শিবনাথের সংস্পর্শে সত্যনিষ্ঠা তাঁর হাড়ে হাড়ে বসিয়াছিল, তিনি এক চুলও বাক্যে কিম্বা ব্যবহারে সত্যভ্রষ্ট হইতেন না। কখনও ঋণ করিতেন না। এমন সুগৃহিণী ছিলেন যে দৈনিক খরচের পয়সা হইতে দুই চারিটি পয়সাও জমাইতেন। এমনি করিয়া কত দিন ধরিয়া যেটুকু পুঁজি করিতেন, তাহাও শিবনাথ চাহিয়া লইয়া পরের জন্য খরচ করিতেন। আমার কয়েকটা ঘটনা বেশ মনে আছে। একবার তাঁর এক পালিতা কন্যার বিবাহ হইবে, শিবনাথের হাতে টাকা নাই—শিবনাথ বেশ জানিতেন যে প্রসন্নময়ীর সঞ্চিত কিছু আছে নিশ্চয়ই। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমার মেয়ের বিয়ে, তুমি টাকা দেবে না দেবে কে? প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কোথায় পাব, তুমি আমায় কত টাকা দিয়েছ?"—তিনি হাসিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীকে টাকা দেবে কে? টাকা আপনি আসে"—প্রসন্নময়ী যা-কিছু কষ্টসঞ্চিত টাকা স্বামীর হাতে ধরিয়া দিলেন। আবার আর এক পালিতা কন্যার বিদেশে টাকার অভাব হয়, শিবনাথ পত্র পাইয়াই বিষন্নমুখে আসিয়া প্রসন্নময়ীকে বলিলেন,

"কি করি বলত ? তাকে কোথা হতে টাকা দিই—তোমার পুঁজি থাকে দেও না।"

আবার প্রসন্নময়ীর হাত শূন্য হইল। যতবার পুঁজি জমিয়াছে তত বার, ৪০৷৫০ টাকা করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রসন্নময়ী সময়ে সময়ে স্বামীকে বলিতেন, "তোমার মিষ্টি কথায় কেন যে আমি ভুলি তা জানি না, তুমি টাকার যম, আমি আর এক পয়সাও জমাব না; খেয়ে না খেয়ে পয়সা রাখি তুমি বিলোবে বলে ?"—তা বিলাইতে প্রসন্নময়ীও বড় কম ছিলেন না। তিনি তাঁর পালিতা কন্যাদিগকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা যাঁরা দেখিয়াছেন তাঁরাই জানেন। এখানে তার বর্ণনা হয় ত অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। অধিক আর কি বলিব আমরা তাঁর পরের মেয়েকে ভালবাসা ও যত্ন করিতে দেখিয়া কতদিন বলিয়াছি, "মা যীশুখৃষ্ট পরকে আপনার ন্যায় ভালবাসিতে বলিয়াছেন, আপনার চেয়ে বেশী ভালবাসিতে বলেন নাই। তুমি আমাদের চেয়ে তোমার ঐ সব মেয়েকে নিশ্চয় বেশী ভালবাস, তুমি ওদের জন্যই ব্যস্ত—এটা তোমার অন্যায়।" রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা তাঁর শেষ পালিতা কন্যা। তাকে তিনি যেরূপ যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, নিজ সন্তানদিগকেও সেরূপ করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "কে বলে পরের সন্তান আপনার মত হয় না। এ আমার আপনার সন্তানের চেয়ে অধিক মিষ্ট, এ আমাকে যখন "মা" বলে ডাকে, তখন আমার প্রেমসিন্ধু উথলে উঠে, আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।" প্রসন্নময়ীর হৃদয়ের প্রেমের ক্ষুধা কিছুতেই মিটিত না। শিশুমাত্রেই তাঁর পরম আদরের ছিল। সর্ব্বদাই একটি ছোট ছেলে না হইলে তাঁর চলিত না। তাঁর এই প্রেম সকলের প্রতি ধাবিত হইত, দীন দুঃখী, আশ্রিত ভৃত্য সকলকে ভালবাসিতেন। তিনি দরিদ্রের চিরবন্ধু ছিলেন। মার সঙ্গে যখন একবার মধুপুরে ছিলাম, মা তখন কেবল এই সন্ধানে ফিরিতেন, "কাহার অসুখ হইয়াছে", "কাহার চাকর নাই।" বেড়াইতে বাহির হইলে আমরা একজনের বাড়ী যাইতে চাই, তিনি কেবল পীড়িতদের বাড়ী যাইতে চান। আর প্রতিদিন কেবল রন্ধন করিয়া পীড়িত ব্যক্তিদের পাঠাইয়া দেন। লুকাইয়া কাহাকেও বা টাকা ধার দেন। বাস্তবিক তাঁর মত নিয়ত পরের সেবা করিতে দ্বিতীয় নারীকে দেখি নাই। শিবনাথ তাঁকে সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি যেন স্বামীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। যদি কেহ দান যজ্ঞ করিয়া তাঁর উপর বিতরণের ভার দিতেন, তাহা হইলে তাঁর মত স্ফূর্ত্তি আর কাহারও হইত কি না সন্দেহ। সেবার আনন্দ তাঁর জীবনের সর্ব্বপ্রধান আনন্দ ছিল। আর তাঁর উদারতার কথা কি বলিব ? জাতের বিচার কিছুই নয় এ কথা যখন বুঝিলেন তখন আর তাঁর দ্বিধামাত্র রহিল না, মুসলমান ধোপা নাপিতের মেয়েও আর অস্পৃশ্য রহিল না। বিধাতা তাঁর জন্য অনেক সুখের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন—আজীবন দারিদ্র্য দুঃখে তিনি নিষ্পেষিত হইয়াছেন। চিরদিন কত বোঝাই বহন করিয়াছেন, কিন্তু নিজ হৃদয়ের অসাধারণ গুণে সংসারে কত আনন্দধারাই না বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। এত দুঃখের ভিতর আর কি কেহ এত আনন্দ করিয়াছে, বা অপরকে এত আনন্দ বিতরণ করিয়াছে ? খাটিতে যেমন পারিতেন, প্রফুল্লতাও তেমনি ছিল। মুখে হাসি, হাতে কাজ, এই চিরদিন দেখিয়াছি।

কে যে তাঁর নাম প্রসন্নময়ী রাখিয়াছিল জানি না। এমন প্রসন্নময়ী মূর্ত্তি সংসারে সচরাচর দেখা যায় না। জননী প্রসন্নময়ী এবং পিতা অন্তরে বাহিরে এক ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। চিন্তায় যাহা, কার্য্যে তাহা। শিবনাথের জীবনে যে এত শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা পত্নী প্রসন্নময়ীর সাহচর্য্যে কতখানি হইয়াছিল তাহা কে বলিবে ? ভগবান তাঁকে এমন মহৎহৃদয়া, স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা,

কার্য্যকুশলা, পত্নী দিয়াছিলেন, তাই এমন করিয়া এ জীবনে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা সিদ্ধি সুদূরপরাহত হইত তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। শিবনাথ নিশ্চিন্ত মনে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন; ঘরের ভিতর তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কার্য্যে পরিণত করিয়া পত্নী দেখাইলেন—সেবা কাহাকে বলে! এই প্রকাবে ঘরে বাহিরে পতি পত্নী সেবাব্রত পালন করিতে থাকিলেন। শিবনাথ যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইলেন তখন প্রসন্নময়ী অন্তরে বুঝিলেন তিনি প্রচারকের পত্নী। যত প্রকার উপায়ে তাঁর সাধ্য ছিল জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কেবল পরিবার পরিজনের নয়—ব্রাহ্মসাধারণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শিক্ষিতা ছিলেন না যে, কিছু বলিবেন বা লিখিবেন—গৃহকর্ম্ম ত শিখিয়াছিলেন, পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাহাই হইল তাঁর সেবার সম্বল। উৎসবের সময় মফঃস্বলের লোকেদের সুবিধার জন্য আনন্দবাজার বসিত। যখন প্রথম আনন্দবাজার সূচিত হয়—তখন প্রসন্নময়ী নিজে রন্ধন করিতেন। ভগ্নশরীরেও দুরন্ত শ্রম করিতেন। পরে রন্ধন করিতে পারিতেন না। উৎসবেব কয়দিন ভাণ্ডার রাখিতেন। উৎসবের মাসাবধি পূর্ব্ব হইতে সুপারি কাটা, মসলা ধোয়া, বড়ি দেওয়া প্রভৃতি আরম্ভ হইত। লোকেরা ভাল খাইবে, তৃপ্তি পাইবে সেই আনন্দই তাঁর প মানন্দ।

তারপর মফঃস্বল হইতে যে সকল ব্রাহ্ম সপরিবারে আসিতেন, তাঁদের যত্ন লইবার ভার কেহ তাঁকে না দিলেও তাঁব দায়িত্বজ্ঞানে বড় বাধিত। কার কাচছেলের দুধের বন্দোবস্ত হয় নাই, কার কি অসুবিধা ইত্যাদি সব নিজে খোঁজ করিয়া দেখিয়া বেড়াইতেন। তাঁর চক্ষে পড়িলে কাহারও কোন অভাব অপূর্ণ থাকিত না। মফঃস্বলের লোক বলিয়া উৎসবের সময় তিনি অস্থির হইতেন। তিনি উপাসনায় যাইতে কখনও অবহেলা করিতেন না, কিন্তু সংকীর্ত্তনে মাতামাতি ভালবাসিতেন না। সংকীর্ত্তন বসিয়া বসিয়া শোনার চাইতে সেই সময় লোকের উপকার হাতে করিলে অনেক ভাল হয়, এই তাঁর মত ছিল। কারো কোন কষ্ট অসুবিধা দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া চক্ষু ফিরাইয়া যাওয়া তাঁর নিকট অপরাধ বলিয়া মনে হইত। তিনি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতেন "শাস্ত্রীর স্ত্রী" হওয়াতে তাঁর স্কন্ধে অনেক দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যাঁদের উপর ধার্ম্মিক বলিয়া তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, তাঁদের অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, ভালবাসিতেন। যথা—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস—ইঁহাদিগকে তিনি বড় শ্রদ্ধা করিতেন। যখন প্রচারক-নিবাসে শিবনাথ এবং বিজয়কৃষ্ণ সপরিবারে বাস করিতেন তখন প্রসন্নময়ী রাঁধিতে রাঁধিতে দশবার গিয়া ধ্যানস্থ গোস্বামী মহাশয়ের মুখশ্রী দেখিয়া আসিতেন, আর বলিতেন "গোঁসাইজীকে দেখলে পূজার ফল হয়।" গোস্বামী মহাশয় তখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া খঞ্জনী লইয়া উপাসনায় বসিতেন, ১২টা না বাজিলে আসন ত্যাগ করিতেন না। আবার আহার করিয়া পাঠ করিতে বসিতেন। একাসনে বসিয়া অর্দ্ধেক দিন কাটাইতেন। শিবনাথ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করিয়াই বাহিরে ছুটিতেন। প্রসন্নময়ীর তাহা পছন্দ হইত না, তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের পায়ে ফুল ফেলেই শাস্ত্রীর ছুট, ধার্ম্মিক লোকের দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে হয়।" একবার প্রসন্নময়ী বাঘআঁচড়ার উৎসবে গিয়াছিলেন। সেখানে একদিন সেখানকার মেয়েদের লইয়া ভগবানের নামগান করিয়াছিলেন। তত্ত্বকৌমুদীতে সে কথা ছাপা হইয়াছিল। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিয়া প্রসন্নময়ী চটিয়া গেলেন। স্বামী বাড়ী আসিলেই তাঁকে বলিলেন, "তোমাদের কাগজ অসার; যত ফাঁকি কথায় কাগজ ভর্ত্তি করা হয়, আর আমি তত্ত্বকৌমুদী পড়ব না।" তখন হইতে তত্ত্ব-

কৌমুদী আর পাড়তেন না। তাঁকে সকলে "বড় মা" বলিয়া ডাকিতেন। তিনিও অন্তরে অনুভব করিতেন "সকলের মা তিনি।"

যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ একে একে পদত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন, বিজয়কৃষ্ণ গেলেন, রামকুমার বিদ্যারত্ন গেলেন, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গেলেন তখন একজন বন্ধু তাঁকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "এবার শাস্ত্রী সরে পড়বেন।" প্রসন্নময়ী হাসিয়া বলিলেন, "শাস্ত্রীর পালাতে ইচ্ছা পালান, আমি ছাড়চি না।" "সে কি কথা স্বামীকে ছেড়ে ব্রাহ্মসমাজে থাকবেন, কে আপনাকে এখানে আনল?" উত্তর—"এনেছেন স্বামী, তা আমার প্রাণ শীতল হয়েছে আমি বেঁচেছি, আমি স্বামীর জন্যও ছাড়ব না।" বন্ধুটি শিবনাথকে একথা বলিয়া কহিলেন "দেখেছেন গৃহিণীটি আপনার; কি পাকা ব্রাহ্মিকা হয়েছেন।" শিবনাথ পত্নীদ্বয়ের প্রাণে ভগবদ্‌ভক্তি জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এখানেই তাঁর জীবনের চরিতার্থতা! শিবনাথ একদিন তাঁর কনিষ্ঠা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা আমি তো তোমাকে কখন ধর্ম্মোপদেশ দিই নাই, উপাসনা করতে বলি নাই, তোমার ভগবানের নামে এত মতি হল কি করে?" তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি হেমের মার কাছ থেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিখেছি, তাঁকে দেখে আমার ভগবানের নামে মতি হয়েছে।" একি প্রসন্নময়ীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা! মুখের কথা বড় নয়, বড় হইল সংসারে দৃষ্টান্ত!

॥ ষোড়শ অধ্যায় ॥

প্রবল কর্ম্মময় যুগ
১৮৮০—১৮৮৭

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্র তার অপূর্ব্ব প্রাণশক্তি নানা বিভাগে নানা কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিল। সমুদয় কর্ম্মের ভিতর শিবনাথ আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলেই সে সময় নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য শ্রম করিতে ব্যগ্র ছিলেন। দৈহিক স্বাস্থ্যের পরিচয় যেমন অঙ্গ-বিশেষের পুষ্টিতেই পাওয়া যায় না এবং দেহের সমুদয় যন্ত্রসকল এক সঙ্গেই কাজ করে, এক সঙ্গেই পুষ্ট হয়, তেমনি নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের সকল বিভাগেই ব্যক্তিগত কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবং স্বতন্ত্রভাবে সমাজের মধ্যে সজীব ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে সকল কার্য্যের সূচনা হইয়াছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিতেছি। ইহার মধ্যে শিবনাথের হাত কতখানি ছিল তাহাও দেখাইব।

১৮৭৯ সালে সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা শিবনাথ ও আনন্দমোহন বসুর বিশেষ যত্নের ফলে অতিশয় উন্নত হইয়া উঠে।

উক্ত সালেই ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবনাথ, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পত্নী ও তাঁর ভগ্নী সুবর্ণপ্রভা বসু প্রভৃতি ইহার সফলতার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। ইহা ভিন্ন সঙ্গত-সভা, তত্ত্ববিদ্যা-সভা এই সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮০ সালে শিবনাথ এক সপ্তাহের মধ্যে অর্থের অভাব মোচনের জন্য "মেরী কার্পেণ্টার সিরিজের" জন্য "মেজবৌ" নামে প্রসিদ্ধ উপন্যাসখানি লিখিয়া ফেলেন। এই সময়ে ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা অঞ্চলে প্রচার-যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৮৮১—নবনির্ম্মিত মন্দির উপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিষ্ঠার দিন ঊষাকালে ৪৫নং বেনেটোলা হইতে সকলে কীর্ত্তন করিয়া নূতন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পূজ্যপাদ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ভগবানের নাম করিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদয় গৃহটি পূর্ণ হইয়া গেল। সেদিনকার দৃশ্য সকলের পক্ষে চিরস্মরণীয়।

এই সালে শিবনাথ দুইবার মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রচারযাত্রা করেন, এবং দীর্ঘকাল তথায় বাস করেন। তথায় বাসকালে মান্দ্রাজের বন্ধুগণের অনুরোধে "The New Dispensation and the Sadharan Brahma Samaj" নামে পুস্তিকা রচনা করেন। ঐ সালের ১১ই এপ্রিল সোমবার পি. আর. মুদলিকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

'It is indeed with great pleasure that we record here the prolonged stay in our midst at this time of Pandit Sivanath Sastri, M. A. missionary of the Sadharan Brahmo Samaj who by his earnestness, humility, piety and other excellent qualities endeared himself to us, and won our sympathy to such an extent that his separation would certainly be keenly felt by one and all who had the pleasure of a moment's conversation with him."

শিবনাথ মান্দ্রাজে কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ইহা হইতে কিঞ্চিৎ বোঝা যাইবে।

১৮৮২ সালে স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন মহাশয় শিশুদিগের জন্য "সখা" নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। শিশুপাঠ্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখিয়া শিবনাথ এই কাগজখানির সাহায্য করিতেন।

১৮৮৩ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রস্বরূপ ইংরাজি কাগজ "Indian Massenger" প্রকাশিত হয়। সেই সময় শিবনাথকে Indian Massenger-এর জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

১৮৮৪ সালে মহিলাগণ রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারী কামিনী সেন, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু, কুমারী কুমুদিনী খাস্তগির, কুমারী সরলা মহলানবিশ, শিবনাথের কন্যা হেমলতা এই নীতি বিদ্যালয়ের প্রথম সেবার্থিনী দল। শিবনাথের এই বিদ্যালয়টির প্রতি অশেষ যত্ন ছিল।

১৮৮৪ সালের ২১শে অক্টোবর প্রচারোদ্দেশ্যে মান্দ্রাজ যাত্রা করেন। পথে মধুপুর, এলাহাবাদ জব্বলপুর, সাতনা, বোম্বে হইয়া মান্দ্রাজ উপস্থিত হইলেন। তাঁকে লইয়া যাইবার জন্য বুছিয়া পান্টুলু নামক মান্দ্রাজী ব্রাহ্মবন্ধু বোম্বাই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। অক্টোবর ও নবেম্বর মাস বাঙ্গালোর, কোইম্বাটুর প্রভৃতিতে বক্তৃতা উপাসনাদি করেন। এই সময় পুণায়ও গিয়াছিলেন। তখনকার যাত্রাবিবরণ ডায়েরিতে লিখিযাছেন। তাহা হইতে কিছু কিছু এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪—অদ্য অতি প্রত্যূষে পুণানগরে পৌঁছিলাম। পুণাতে রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে মহাশয়ের বাটীতে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। বুচিয়া বেঙ্গোরিতে রহিলেন কিন্তু রামরাও ও নরসিংবা নামক বাঙ্গালোরবাসী দুইজন ভদ্রলোক আমার সমভিব্যাহারে পুণাতে আসিলেন।

আমরা রাণাড়ে সাহেবের বাড়ীতে রহিলাম। অদ্য এখানকার সমাজের উৎসব আরম্ভ হইল।"

"৭ই ডিসেম্বর, রবিবার—অদ্য এখানকার সমাজের উৎসবদিবস। প্রাতে প্রফেসার ভাণ্ডারকর আচার্য্যের কার্য্য করিলেন। মধ্যাহ্নে বালকদিগের সম্মিলন। * * অপরাহ্নে আর এক মহা ব্যাপার সম্পন্ন হইল। এখানকার ভদ্রলোকগণ লর্ড রিপনের সম্মানার্থ এখানকার হীরাবাগ নামক উদ্যানে টাউন হলে এক সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে গমনের সময় বাদ্যোদ্যম করিযা লর্ড রিপনের ছবি লইয়া যাওয়া হইল। সভাস্থলে এত লোকের সমাগম হইযাছিল যে, তিন চারি জায়গায় overflowing meeting করিতে হইয়াছিল। রাত্রে প্রার্থনা-সমাজে আমাকে হিন্দীতে উপাসনা করিতে হইল।"

"৮—সায়ংকালে "Our present outlook and tuture prospect" এই বিষয়ে ইংরাজিতে প্রার্থনা-সমাজগৃহে বক্তৃতা হইল। জগদীশ্বরের কৃপায় বক্তৃতা লোকের মনোরম হইযাছিল।"

"৯ই—অদ্য প্রাতে অনেকে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। মধ্যাহ্নে এখানকার Native Ladies High School দেখিতে গেলাম। ৬১টি মেয়ে, সর্ব্বোচ্চ বয়স প্রায় ২৫ তন্মধ্যে ৩৫।৩৬টি অবিবাহিত, আর সমুদয় বিবাহিত। ইঁহাদের বন্দোবস্ত সমুদয় দেশীয় রীতির অনুরূপ।"

"১০ই—বুধবার, অদ্য প্রাতে সমাজে হিন্দীতে উপাসনা করিতে হইল।"

"১১ই—বৃহস্পতিবার, অদ্য অপরাহ্নে পুণায় হীরাবাগ নামক উদ্যানে "Social Reform and State Action" বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা করা গেল। তৎপরে রাও সাহেব রাণাড়ে কিছু বলিলেন। বক্তৃতার পর আহারান্তে প্রার্থনা-সমাজমন্দিরে যাওয়া গেল। সেখানে প্রফেসার ভাণ্ডারকর কীর্ত্তন করিলেন। এই কীর্ত্তন আমাদের দেশের রামায়ণের ন্যায়। ইহা লোকের অতি প্রিয়—বিশেষতঃ অতি হীন লোকেরাই কীর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রফেসার ভাণ্ডারকর-এর ন্যায় একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি কীর্ত্তন করিবেন, জনরবে অনেক লোক আসিয়াছিল। এই কীর্ত্তন দেখিয়া বোধ হইল, এই প্রকার উপায়েই এ সকল দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য।"

"১২ই—শুক্রবার, অদ্য প্রাতে পুণা হইতে বোম্বাই যাত্রা করা গেল।"

"১৪ই—এখানে প্রার্থনা-সমাজে ইংরাজীতে বক্তৃতা করা গেল। বক্তৃতান্তে আমেদাবাদ যাত্রার জন্য রেলগাড়ীতে আরোহণ করা গেল।"

"১৫ই—অদ্য প্রাতে আমেদাবাদ পেঁীছিলাম। পেঁীছিয়াই শুনিলাম যে, রাও বাহাদুর ভোলানাথ সারাভাই-এর প্রথম পুত্র অতিশয় পীড়িত। ইহাতে দুঃখিত হইলাম। এই সাধু পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া পরমেশ্বরের পূজা করিব এই ইচ্ছাতে ব্যগ্র হইয়া আসিতেছিলাম; সুতরাং যখন শুনিলাম যে তাঁর ঘরে এত বিপদ, তখন প্রাণে বড় ক্লেশ হইল। সাযংকালে আমাকে হিন্দীতে উপাসনা করিতে হইল। এই সময় তাঁহার পুত্রের কাল হইল।"

"১৬ই—সায়ংকালে ইংরাজিতে Destiny of Human Life বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাটি হইতে দেড় ঘণ্টা লাগিয়াছিল।"

"১৭ই—অদ্য আমেদাবাদ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। প্রাতে আমাকে হিন্দীতে উপাসনা করিতে হইল।"

"১৮ই বৃহস্পতিবার—অদ্য বোম্বাই শহরে রিপনোৎসব দেখিয়া বেড়াইলাম। লর্ড রিপন বাহাদুরকে বিদায় দিবার জন্য বোম্বাইবাসীগণ যে আয়োজন করিয়া-

ছেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য। সমস্ত দিন রাজপথে লোকে লোকারণ্য। পুরুষ স্ত্রীলোক লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। লর্ড রিপণ গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে টাউন হলে গেলেন, সেখানে অসংখ্য ডেপুটেশন ও অভিনন্দন লওয়া হইল। তৎপরে ইউনিভারসিটি হলে গেলেন, সেখানে তাঁহাকে ডি. সি. এল্, ডিগ্রী দেওয়া হইল। তৎপরে দীপাবলীর মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরিয়া গেলেন।"

"১৯এ শুক্রবার.—অদ্য প্রাতে মান্দ্রাজ যাত্রা করিলাম। মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিয়া ১লা জানুয়ারি ১৮৮৫ সালে মান্দ্রাজের নবনির্ম্মিত সমাজ সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইল।" মান্দ্রাজ সমাজের ট্রাষ্টডীডটিও শিবনাথ এই সময়ে প্রস্তুত করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা'র বিবরণ প্রদত্ত হইল।

"১লা জানুয়ারী ১৮৮৫

অদ্য নবখৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইল। অদ্য মান্দ্রাজ-সমাজের বিশেষ দিন। ইঁহাদের নব মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। অতি প্রত্যুষে আমরা সকলে একত্র হইয়া বুচিয়ার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে ক্রমে কতকগুলি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন। যথাসাধ্য একটি Procession form করা গেল। দেশীয় রৌশান-চৌকি ও অন্যান্য বাদ্যোদাম সর্মভিব্যাহারে আমরা দলবন্ধ হইয়া ব্রহ্মসংগীত করিতে করিতে যাত্রা করিলাম। ক্রমে জনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। গোপাল স্বামী মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া সংক্ষেপে এক একটু উপদেশ দিতে লাগিলেন। Procession-টি বেশ গম্ভীরভাবে অনেক রাস্তা বেড়াইয়া সমাজমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সেখানে বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদিত হইল। তৎপরে বাংগালোরস্থ বন্ধু গোপাল স্বামী তামিল ভাষাতে উপাসনা করিলেন।

মধ্যাহ্নে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা—অপরাহ্নে আবার ইংরাজি বক্তৃতা হইল। সায়ংকালে রাজমাহেন্দ্রীর বিখ্যাত বীরেশলিঙ্গম পাণ্টুলু তেলুগু ভাষাতে উপাসনা করিলেন। অদ্যকার উৎসব ঈশ্বর কৃপাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল।"

মান্দ্রাজের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

এই বৎসরই শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

১৮৮৬ সালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-পদ ত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনই এই পদত্যাগের কারণ। এই বৎসব ব্রাহ্ম-বন্ধুসভা স্থাপিত হয়। শিবনাথের এই অনুষ্ঠানে অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। সমাজসংক্রান্ত আলোচনার জন্য এই সভা স্থাপিত হয়। এই সালে শিবনাথ ঢাকার উৎসবে গমন করেন।

১৮৮৭ সালে ২৯এ জানুয়ারী ৪৫০ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বালক বালিকা সুসজ্জিত ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চুঁচুড়ার ভবনে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মহর্ষিদেব সভায় আগমন করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। মহর্ষি তাঁর প্রত্যুত্তর দিলেন। এই ঘটনার পরেই মহর্ষিদেব অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। এই বৎসর লাহোরের প্রচারক পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদ ত্যাগ করেন। ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনই এই পদত্যাগেরও কারণ। তিনি পরে "দেব-সমাজ" স্থাপন করিয়া স্বয়ং ভগবান হইয়া বসিয়াছেন। তিনি এখন আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

এতাবৎকাল ব্রাহ্মমিশন প্রেস শিবনাথ নিজের দায়িত্বে ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য চালাইতেছিলেন। ১৮৮? সালে অনেক চেষ্টার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এই সময়কার ডায়েরিতে দেখিতে পাই তিনি এই প্রেসের জন্য

কত দুশ্চিন্তা ও অর্থকষ্ট সহ্য করিয়াছেন এবং কত লোকের নিকট দৌড়াদৌড়িই না করিয়াছেন।

৩০এ আগষ্ট ১৮৮৭ মঙ্গলবারে ডায়রিতে লিখিতেছেন—"হেরম্বের বাসাতে ব্রাহ্ম-মিশন প্রেস-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য গেলাম। দ্বারিবাবু, উমাবাবু, আদিবাবু, কুঞ্জ, কালীশঙ্কর, হেরম্ব, উমেশবাবু—সকলে থাকিয়া প্রেসের আয় ব্যয় দেখিয়া দেখা গেল যে প্রেসটি সমাজে লইতে ক্ষতি নাই—সমাজ হইতে প্রেসটি রাখাই স্থির হইল।"

১৮৮৬ সালে কিছুদিন হিমালয়ে কার্সিয়ং নামক স্থানে শিবনাথ, নবদ্বীপ-চন্দ্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং শশীভূষণ বসু মহাশয় ধর্ম্মসাধনের জন্য বাস করিয়াছিলেন। এখানে বাস কালে শিবনাথ "হিমাদ্রি কুসুম" নামে একখানি অতি সুন্দর কবিতাপুস্তক লিখেন। শিবনাথের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি কর্ম্মকোলাহলের ভিতর চাপা পড়িয়াছিল, একটু অবসর পাইযাই তাহা সুন্দর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল।

বোধ হয় ১৮৮৭ সালে শিবনাথ আসাম অঞ্চলে দীর্ঘ প্রচারযাত্রা করেন, এবং ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, শিলং সমুদায় ভ্রমণ করিয়া আসেন।

পর বৎসরে আর একটি বিশেষ পারিবারিক ঘটনা ঘটে। শিবনাথের পিতা হরানন্দ শর্ম্মা কাশীধামে কলেরায় মৃতকল্প হন। টেলিগ্রাম পড়িয়া শিবনাথ কনিষ্ঠা পত্নী বিরাজমোহিনীকে লইয়া কাশীধামে গেলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া অবধি বিশ বৎসর হরানন্দ পুত্রের মুখদর্শন করেন নাই। এই পীড়ার সময় পিতা-পুত্রের এমন মিলন হইল যে, পুত্রকে ছাড়িতে পিতার চক্ষু দিয়া জল পড়িল, যে হরানন্দ শর্ম্মার চক্ষে কেহ জল কখনও দেখে নাই।

ডায়েরিতে দেখিতেছি শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নির্জ্জন বাসের জন্য ১৮৮৭ সালে কিছুদিন আলিপুরের বাগানে রামব্রহ্ম সান্ন্যালের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। এখানে নির্জ্জনতা শান্তি পাইয়াই তাঁর কবিত্বশক্তি সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি এই স্থানেই "ছায়াময়ীর পরিণয়" নামক কবিতাগ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় হইতে তাঁর ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা প্রাণে প্রবল হয়। অর্থসংগ্রহের জন্য শরৎকুমার লাহিড়ীর অনুরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। অর্থের অভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াও এই প্রকারে মস্তিষ্কের পীড়া লইয়া বেগার খাটার কথা স্মরণ হইলে মনে বড় ক্লেশ হয়। পরিজনদিগের অভাবমোচনের জন্য, মাতা ভগিনীর অভাব উপস্থিত হইলেও তাঁদের সাহায্যের জন্য তাঁকে লেখনী চালনা করিয়া নিয়ত অর্থোপার্জ্জন করিতে হইয়াছে। পরীক্ষকের বৃত্তি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা লেখা, সংবাদপত্রে অর্থ লইয়া প্রবন্ধ লেখা, সকলই মস্তিষ্কের শ্রম। দিবানিশি পরিশ্রম করিতে করিতে তাঁহার দেহে অকালে জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

॥ সপ্তদশ অধ্যায় ॥

বিলাত যাত্রা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ঠিক দশ বৎসর পরে শিবনাথ বিলাত গমন করেন। বিলাত গমনের সংকল্প বহুদিন হইতে তাঁহার প্রাণে জাগিতেছিল। ১৮৮২ সালে ১৫ই জুন তারিখে ডায়েরিতে লিখিতেছেন ঃ—

১। '৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে active service দিব।

২। ১৮৮৭ সালে ইংলণ্ডে যাইব। তখন বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর হইবে।"

আবার ১৮৮৭ সালে ১০ই আগষ্ট বুধবার লিখিতেছেন ঃ—"যতই দিন যাইতেছে, ততই একবার ইংলণ্ডে যাইবার সংকল্প আমার মনে প্রবল হইতেছে। যে যে বন্ধু বান্ধবকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছি, সকলেই বলেন যে যাওয়াতে অনেক উপকার আছে। আমি তিন বৎসর পূর্ব্বে এক প্রকার স্থির করি যে, এই ১৮৮৭ সালের প্রারম্ভে ইংলণ্ডে যাইব।"

"ভারতের নবজীবন লাভের জন্য পাশ্চাত্ত্য উদ্যোগশীলতা কার্য্যতৎপরতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এদেশে লোকের মনে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশকে সেই শিক্ষা দিবেন, অথচ এদেশীয় ভাবপ্রবণতা, সরসতা ও ধ্যানপরায়ণতা রক্ষা করিবেন। ইহা অতি কঠিন কার্য্য—পাশ্চাত্ত্য উদ্যোগশীলতার কিঞ্চিৎ ভাব হৃদয়ে করিয়া আনিতে পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কল্যাণ হইবে।" এই প্রকার ভাব হৃদয়ে লইয়া শিবনাথ ১৮৮৮ সালের ১৫ই এপ্রিল রবিবার, "মুজাপুর" ষ্টীমারে বিলাতযাত্রা করেন। ডায়েরিতে লিখিতেছেন ঃ—

"অদ্য ইংলণ্ড যাত্রা করিবার দিন! অতি প্রত্যুষ হইতেই বাড়ীতে গোলমাল লাগিয়াছে। দুর্ভাবনা ও দুঃখে হেমের মার নিদ্রা হয় নাই—আমারও ভাল নিদ্রা হয় নাই। নড়িতেছি, চড়িতেছি, আর হেমের মা এক একবার নিকটে আসিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন। তাহার মুখে এমন কাতরতার চিহ্ন অতি অল্পই দেখিযাছি * * * বাড়ী লোকে লোকারণ্য! আহা! আমার প্রতি ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের কি সদ্ভাব! আমি আত্মীয় স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া কত আত্মীয় পাইয়াছি। ইঁহারাই ত প্রকৃত আত্মীয়! এক আধ্যাত্মিক রক্তের পরিবার! জগদীশ্বর দেখাইতেছেন যে তাঁহার সেবার জন্য রতিপ্রমাণ যে আপনাকে ব্যয় করে, তিনি ভরি ভরি তোলা তোলা লোকের প্রেম দিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।"

দুর্গামোহন দাস মহাশয় ও পার্ব্বতীনাথ রায় এই জাহাজে শিবনাথের সহযাত্রী ছিলেন। শিবনাথের বিলাত গমনের ব্যয়ভার দুর্গামোহন দাস মহাশয়ই অধিকাংশ বহন করেন। শিবনাথের বিলাত প্রবাসের বৃত্তান্ত তাঁর ডায়েরিতে অতি সুন্দররূপে বিবৃত আছে। যেদিন জাহাজে উঠেন সেদিন হইতে আসিবার দিন পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই ডায়েরি লিখিয়াছেন—সে সময়ে যে সকল চিন্তা তাঁর হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই চিন্তাগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, শিবনাথের হৃদয়খানা কত বড় ছিল। কি প্রখর তাঁর আত্মদৃষ্টি! ছয়টি মাস কেবল বিলাতে বাস করিয়াছেন। এই ছয়টি মাসের ছাপ তাঁর জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল। শিবনাথের জীবনকাহিনী লিখিতে গিয়া দুইটি বিষয় দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইতেছি। প্রথমতঃ জীবনের সেই উষাকাল হইতে আত্মোন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা—ক্রমাগত দিনের পর দিন সংগ্রাম করিয়াছেন। প্রবৃত্তিকুলকে শাসন করিয়া ভগবানের ইচ্ছার অনুগত হইবার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম! দ্বিতীয়তঃ

চিরদিন চেষ্টা করিয়াছেন, আর আশাপূর্ণ হৃদয়ে নব জীবন, নব প্রাণ, নব আলোক, নব প্রেরণা লাভ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। শিবনাথের প্রকৃতির ভিতর নিরন্তর সংগ্রাম করিবার স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়—নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। দেহের শক্তিতে যে তিনি নিরন্তর শ্রম করিতেন তাহা নহে, মনের প্রচণ্ড আবেগ ও ব্যাকুলতা, তাঁকে দুই দণ্ড সুস্থির হইয়া থাকিতে দিত না। জাহাজে বসিয়াই বা কত কার্য্য করিয়াছেন, বিলাতে গিয়া ত কথাই নাই। ক্রমাগত শ্রম করিয়াছেন, তার উপর সেখানে নিরামিষ আহারের নিতান্ত ক্লেশ ছিল, তিনি ক্রমাগত পীড়িত হইয়াছেন, সর্ব্বদাই জ্বর হইত, অতিশয় কৃশ এবং দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলেন সেই জন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ইংলণ্ডে বাস করিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডে মিস্ কলেট এর সহিত নিত্যই প্রায় সাক্ষাৎ করিতেন। তাঁর সহিত হৃদয়ের এক গভীর যোগ স্থাপিত হয়। প্রফেসার নিউম্যান, ষ্টোফোর্ড ব্রুক, ষ্টেড্ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত তাঁর বিলক্ষণ হৃদ্যতা জন্মে। বিলাতের প্রবাসের কথা তাঁর ডায়েরি ও বিলাতের চিঠি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

৩রা মে ১৮৮৮। বৃহস্পতিবার
ষ্টীমার মজাপুর
Red Sea.

"আজ দুর্গামোহনবাবু একটা কথা বলিয়াছেন। আনন্দমোহনবাবুকে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম: তাহার মধ্যে এক জায়গায় লিখিয়াছি, "I am only sorry that the fire of self-sacrifice has not burnt of all the impurities of my nature." দুর্গামোহনবাবু পড়িয়া বলিলেন, "Why do you take such gloomy views my dear fellow, God never created us for impurities. There are no impurities in you." বেশ কথা! আমিও অনেকবার মন্দিরে উপাসনাদির সময় বলিয়াছি ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁর আনন্দের অংশী হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর সমুদয় প্রাণী আনন্দে বিহার করিবে আর মানব যে তাঁহাকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার পাইয়াছে, সেই মানব কেবল তাঁহার চরণতলে পড়িয়া সর্পমুখগ্রস্ত ভেকের ন্যায় কাঁদিবে ইহা কি তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারে? এরূপ কখন বোধ হয় না। আমাদিগকে আনন্দে তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে হইবে। এই ভাবটা দুই মাস পূর্ব্বে বড় প্রবল ছিল। * * * Hurricane Deck-এ রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত বেড়াইয়া ও জগদীশ্বরের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া অবশেষে ৯টার সময় আসিয়া শয়ন করিলাম।"

বিলাতে পৌঁছিয়া শিবনাথ অন্যান্য নানা কর্ম্মের ভিতর History of the Brahmo Somaj লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি লিখিতে তাঁকে অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিরূপভাবে এই বইখানির জন্য খাটিয়াছেন তাহা দেখিবেন।

"১৭ই সেপ্টেম্বার, ১৮৮৮ সোমবার লণ্ডন। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা ও দৈনিক লিপি লেখার পর বই লইয়া বসিলাম। ক্রমেই দেখিতেছি দুরন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। এত পরিশ্রম হইবে তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই। এখন কি করা যায়? গতকল্য লিখিতে লিখিতে মাথাটা কেমন করিতে লাগিল। মন আর লিখিতে চায় না, ভাব আসে না, কথা যোগায় না, দুখান চিঠি লিখিতে গেলাম, কথা যোগায় না, লেখা কদর্য্য হইল। ভাবিলাম গতিক ভাল নয়, এক স্থানে এত

বন্ধ থাকা ও গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। অমনি কলম ফেলিয়া বাহির হইলাম।"

ইংলণ্ডে যে সকল বড় লোকদিগের সহিত শিবনাথের সাক্ষাৎ হয় তাঁহাদিগের কথা আত্মচরিতে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন—তার আর পুনরুক্তি করিব না। ইংলণ্ড-প্রবাসকালে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তার দুই একখানি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

কন্যা হেমলতাকে লিখিয়াছেন ঃ—

London N.
26th October

"মা লক্ষ্মী,

আগামী ৮ই নবেম্বর রোহিলা ("Rohilla") নামক এক জাহাজ এখান হইতে ছাড়িবে—কলিকাতায় ১২ই ১৩ই ডিসেম্বর পেঁাছিব। পলমল গেজেটের সম্পাদক মিঃ ষ্টেড এর সঙ্গে বড় ভাব হইয়াছে। কাল রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ও ছেলে-পিলের সঙ্গে চোখ বাঁধাবাঁধি খেলিয়াছি। এ এক নূতন খেলা, তোমরা কখন দেখ নাই, দেখিলে আশ্চর্য্য হইবে। মা, আমার বিলাত যাত্রা শেষ হইল। আগামী শনিবারে হ্যাণ্ট নামক এক পরিবারে একটি ছোট-খাট সভাতে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিব। তাহার এক কার্ড পাইয়াছি। তার পর আমার খেলাধুলা শেষ করিয়া অগাধ সিন্ধুনীরে ভাসিব। বিলাতে যাঁহাদের সঙ্গে বড় ভালবাসা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিছু কিছু উপহার দিয়া যাইব ভাবিতেছি। আমি তাহাদিগকে বলিতেছি ভাই, আমার খেলা-ধুলা সাঙ্গ হইল, আমি এখন ঘরে যাইব—মায়ের নিকট যাইব—তোমরা আমাকে বিদায় দাও! আমি ইহাদের সৌজন্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। মিস ক্যাথেরিন ইম্পে ষ্ট্রীট নামক গ্রাম হইতে লিখিয়াছেন, "তুমি আমাদের পরমাত্মীয় বন্ধু, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত যখন ইচ্ছা, আমাদের বাড়ীতে আসিবার তোমার অধিকার। যাইবার পূর্ব্বে একবার যদি একটি দিনের জন্য আসিয়া দেখা দিয়া যাইতে পার আমরা বড়ই সুখী হই।" দেখলে ইংরাজের মেয়ের প্রাণে কত প্রেম! আমি তাহাকে লিখিয়াছি, "প্রিয়, ইংলণ্ডের কূল হইতে উড়িয়া যাইবার জন্য আমার ডানা ইতিমধ্যে কাঁপিতেছে, ঘরের দিকে আমার মন ছুটিয়াছে—আমার হতভাগ্য জন্মভূমির ক্রোড়ে গিয়া লক্ষ লক্ষ অজ্ঞ অনাথ পদদলিত নরনারীর জন্য পরিশ্রম করিয়া মরিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, তোমরা আমাকে বিদায় দেও, সরল প্রাণে আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। প্রিয় ক্যাথেরিন, আমি একটি দিনের জন্যও আর যাইতে পারিব কি না সন্দেহ! * * *

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য"

শিবনাথ ছয় মাসমাত্র বিলাতে ছিলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রেমিক প্রকৃতি প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার বন্ধু খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। কোয়েকার-সম্প্রদায়-ভুক্ত, ষ্ট্রীট নামক স্থানের কুমারী ক্যাথেরিন ইম্পের সহিত তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। হ্যাণ্ট নামক পরিবারের বালক-বালিকাগণ তাঁকে দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইত। ষ্ট্যাড্ সাহেবের পরিবার পরিজনের সঙ্গে অত্যন্ত হৃদ্যতা হইয়াছিল। আর মিস কলেট-এর কথা কি বলিব, ডায়েরিতে প্রতিদিনই তাঁর কথা লিখিয়াছেন। তাঁকে দিদি কলেট বলিতেন। একখানি পত্রে লিখিতেছেন ঃ—

"আর একটা খবর। আমাদের বাড়ীতে একটি বারো বছরের মেয়ে আসিয়া রহিয়াছে। ইহার নাম ডোরাথি মেয়েটি মিস এডিথ্-এর ছাত্রী, মেয়েটি দেখিতে সুন্দর—অতি শান্ত! আমি বড় খুশী আছি। একদিন আহারে বসিয়া মুখে মুখে তার নামে দুই পংক্তি কবিতা বাঁধিলাম, তাহাতে সে খুব সন্তুষ্ট—আমাকে ঐ দুই পংক্তি লিখিয়া দিতে বলিল। তোমাকে আমি একটি ভাল কবিতা লিখিযা দিতেছি—এই বলিযা নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি কাগজে লিখিয়া দিয়াছি, সে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছে, লইয়া গিয়া মাকে দেখাইবে।

Dorothy ! Dorothly ! Dorothy dear !
The weather was bad and time was weary
We wanted some one to keep us cheery,
A bright little maiden gentle mild
Of loving parents darling child.
Came to our home like sun shine sweet
We welcomed warm were glad to meet
This bright little maid has a sweet little name
I leave you all to guess the same.
Ding - dong— ding as the church bells ring
Me think her name all of them sing
Listen you all how ring they clear
Dorothy ! Dorothy ! Doroty dear

একটি বারো বৎসরের বালিকাকে খুশী করিবার জন্য এতই তাঁর আগ্রহ! দেশে ফিরিবার সময় মিস কলেট-এর নিকট শেষ বিদায চক্ষে জলে ভাসিয়া লইয়াছিলেন। ডায়েরিতে দেখিতেছি ঃ—

"৭ই নবেম্বর—বুধবার। আজ সমস্ত দিন চিঠিপত্র লিখিতে ও বিদায় লইতে গেল। অপরাহ্ণে মিস কলেট-এর নিকট বিদায় লইলাম। তিনি কেশববাবুর পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। বিদায় লইবার সময় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া কেমন ভাব হইল। অনেক কষ্টে বিদায় লওয়া গেল।"

শিবনাথের বিলাত-প্রবাস সার্থক হইয়াছে। ছয়টি মাসের স্মৃতি তাঁর জীবনে চিরস্থায়ী হইয়াছিল। বিলাত গমনের পূর্ব্বে এক শিবনাথ, ফিরিযা আসিলেন অন্য ব্যক্তি। ইংরাজ জাতির নিয়ম নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট এবং অনুকরণীয় বলিয়া তাঁর বিশ্বাস জন্মিল। চিরদিনই দুরন্ত শ্রম করা তাঁর অভ্যাস ছিল কিন্তু সমুদয় কার্য্যের ভিতর নিয়মানুবর্ত্তিতা সুব্যবস্থার ভাব পূর্ব্বে ছিল না; কিন্তু শিবনাথ কেবল মুখে সুখ্যাতি করিয়া নিবৃত্ত হইবার পাত্র ছিলেন না --কে না ইংরাজের এ সকল সদ্গুণের প্রশংসা করে? কিন্তু ইংরাজের ন্যায় নিয়মানুবর্ত্তিতা পরিচ্ছন্নতা সুব্যবস্থা কয়জন আর করিতে পারিয়াছে? ইংরাজের ন্যায় অশন বসনের পারিপাট্যে অনেকেই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ইংরাজ যে জন্য বড় জাতি হইতে পারিযাছেন তাহা আয়ত্ত কত লোক করিয়াছেন? শিবনাথ চিরদিন ভাল বলিয়া যাহা মনে করিতেন তাহা সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তবে ছাড়িতেন। কোন প্রকার শৈথিল্য বা ভাবের দুর্ব্বলতা তাঁর কখনও সহ্য হইত না। ভোলানাথ শিবনাথ—হইয়া আসিলেন পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, সুকর্ম্মী! যে কার্য্যের ভার লইতেন যথাসময়ে তাহা করিতেন। ঘড়ির কাঁটার মত জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হইল।

যে কেহ পত্র লিখিত সেই যথা সময়ে প্রত্যুত্তর পাইত—একটি পাঁচ বৎসরের শিশুর পত্রও অনাদৃত হইত না। ঘড়ি না হইলে তাঁর এক মুহূর্ত্তও আর চলিত না। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও ঘড়ি দেখিতে ভুলিতেন না—যখন তখন ঘড়ি খুলিয়া দেখিতেন। পরিজনরা হাসিয়া বলিতেন, "ঘড়ি দেখলে, আর কি কি কাজ বাকি আছে?" তাঁহার দেহ যখন প্রাণশূন্য হইল তখনও বুকের উপর তাঁর প্রিয় ঘড়িটি টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছে।

॥ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর

শিবনাথ বিলাত হইতে নূতন দৃষ্টি, নূতন ভাব, নূতন উদ্দীপনা লইয়া দেশে ফিরিলেন। বিলাত যাইবার সময় পথে মান্দ্রাজ হইতে ১৮৮৮ সালের ৯ই এপ্রেল কন্যা হেমলতাকে লিখিতেছেন—"দয়াময় প্রভু তাঁর দাসকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে এই নির্জ্জন সমুদ্রবক্ষে বলিতেছেন যে আমার ভার সম্পূর্ণ রূপে তাঁর উপরে। তিনি তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের জন্যই আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য আমার এতটা উৎসাহ বাড়িতেছে যে, দশটা মত্তহস্তীর বল পাইলেও যেন কুলায় না। নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইংলণ্ড হইতে আসিয়া অনেক কাজ করিতে পাইব।" আবার ফিরিবার পথে কন্যাকে লিখিতেছেন ঃ—

S. S. Rohilla.
19th November, '88.

"যতই বাড়ীর দিকে যাইতেছি, ততই দেশের দুর্ভিক্ষ, প্রজাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতার কথা মনে হইয়া প্রাণ বিষন্ন হইতেছে। আবার গিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে আসিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি, অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে হয়।" বাস্তবিক বলিতে কি ইংলণ্ডে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য তাঁর উৎসাহ যেন শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। চারিদিকে নূতন নূতন কার্য্যস্রোত খুলিয়া গেল।

১৮৮৯ সালে, Voysey সাহেবের সমাজের Mr. H. C. Blaker নামক একজন ইংরাজ-একেশ্বরবাদীর চেষ্টায় ইংরাজিতে সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা হয়। যাহাতে ইংরাজ ও ইউরোপিয়ানদের ভিতর একেশ্বরবাদ প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই এই প্রকার ইংরাজিতে সাপ্তাহিক উপাসনার ভার শিবনাথের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। বিলাত হইতে আসিয়া ১৮৮৯ সালে প্রচার-যাত্রা করেন। এবার সাতনা, হোসেঙ্গাবাদ, হরিদ্বার প্রভৃতি ঘুরিয়া আসেন। এই যাত্রায় বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বিশেষ সুখী হন। নবীনচন্দ্র রায় শিবনাথের বহুদিনের বন্ধু। সেই "সমদর্শী" প্রচারের সময় হইতে তাঁর সঙ্গে আন্তরিক হৃদ্যতা স্থাপিত হয়। নবীনচন্দ্রের উপর তাঁর হৃদয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৮০ সালে তিনি কলিকাতা আসিয়া শিবনাথের বাসায় পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং কলিকাতায় তাঁর নবনির্ম্মিত বাড়ীতে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানে ২৮শে আগষ্ট ১৮৮০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সহোদর ভাইয়ে ভাইয়ে যত না হৃদ্যতা থাকে, নবীনচন্দ্রের সহিত শিবনাথের আহাই ছিল। এই উভয় বন্ধুর পরিবার পরিজনের ভিতর আন্তরিক টান ছিল। তিনি মৃত্যুর সময় তাঁর সমুদয় বিষয় সম্পত্তি, নাবালক পুত্র কন্যার ভার শিবনাথের উপর দিয়া শান্তিতে দেহত্যাগ করিয়া যান। তিনি মৃত্যুর সময় পত্নীকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"হামেসা মহবৎসে মিলকর ইঁহা রহনা।" অর্থাৎ—"চিরদিন প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহাদের নিকট থাকিও।" শিবনাথ এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

শিবনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া—বন্ধু নবীনচন্দ্রের নাম করিতে কখন ভোলেন নাই। তাঁর গুরুকীর্ত্তনের ভিতর নবীনচন্দ্রের নাম আছে। নবীনচন্দ্রের পুত্র কন্যাকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসিতেন। নবীনবাবুও শিবনাথের পরিবার পরিজনকে বিশেষতঃ—হেমলতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম হেমন্তকুমারী, তিনি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিতা এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিনী। শিবনাথ হেমন্তকুমারীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তেমনি নবীনচন্দও হেমলতাকে ভালবাসিতেন। হেমলতা ও হেমন্তকুমারী বেথুন স্কুলে একত্র পড়িতেন। তাঁদের ভিতর শৈশবের অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। দুইজনেই পিতৃভক্ত, দুইজনেই সর্ব্বদা আপন আপন পিতার গল্প লইয়া থাকিতেন। নবীনচন্দ্র ছিলেন অতি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, তাঁর ভালবাসা আদর মুখের কথায় কখন প্রকাশ পাইত না। তাঁকে দেখিবামাত্র লোকের মনে সম্ভ্রমের উদয় হইত। শিবনাথ ছিলেন সরল প্রেমিক অমায়িক, তাঁর আদর করা স্বভাব ছিল। মেয়েদের বড় আদর করিতেন। হেমন্তকে শিবনাথ যত আদর করিতেন নবীনচন্দ্র তত আদর মুখে করিতেন না। অথচ হেমন্তকুমারী "বাবা" বলিতে আত্মহারা হইতেন। দিনরাতই তাঁর মুখে "আমার বাবা"। একদিন আমি বলিলাম, "তুমি এত বাবা বাবা কর কেন? আমার বাবার মত তোমার বাবা ত কই তোমাকে তেমন আদর করেন না?" হেমন্ত চটিয়া বলিলেন, "যাও আমার বাবার গুণ তুমি কি বুঝবে, আমার বাবার মত বাবা পৃথিবীতে নাই।" তারপর নবীনবাবু যখন শিবনাথের গৃহে আসিয়া কিছুদিন রহিলেন তখন হেমলতাও নবীনচন্দ্র রায়ের একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি নবীনচন্দ্র রায় আমার নিকট আদর্শ পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। একদিনকার একটি ঘটনা আমার মনে আছে—নবীনচন্দ্র রায় আর শিবনাথ এক টেবিলের দুধারে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। শিবনাথ একমনে লিখিয়া চলিয়াছেন—দেখি নবীনচন্দ্র রায় অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া কি বলি বলি করিতেছেন—অথচ বলিতেছেন না। আমি দেখিয়া বাবাকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাবা তোমাকে উনি বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন।" শিবনাথ তখনই ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় কিছু বলবেন নাকি?" নবনীচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনার কাজের ক্ষতি হবে বলে বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলাম, এই একটি সামান্য কথা।"—শিবনাথ অবাক! "এই একটি কথা বলবার জন্য আপনি এতক্ষণ অপেক্ষা করছেন?" আমরা তাঁর বিনয় সৌজন্য সদ্ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। বাস্তবিক বলিতে কি এমন আশ্চর্য্য চরিত্র আমি এ জীবনে আর দেখি নাই। একদিন শিবনাথ নবীনবাবুকে বলিলেন, "আপনার হেমন্তটা কি মেয়ে! এমন মেয়ে হয় না"। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমার হেম, হেমন্ত দুই-ই সমান, আমার হেমন্তর গুণের "অন্ত" আছে—আপনার হেমের গুণের "অন্ত" নাই।"—শিবনাথ বলিলেন "আপনার নাকি কবিত্ব নেই মশাই!"—এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসি। হায়! হায়! তেমন সুখের দিন

আর হবে না। এই স্থানে শিবনাথ নবীনচন্দ্রের কন্যা হেমন্তকুমারীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা না উদ্ধৃত করিয়া পারিলাম না।

কলিকাতা, ১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
৩০এ, মার্চ্চ, ১৮৮৩

"আমার স্নেহের হেমন্ত,

আমার মা লক্ষ্মি! আমার পত্র পাইলে তোমার বড় সুখ হয়। আমি এমনি পাষণ্ড যে সে সুখটা তোমাকে সদা সর্ব্বদা দিতে পারি না। তোমার পত্র পেলে যে আমার সুখ হয় তাকি বলতে হবে? গ্রীষ্মের মধ্যে মানুষ যদি এক পসলা জল পায় তার যেমন আনন্দ হয়, তোমার পত্র পেলে আমার তেমনি আনন্দ হয়। আমার প্রাণটা কত ঠাণ্ডা হয়! আমার প্রাণটা বড় কঠিন, সেই প্রাণটাকে এমন করে বড় কেউ বাঁধতে পারে না। তুমি বড় দুষ্টু মেয়ে, তাই আমাকে বেঁধেছ, কে বলে এ মেয়েটা নবীনবাবুর, এটা আমার!"

হেমন্তকুমারীর প্রথম কন্যাটির মৃত্যুসংবাদ শুনে তাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। এই পত্রখানি পড়িলে সকল শোকসন্তপ্ত জনক জননীর প্রাণ শান্ত হয়। তাই পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৬
কলিকাতা

"মা হেমন্ত,

তোমার পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। তুমি পত্রে আমাদিগকে যে দুঃখের সংবাদ দিয়াছ তাহাতে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তোমার পত্র পাইয়া আমার প্রাণ এমনি হইতেছে যে, এখন আমি যদি তোমার কাছে থাকিতাম, তাহলে তুমি বুঝি একটু শান্তি লাভ করিতে পারিতে। এই শোকের সময় আমি আর তোমাকে কি কথা বলিব? তবে এই কথা বলি, জীবন মৃত্যু উভয়ই আমাদিগের নিকট গভীর প্রহেলিকার ন্যায়। এই জীবন আমাদের ইচ্ছাতে আসে নাই, ইহার স্থিতি আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহার অন্তও আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, ইহা আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাই আমরা পাইয়াছি এবং ইহার সুখ সম্পদ উপভোগ করিতে পারিতেছি। এখন আর একটি কথা বিবেচনা কর, যে-বস্তু দান মাত্র, অর্থাৎ—যাহা আমাদের ইচ্ছাতে পাই নাই, কিন্তু অপরের দয়াতে পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের কোন দাওয়া থাকিতে পারে কি না * * * যেটি আছে সে জন্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তেমনি বলি মা! আমার আদরের মা, তুমি কাঁদিও না * * * শিশুগণ মায়ের হাতে প্রহার খাইয়া অশ্রুজলের ভিতর হইতে যেমন 'মা' 'মা' করিয়া মাকেই ডাকে, আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ডাকিব। এ কেমন মিষ্ট। তুমি আজ সেইরূপ করিয়া সেই জগন্মাতাকে ডাক। আমার এরূপ বোধ হইতেছে যে, যেন তুমি আমার গলা জড়াইয়া বুকে মাথা দিয়া কাঁদিতেছ এবং আমি তোমার চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিতেছি, "লক্ষ্মী মা কেঁদ না"—তাই বলি লক্ষ্মী মা কেঁদ না।

তোমার অপদার্থ God father
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী"

কেবল কি নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরিবারের সহিত এমন হৃদ্যতা ছিল। ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয় অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু সন্তানদিগকে রাখিয়া যখন পরলোকগমন

করেন, তাঁর সন্তানদিগের জন্যও শিবনাথ এইরূপ ব্যাকুল হইতেন। লোকনাথবাবুকে আমরা জ্যেঠামহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। জানি না লোকে আপনার জ্যেঠামহাশয়কে এত আপনার ভাবে কিনা? লোকনাথবাবুর সন্তানগণ শিবনাথকে "কাকাবাবু" বলিয়া ডাকিত—শিবনাথ তাদের "কাকা"র চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিলেন না। এই যে পরকে আপনার করা ইহার ভিতর কিছুমাত্র লৌকিকতা বা দূরত্ব ছিল না।

১৮৮৯ সালের এপ্রিল মাসে শিলং ব্রাহ্মসমাজের সেলা হইতে কয়েকটি খাসিয়া ভদ্রলোক ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, শিলং ব্রাহ্মসমাজে সেই চিঠিখানি কার্য্যনির্বাহক সভায় প্রেরণ করিলে—শিলং-এ ব্রহ্মপ্রচারক প্রেরণের বিশেষ আবশ্যকতা সকলে অনুভব করেন—সেই সময় হইতে শ্রীযুক্ত নীলমণি চকবর্ত্তী মহাশয় এই কাজের ভার গ্রহণ করেন। নীলমণিবাবু এই কার্য্যে জীবন দিয়াছেন।

১৮৯০ সালের ১৬ই মে ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবিষয়ে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের অপরিসীম উৎসাহ ছিল। শিবনাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শয়নে স্বপনে বিদ্যালয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়াছিলেন। সে একাগ্রতা, ব্যাকুলতা, ও উৎসাহের কথা এখনও আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। বিদ্যালয়ের সরঞ্জামের কথা যখন উপস্থিত হয়—আনন্দমোহন বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'স্ত্রীশিক্ষার জন্য আমরা শিক্ষালয় স্থাপন করিব, বিদ্যালয় নাম রাখিব না—আমরা প্রকৃত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, পুঁথিগত বিদ্যা নয়, সুতরাং চেয়ার টেবিলের আবশ্যকতা কি? আমাদের বালিকারা মাদুর পাতিয়া পড়িবে, তাহাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।" শিবনাথের ইচ্ছা ছিল না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে এখানকার শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই অথচ যাহা শিক্ষা করা মেয়েদের একান্ত প্রয়োজনীয়—সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে হয়, এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ও শিবনাথের তখনকার উৎসাহপূর্ণ মুখশ্রী আমার এখনও মনে আছে। ১৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাহিরবাড়ীর একতলায় মাদুর পাতিয়া ১৫টি বালক বালিকা লইয়া, বিদ্যালয় বসিয়া গেল। শিবনাথ ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তায় আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন! সে চিন্তা ও সে পরিশ্রম বৃথা যায় নাই। আজ ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের কি অবস্থা! হৃদয়-শোণিতপাত না করিলে, কোন মহৎ কার্য্য এ সংসারে দাঁড়ায় না। আমরা সচরাচর বড় বড় কার্য্যের সূচনা দেখি, অমুক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, কার্য্য সম্পন্ন করিতে, যত বড় কমিটি,—যত খ্যাতনামা ব্যক্তিই সেই সভার সভ্য হউন না—কার্য্য করে দুই তিনজন ব্যক্তি! অন্ততঃ দুই তিনজনের হৃদয়শোণিত ক্ষরিত না হইলে কোন বড় কাজ দাঁড়ায় না। গাছের গোড়ায় যেমন জল দিতে হয়, মহৎ কার্য্যের সূচনায় তেমনি শোণিতপাত করিতে হয়, তবে সেই কাজ দাঁড়ায়। শিবনাথ যখন যে কার্য্য করিতেন, পাগলের ন্যায় করিতেন, তাহাতে আপনার কষ্ট অসুবিধার কথা মুহূর্ত্ত-মাত্র হৃদয়ে স্থান দিতেন না। আর এক বিশেষত্ব দেখিয়াছি, যখন যে কার্য্য করিতেন, সমগ্র প্রাণ এমনি ঢালিয়া দিয়া করিতেন, যে সেই সময়ের মত, আর কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিতেন না। সেই কার্য্যে সিদ্ধকাম হইয়া তবে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় এই একাগ্রতা, সিটি কলেজ স্থাপনের সময় এই ভাব—আর চক্ষে দেখিয়াছি, ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার সময় কি তন্ময়তা কি একাগ্রতা! কি উৎসাহ! সেই সময় অন্যমনস্কতার জন্য কত যে ভুল করিতেন! একদিন ধোপার বাড়ী হইতে মশারি কাচিয়া আসিয়াছে, মশারিখানি আলনা হইতে লইয়া, চাদরের মত কাঁধে ফেলিয়া চলিয়াছেন! একদিন ব্রাহ্ম-বালিকা

শিক্ষালয়ের চিন্তায় মন এমনই পূর্ণ যে, সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়া আহারে বসিয়া ডালের বদলে জল দিয়া ভাত মাখিয়া বেশ খাইয়া যাইতেছেন, আমরা যখন সকলে হাসিয়া উঠিয়াছি, "ও বাবা, কর কি ?" তখন চৈতন্য হইয়াছে—আর সেই অট্টহাস্যের রোল ? অন্যমনস্কতার জন্য এ জীবনে কত যে দুর্ঘটনা হইয়াছে তার অন্ত নাই—কতবার ট্রাম হইতে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়াছেন। কতবার পড়িয়া হাত পা কাটিয়াছেন, কতবার মাথা ঠুকিয়া মাথা কাটিয়াছেন। আমরা শশব্যস্ত থাকিতাম; আর কতবার বলিয়াছি, "আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মানব যদি তুমি গাড়ী চাপা পড়িয়া মারা না যাও।"

ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয় ত প্রতিষ্ঠিত হইল। তাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত দেখিয়া ১৮৯০ সালের শেষ ভাগে শিবনাথ প্রচার-যাত্রা করিলেন। নানা কারণে এ যাত্রাও চিরস্মরণীয়। এই সময় তিনি ডায়েরিতে প্রতিদিনের কার্য্য ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! এবার প্রচার-যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল, মন বলিতে লাগিল এবারে বাবার কোন বিপদ হইবে। আমি ডায়েরিতে লিখিয়াছিলাম যে, "বাবা প্রচার-যাত্রা করিলেন, কি জানি কেন আমার মনে হইতেছে, বাবার কোন বিপদ হবে।" কি বিপদ বুঝি নাই—কিন্তু প্রাণে যেন কি আতঙ্কের ছায়া পড়িল। একথা ডায়েরিতে লিখিয়াছিলাম, মনেও ছিল, এবং পরে যাহা ঘটিল, তার সঙ্গে আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া গেল! এ জীবনে, আরও কখন কখন এমনি করিয়া পরবর্ত্তী ঘটনার ছায়া হৃদয়ে পড়িয়াছে, এবং অন্যের জীবনেও হয় সেজন্য এখানে সে কথার উল্লেখ করিলাম।

১৮৯০ সালে মান্দ্রাজে এই চতুর্থবার প্রচার-যাত্রা। এই সময় কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন, আহারে, বিহারে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। শিবনাথের পক্ষে ইহা কিছু আর নূতন নয়, তবে দেহের শক্তি বয়সের সঙ্গে হ্রাস হইয়া আসে, সুতরাং শরীরের উপর অত্যাচার তখন আর অবাধে সহ্য হয় না। এবারে গুরুতর শ্রমের ফলে কঠিন পীড়া হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সে ঘটনা বলিবার পূর্ব্বে তাঁর ডায়েরি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

13th October 1890

Read 5 chapters of Luke finishing that book in fulfilment of a vow of making special study of Jesus and Paul during three months of October, November and December as preparing of a new life from my next birth-day.

এই সময় কেবল মান্দ্রাজ নয় কালিকট, কোইম্বাটুর, ত্রিচিনাপল্লী, বাঙ্গালোর, বেজওয়াড়া, মসলিপটন প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। এবারকার প্রচার-যাত্রার বিষয় ডায়েরীতে এরূপ লিখিতেছেন ঃ—

27th January 1891

"বেজওয়াডা হইতে আমি মসলিপটম যাই। সেখানে একদিন একটি sermon আর একদিন একটি বক্তৃতা হয়, সেখান হইতে ফিরিয়া বেজওয়াডা হইয়া রাজমাহেন্দ্রী গমন করি। সেখানে ১৫ই নবেম্বর শনিবার পেঁৗছি, এবং সেই দিনই একটি বক্তৃতা করি। ১৬ই নবেম্বর আর একটি বক্তৃতা করি। ১৭ই নবেম্বর সোমবার সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ১৮ই নবেম্বর মঙ্গলবার কোকোনদা পেঁৗছি। সেইদিনই সেখানে একটি বক্তৃতা করি। সেইদিনই শরীর অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। পরদিন একটি বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা ছিল, শরীরের অসুস্থতাবশতঃ তাহা হইল না। তৎপরে

দিন অর্থাৎ—২০এ নবেম্বর আবার বেজওয়াডা যাত্রা করিবার দিন। সেদিন প্রাতে আমার বাসাতে উপাসনা হয ও আমি একটি উপদেশ দি। তৎপরেই আমার জ্বর হয়। এই জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া ভয়ের কারণ হইয়াছিল। মিঃ রাজেন্দ্রলাল মৈত্র মৃত গুরুদাস মৈত্রের পুত্র আমাকে তাঁর বাড়ীতে লইয়া গিযা রাখেন। এখান হইতে বিবাজ, হেম, শশীভূষণ বসু, ডাক্তার বিপিনচন্দ্র সরকার আমার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য যান। তাঁরা ২৯এ নবেম্বর সেখানে উপস্থিত হন। প্রায মাসাবধি আমার জ্বর থাকে। ২০এ ডিসেম্বর আমার জ্বর ত্যাগ হয়। ২৬এ ডিসেম্বর সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ৩০এ ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হই। আমি মান্দ্রাজে যাইবার পথে এই ব্রত লইযাছিলাম যে, আগামী জন্মদিন, অর্থাৎ—৩১এ জানুয়ারির পূর্ব্বে বাইবেল হইতে যীশু এবং পল-এর উক্তিসকল পুনরায় পাঠ করিয়া এই উভয় চরিত্র তিনমাস কালের মধ্যে বিশেষরূপে অনুধ্যান করিব তদনুসারে মান্দ্রাজ বাসেব সময় রীতিমত four Gospels 3 Epistles of Paul পড়িতাম। কোকোনাদায় পীড়িত হওয়াতে ভয় হইয়াছিল যে বুঝি আমার ব্রত আর রক্ষা করিতে পারা গেল না। ঈশ্বরের কৃপায় একটু সুস্থ হইয়া আবাব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। ছয় সাত দিন Zoological garden-এ ছিলাম, তাহাতে অনেক চিন্তা করিয়াছি ও অনেকগুলি Epistles পডিয়া ফেলিয়াছি। এখন কেবলমাত্র Epistles to the Hebrues and Acts 3, St. Paul-এর জীবন যাহা আছে, তাহা পড়িতে বাকী আছে তাহাও এই কয়াদনে পড়িযা ফেলিব তাহা হইলেই আমার ব্রত সাঙ্গ হয়। অদ্য মঙ্গলবার, বুধ ও বৃহস্পতি এই দুই দিনে পড়িব, ও আরও চিন্তা করিব, শুক্রবার এই উভয় চরিত্র অনুধ্যান করিয়া, যাহা প্রতীতি হইল তাহা লিখিব —শনিবার জন্মদিন। সে দিনে আগামী বর্ষের কার্যপ্রণালী স্থির করিয়া ফেলিব।

কোকোনাদায় যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পিতৃদেব আত্মচরিতে বিবৃত করিয়াছেন। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা কোকোনাদায গিয়া তাঁর যে অবস্থা দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। আমাদের পাইযা তাঁর কত আশা, কত আনন্দ! আমাকে ভগ্নকণ্ঠে তিনি নিজে কঠিন জ্বরে যখন অচৈতন্য থাকিতেন, তখন অমরদিগের স্তবগান কেমন উজ্জ্বল ভাবে শুনিতেন তাহা বলিয়াছিলেন। আমাদের শুনিয়া মনে হইয়াছিল, বোধ হয় পরলোকে একবার পা দিয়া তিনি ফিরিয়া আসিযাছেন তাই স্বকর্ণে অমরদিগের গানও শুনিয়া আসিয়া থাকিবেন। যে প্রকার কঠিন টাইফয়েড হইয়াছিল, পরলোক হইতে ফিরিয়া আসা বই আর কি? এই কঠিন পীড়া হইতে উঠিয়া শিবনাথের স্বভাবতঃ দুর্ব্বল শরীর আরও দুর্ব্বল হইল। তিনি বলিতেন, বেশ বুঝিতে পারি, মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছে, আর পূর্ব্বের ন্যায় মানসিক শ্রম অবলীলাক্রমে করিতে পারি না। কিন্তু এখানেই তাঁর জীবনে প্রবল কর্ম্মময় যুগের অবসান হয় নাই।

॥ ঊনবিংশ অধ্যায় ॥

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা

সেবার আকাঙ্ক্ষাই শিবনাথের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি কবে 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন ঃ—

আমি বড় দুঃখী, তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী ক'রে সুখী হ'তে চাই,
নিজে ত কাঁদিব ; কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি; এই ভিক্ষা চাই
সত্য! ধন, মান, চাহে না এ প্রাণ
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই
খাটিতে বাঁচব. খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা পূর্ণ কর তাই।

তখন হইতে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, সেই প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত করিতেছিলেন। খাটিবার জন্য বাঁচিয়াছিলেন, খাটিতে খাটিতে মরিবেন এই তাঁর আশা ছিল। দীর্ঘ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন এ কবিতা কেবল কবিত্ব নয়, প্রাণের গভীর প্রার্থনা ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। খাটিবার জন্য তিনি নিয়ত ব্যস্ত ছিলেন। সেবার আকাঙ্ক্ষায় শিবনাথ নিত্য নূতন নূতন কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই যার জন্য শিবনাথ অশেষ প্রকার পরিশ্রম না করিয়াছেন। নানাবিধ কার্য্যের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতে, এক প্রকার অশান্তি উপস্থিত হইল। এত আয়োজন, এত প্রতিষ্ঠান সকলই বিফল বলিযা বোধ হইতে লাগিল।

এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু করিয়াছেন, সকলই পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে তিনি ডায়েরিতে একদিন এমন কয়টি কথা লিখিয়াছিলেন, যে-ভাব হইতে পরে সাধনাশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া আমি মনে করি।

"S. S. Rohilla. 10th December, 1888

ব্রাহ্মসমাজের একদল সেবক প্রস্তুত করা যায় কি না, যাহারা communism অনুসারে থাকিবেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দিবেন, ও শ্রমের দ্বারা অর্জ্জিত হইবে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের ভরণপোষণ হইবে। একান্ত প্রার্থনার সহিত তাঁহার চরণে হত্যা দিতে হইবে।"

"১৩ই ফেব্রুয়ারি, বুধবার ১৮৮৯

রাত্রে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে যাওয়া গেল। উপাসকমণ্ডলীর আগামী বর্ষের কার্য্যের বিষয় কথা হইল। উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ আমাকে স্থায়ী আচার্য্য মনোনীত করিয়াছিলেন, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনেকে তাহা উচিত বিবেচনা করিলেন না। কলিকাতায় আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি না হইলে. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের অনুরাগ ও আস্থা জন্মিতেছে না, এবং উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি না হইলে সে উন্নতি হইতেছে না। আমি যে কলিকাতাতে স্থিরভাবে বসিয়া কাজ করিব তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে. ও তাহার বাহিরে এরূপ অনেক লোক রহিয়াছেন, যাঁহাদের মনে এই আশঙ্কাটি যে, একা আমার হাতে অনেক শক্তি সঞ্চিত হইতেছে সেটা ভাল নয়। দ্বিতীয়তঃ অনেকের এরূপ ভাব যে. আমাকে একেবারে কলিকাতায় ধরিয়া রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হইবে। যাহা হউক এই বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এবং সমাজের হিতার্থে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে।"

এই কয় লাইনের ভিতর সুস্পষ্ট তিনটি ভাব দেখা যাইতেছে।

(১) উপাসকমণ্ডলী তাঁহাকে স্থায়ী আচার্য্য মনোনীত করাতে কার্যনির্ব্বাহক সভা তাহা হইতে দিলেন না।

(২) কলিকাতার সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত না হইলে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি লোকের অনুরাগ ও আস্থা জন্মিবে না।

(৩) বিরোধী শক্তি সমাজে আছে, তার সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য তিনি প্রস্তুত।

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার ভিতর এই সকল ভাব কি করিয়া কার্য্য করিয়াছে তাহা আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব। সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিবনাথের কথাই দিতেছি ঃ—

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকাল হইতে অন্তরে গুরুতর অতৃপ্তি উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপে মন আর তৃপ্ত হয় না, সকল কার্য্যের মধ্যে কি এক প্রকার অসাবতা অনুভব কবিতে লাগিলাম। এই অতৃপ্তি দিন দিন এতই বৃদ্ধি পাইল যে শরীর মন দুই-ই অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। ' * * ক্রমে মনের অতৃপ্তিটা এত বাড়িয়া উঠিল যে অবশেষে কলিকাতায় কার্য্য কোলাহলের মধ্যে থাকাটাও যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। এই প্রকার মানসিক অবস্থাতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে বালীগঞ্জে পদ্মপুকুর রোড ৪২নং বাটীতে সপরিবারে উঠিয়া গেলাম। বালী-গঞ্জে গিয়া অনেক দিন নিৰ্জ্জন উদ্যানে, নির্জ্জন গৃহে, আত্মার অবস্থা ও সমাজের অবস্থার বিষয় চিন্তা ও প্রার্থনা করিতাম। যতই চিন্তা ও প্রার্থনা করিতাম ততই মনে অতৃপ্তি বাড়িত।"

'ক্রমে মাঘোৎসব আসিয়া উপস্থিত হইল। অতৃপ্তি এত অধিক যে মনে মনে এই সংকল্প উদিত হইতে লাগিল যে, কিছুদিন সকল কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, নির্জ্জনে পাঠ, চিন্তা, ভজন, সাধনাদির দ্বারা আবার প্রস্তুত হইব। মাঘোৎসব যত সন্নিকট হইতে লাগিল ততই মনে এই ভাব জাগিতে লাগিল যে, একদল বিশ্বাসী ও প্রেমিক সাধক চাই যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিবেন ও ঘনিষ্ঠ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সমাজের মধ্যে নূতন জীবন আনিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু এই দলের গঠন ও কার্য্য-প্রণালী বিষয়ে চিন্তা তখনও মনে উদয় হয় নাই। কেবল প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিলাম। এবং এইরূপ একটি দল গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে, এই বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইতে লাগিল। এই ভাব লইয়া দ্বিষষ্টিতম মাঘোৎসবের প্রাতঃকালের উপদেশ দেওয়া গেল। উপদেশের বিষয় ছিল "ঈশ্বর বিশ্বাসী প্রেমিক জনকে আপনার জন্য রাখিয়াছেন।"

"উক্তদিবস অপরাহ্নে মন্দির মধ্যে যখন বসিয়া আছি তখন হস্তলিখিত কয়েক-পংক্তি আমার হস্তে অর্পিত হইল, তাহাতে-প্রস্তাব করিয়াছেন যে, "উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনুরাগী ব্যক্তিদিগকে আহবান করিয়া একটি বিশ্বাসী দল গঠন করা হউক।" আমি তাহাতে এইমাত্র লিখিয়া দিলাম যে, "এইরূপ সংকল্প আমার অন্তরে উদয় হইয়াছে, কিন্তু অদ্য প্রকাশ্যভাবে সকলকে আহবান করিব কি না তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।" সমস্ত অপরাহ্ণ এই চিন্তাতে যাপন করিলাম, অবশেষে প্রকাশ্যভাবে সকলকে আহবান না করা স্থির করিলাম। সংকল্প করিলাম ১লা ফেব্রুয়ারি এই বিশ্বাসী দল গঠনের সূত্রপাত করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার সঙ্কল্পের সংগে সংগেই এই চিন্তার আবির্ভাব হইল যে, এ দল গঠনের ব্যয় কিরূপে চালাবে, অমনি দৃষ্টি ঈশ্বরের করুণার দিকে উত্থিত হইল। এই ইতিবৃত্তের প্রারম্ভে ভগবৎগীতা ও

দায়ুদের গীতাবলী হইতে যে দুই বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা বারবার মনে উদিত হইতে লাগিল। বচন দুইটি—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্"—গীতা এবং "The Lord is my shepherd I shall not want" এইরূপ চিন্তা যখন চলিতেছে, তখন ইংলণ্ড হইতে প্রফেসার নিউম্যান প্রায় ত্রিশ টাকা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। লিখিলেন আমি যে কোন কার্য্যে এই অর্থব্যয় করিতে পারিব। ভাবিলাম উহা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরিত। উহা এই বিশ্বাসী দল গঠনে ব্যয় করিব বলিয়া সংকল্প করিলাম। ক্রমে ১লা ফেব্রুয়ারি উপস্থিত। উক্ত দিবস প্রাতে কতিপয় ব্রাহ্ম-বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপাসনাপূর্ব্বক ৪৫নং বেনিয়াটোলা লেন ভবনে, ব্রাহ্ম পরিচারক দলের সূত্রপাত করা গেল। * * * প্রফেসার নিউম্যানের প্রেরিত অর্থদ্বারা একটি পুস্তকের আলমারা, দুইখানি চেয়ার ও একটি ডেস্ক খরিদ করা গেল। আরও কিছু অর্থ হস্তে রহিল।"

এই প্রকারে ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য শিবনাথ একদল বিশ্বাসী ভক্ত সেবককে ডাকিলেন। যাঁরা তাঁর এই কার্য্যে যোগ দিলেন, তাঁদের প্রতি শিবনাথ নিজের পুত্র কন্যা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন। পিতা যেমন পুত্র কন্যার ভার বহন করেন—তিনিও তেমনি পিতার ন্যায় তাঁদের সকল ভার আনন্দিত চিত্তে বহন করিতেন। প্রথমে গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সাধনাশ্রমের পরিচারক ব্রত গ্রহণ করিলেন। সেই সময় তিনি ময়মনসিংহ ইন্সটিটিউসনে শিক্ষকতা করিতেন। তৎপরে কাশীচন্দ্র ঘোষাল আসিয়া যোগ দিলেন। ক্রমে সতীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি আসিয়া যোগ দিলেন। এইরূপে সাধনা-শ্রম প্রতিষ্ঠায় শিবনাথ স্বাধীনভাবে নিজের সম্পূর্ণ দায়িত্বে এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত ইহার কোন যোগ ছিল না। সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় পরিচারকদিগের ভরণপোষণের জন্য স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, ঋণ কদাচ করা হইবে না এই নিয়ম করিয়াছিলেন। জর্জ্জ মুলার যে ভাবে ইংলণ্ডে আশ্রম বাটীকা স্থাপন করিয়া স্বেচ্ছা দত্ত দানের দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার চালাইতেছিলেন, শিবনাথ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন—সেই ভাব তাঁর হৃদয়ে ছিল। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে কোন অভাব থাকিবে না, এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যে আলস্য-বিহীন হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিবে সে কি কখন ভগবানের রাজ্যে অভুক্ত থাকিতে পারে? এই তাঁর হৃদয়ের বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, কি দায়িত্ব, কি ব্যয়ভার মস্তক পাতিয়া লইলেন—কত শত শত টাকা ব্যয় হইতে লাগিল—শিবনাথের ভয় নাই তিনি অকুতোভয়ে, নূতন ভাবে, নূতন উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

স্বতঃই একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, কর্ম্মের আবর্ত্তের ভিতর ডুবিয়াও কি জন্য তাঁর মনে অকস্মাৎ দারুণ অতৃপ্তি উপস্থিত হইল? তিনি যখন "সাধনাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ১৪ বৎসর ধরিয়া তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধীন থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন। অন্যান্য সমুদয় প্রচারকের প্রায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, শিবনাথের অল্প বিস্তর যে হয় নাই, তাহা নহে। কতবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ড হইতে যে যৎসামান্য অর্থ সাহায্য

গ্রহণ করিতেন, তাহাও ফেলিয়া দিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যদিগের সহিত অনেক ঘর্ষণের দৃষ্টান্ত তাঁর ডায়েরির ভিতর দেখিতে পাই।

প্রথমতঃ—ব্রাহ্মমিশন প্রেস লইয়া সংঘর্ষ। শিবনাথ বলিলেন, সমাজের একটি নিজের প্রেস না হইলে চলিবে না। পূর্ব্বে একটা প্রেস করিয়া সুফল হয় নাই, অতএব কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কিছুতেই সে প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। শিবনাথ নিজের দায়িত্বে প্রেস করিলেন—নিজে গিয়া যন্ত্র, টাইপ প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন। নিজে প্রেস দেখিতে লাগিলেন। সেই প্রেসে ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় কাজ হইতে লাগিল—অথচ সমাজ প্রেসের দায়িত্ব লইতে রাজি নহেন। শিবনাথ যত বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে প্রেস লইতে ক্ষতি নাই--আমার সময় শক্তি বৃথা এই প্রেসের জন্য নষ্ট হইতেছে—তখন কোন কোন সভ্য উত্তর দিলেন, "এত বাক্‌বিতণ্ডা অনুনয় বিনয় কেন ? প্রেস আপনার নিজের সম্পত্তি করে রাখুন না।" শিবনাথ ঘৃণাভরে উত্তর দিলেন, "মশাই! সম্পত্তি করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই।" অবশেষে অনেক চেষ্টার পর সমাজ প্রেসের দায়িত্ব লইলেন! এখন জিজ্ঞাসা করি প্রেসটি কি সমাজের একটি লোকসানের পথ ? এই প্রকারে অনেক কার্য্যে বাধা পাইয়াছেন, তবু অশেষ সহিষ্ণুতার সহিত দশজনের মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন। কখন সরিয়া পড়েন নাই। কিন্তু নিয়মতন্ত্রপ্রণালীমতে সকলের ব্যক্তিত্বের সম্মান রাখিয়াও তিনি কাজ করিয়া বুঝিতে পারিলেন এই যন্ত্রটি আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। যন্ত্রটির কিঞ্চিৎ সংস্কার আবশ্যক। তিনি সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এখন সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূল ভাবটি শিবনাথের নিজের কথায় বলি। সাধনাশ্রম স্থাপিত হইলেই শিবনাথের আজন্মের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ, যথা—আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুচরণ মহলানবিশ প্রভৃতিও তাঁর প্রকৃতভাব বুঝিতে না পারিয়া, এই মহৎ কার্য্যে সহানুভূতি করা দূরে থাক, দারুণ সন্দেহের চক্ষে তাঁর কার্য্য-কলাপ দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন, যথা—"শাস্ত্রী গুরু হইতে চান, আত্মকর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে চান" ইত্যাদি। বন্ধুদিগের তীব্র কটাক্ষে শিবনাথ অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইলেন বটে, কিন্তু পশ্চাৎ-পদ হইবার লোক তিনি ছিলেন না। ১৮৯২ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সমুদয় ব্রাহ্ম-বন্ধুগণকে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে ডাকিয়া সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার প্রকৃত ভাব অতি সরল, অকপট ভাষায় তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তার মধ্যে আসল কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত করি—"আমি বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ প্রবৃত্তির উৎকর্ষের দ্বারাই আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষের বিচার করি। আমার সংস্কার, বিগত ১৪ বৎসর আমাদের বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশ প্রবৃত্তির বৃদ্ধি দেখা যায় নাই। সমাজের ধর্ম্ম-জীবনকে গাঢ় ও ঘনীভূত করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই। প্রথম এই ১৪ বৎসরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং এতৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ কলি-কাতা শহরে প্রায় আট দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়াছেন। কিন্তু প্রচারক সংখ্যা আট জন ছিল, ক্রমে চার জনে দাঁড়াইয়াছে। যে চার জন আছেন তাঁরাও এক হৃদয় এক প্রাণ হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।"

"দ্বিতীয়তঃ—এই ১৪ বৎসরের মধ্যে আমাদের হাত দিয়া ও আমাদের চক্ষের উপর দিয়া কত যুবা পুরুষ চলিয়া গেল যাহাদিগকে এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, তারা বিষয় সুখের দিকে না চাহিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে দেহ মন অর্পণ করিবে, কিন্তু একে একে সকলেই বিষয় সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইল। যে নিয়ম-তন্ত্রপ্রণালী দশখানি হাতকে একত্র করিয়া ঈশ্বরের কাজে লাগাইবার একটি প্রধান

যন্ত্রস্বরূপ, তাহা আমাদের একটি কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের প্রতি অপ্রেম প্রদর্শন ও পরস্পরের দোষ দর্শনের একটি ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে।"

শিবনাথ সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার যে সকল কারণ দেখাইয়াছিলেন, তার মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

১। ব্রাহ্মেরা ধনৈশ্বর্য্যে বাড়িতেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রচারক সংখ্যা কমিতেছে।

২। সাধনক্ষেত্রের অভাবে লোকের ধর্ম্মভাব ক্ষীণ হইতেছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিয়মতন্ত্রপ্রণালীকে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির উপায় করিতে পারিতেছে না। এই শেষের কথাটি বড় গুরুতর কথা। ১৮৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডায়েরিতে যে লিখিয়াছিলেন—তাহাতে দেখিতেছি, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে স্থায়ী আচার্য্য হইতে দেন নাই—স্থায়ী আচার্য্য উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন, তাহা না দেওয়াতে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির একটি সদুপায় নষ্ট হইল। আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি না পাইলে সমাজের শক্তি বৃদ্ধি হইবে না, অর্থাৎ—ধর্ম্মসমাজের প্রাণই বাহির হইয়া যাইবে। তৃতীয় কথা বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁকে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমিও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার বহু পূর্ব্বেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া যে সমাজের জন্য তিনি প্রাণ দিলেন, তার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না। এত বক্তৃতা, এত উপাসনা, উপদেশ সব অরণ্যে রোদন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যিনি অকাতরে দেহ মনের সমুদয় শক্তি যে কার্য্যের জন্য ক্ষয় করিলেন, তার কোন ফল হয় নাই বলিয়া যখন বুঝিলেন তখন প্রাণের কি অবস্থা হওয়া সম্ভব? লোকে বলিতে পারে তাঁর ভ্রান্তি হইয়াছিল; আধ্যাত্মিক অবস্থা সমাজের ভালই ছিল। কিন্তু ইহা মানিয়া লইবার মত কথা নয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার দ্বারা পরিচালিত নিয়মতন্ত্রপ্রণালী আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির অন্তরায় হইয়াছে—একথাটা বড় গুরুতর। ভাল, ইহার প্রতিকারের জন্য শিবনাথ যাহা করিলেন, তাঁর নিজের কথাতেই তাহা বলি :—

"প্রথম যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিকতার শক্তির centre or fountain-স্বরূপ হইলেন, এরূপ একদল বিশ্বাসী ও devoted worker organise করিতে না পারিলে সে শক্তিকে ঘনীভূত করিতে পারা যাইবে না ও বর্ত্তমান শিথিল ভাব বিদূরিত হইবে না।

'দ্বিতীয় যাঁহারা ঐ বিশ্বাসীদলের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া আপনাদের দেহ মন সমগ্র সময় সমর্পণ করিয়া তাদের সঙ্গে বাস, তাহাদের সহিত একত্র সাধন ও সর্ব্বপ্রকারে একীভূত হইতে পারিবেন, এরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে ঐ দল গঠনের ভার দিতে হইবে।

"তৃতীয় যতদিন না ঐ দল fairly organised হয় ততদিন strict policy of noninterference observe করিতে হইবে।"

সাধনাশ্রমের কার্য্যের ও গঠনের সমুদয় দায়িত্ব শিবনাথ নিজের হস্তে গ্রহণ করেন। প্রথমে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বা আর কোন ব্যক্তির ইহাতে কোন হাত ছিল না। শিবনাথ সাধনাশ্রমের ভিতর দিয়া যে কাজ করিলেন এবং যে কাজটিকে তিনি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া মনে করিতেন তাহা এখানে বিবৃত করি। শিবনাথ ২রা সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মবন্ধুদিগের নিকট সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন—আর ১২ই সেপ্টেম্বর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ঠিক ঐ উদ্দেশ্যে "সেবক মণ্ডলী" গঠন করিলেন। আনন্দমোহনবাবু, ডাক্তার পি, কে, রায়, উমেশচন্দ্র দত্ত

প্রভৃতি এই মণ্ডলী গঠন বিষয়ে সহায়তা করেন। এবং আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুঞ্জবিহারী সেন, এবং আর একজন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মনোনীত সেবক হইলেন। এই অনুষ্ঠানটি বিশনাথের কার্য্যের প্রতিবাদ স্বরূপ বলা যাইতে পারে। শিবনাথ এরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু সংকল্প হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না। সেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার সময় যে তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় যে তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন তাহাই আমার দেখা ছিল। তিনি ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বলিলেন ঃ—

"আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এবং সেই বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ় হইতেছে যে, আশ্রম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থাকে দূর করিবে, এবং ইহার শক্তিকে জাগ্রত করিবে। এই বিশ্বাসেই আমি ইহাতে দেহ মন নিক্ষেপ করিয়াছি। ইহার গুরুত্ব আমি এতদূর অনুভব করি যে পৃথিবীর এমন কেহ নাই, যাহাকে আমি ইহার জন্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি বা এমন কোনও কষ্ট নাই যাহা বহন করিতে ভয় করি। ইহাকে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধীন করিতেছি না, তাহার কারণ এই যে আমার বিশ্বাস যে তাহা হইলে এ কার্য্য ভাঙ্গিয়া যাইবে।" কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, এবং ধর্ম্মবন্ধুগণের বিশেষ প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। যাঁহারা সাধনাশ্রমে যোগ দিলেন তাঁহাদিগের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সমুদয় ভার শিবনাথ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন।

১০/৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ভবনে, শিবনাথ নবনির্ব্বাচিত পরিচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, প্রকাশ দেবজি, এবং কাশীচন্দ্র ঘোষালকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতিশয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত আশ্রমের কার্য্য চলিতে লাগিল। স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর যাকে প্রতিদিন নির্ভর করিতে হইত তাহাদিগের হস্তে চারিদিক হইতে অর্থ আসিয়া পড়িতে লাগিল। সাধনাশ্রম সম্পর্কিত বিশেষ ঘটনাবলীর মধ্যে ১৮৯৩ সালের ১২ই মাঘের দিন যে আশ্চর্য্য দৃশ্য ব্রহ্মমন্দিরে দেখা গিয়াছিল সে ঘটনার কথা অগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। সেদিন ব্রহ্মমন্দিরে সাধনাশ্রমের উৎসবের দিন ছিল। সেদিন পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মন্দিরে আগমন করিবেন, এই সংবাদ শুনিয়া চারিদিক হইতে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা, আবালবৃদ্ধবনিতা আসিয়া অতি প্রত্যূষে মন্দিরটি পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। আজ সকলের মন উদ্‌গ্রীব, প্রাণে কি এক প্রকার অব্যক্ত আশার বাণী জাগ্রত হইল। মহর্ষিদেবের আগমন প্রতীক্ষায় বেদী আজ শূন্য হইল, শিবনাথ বেদীর সম্মুখে বসিয়া কি অপূর্ব্বভাবে যে উপাসনা করিলেন সকলের প্রাণ মন যেন অমৃতরসে তলাইয়া গেল। উপাসনা শেষ হইল, যথাসময়ে মহর্ষি ধীর গম্ভীর পাদক্ষেপে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন. তাঁহার সেই শুভ্র পবিত্র ঋষিতুল্য মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের হৃদয়ে কি এক অপরূপ ভাবের সঞ্চার হইল। মহর্ষি বেদীর উপর সমাসীন হইলেন, শিবনাথ. নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, প্রকাশ দেব, কাশীচন্দ্র ঘোষাল এই সাতজন পরিচারক মহর্ষির আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিম্নে উপবেশন করিলেন।

শিবনাথ মহর্ষির আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া সাধনাশ্রমের বিশেষ উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন। মহর্ষি একে একে সকলের মস্তকে হাত দিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মসমাজের সেবা, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যে নব সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছ, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর তোমাদের সে সঙ্কল্প পূর্ণ করুন।"

সেদিন যাঁরা মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া, এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁদের

জীবন ধন্য হইয়াছে। সেদিনকার কথা কখন এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। ভগবান যে ভক্তহৃদয়ে বিহার করেন এবং লীলা করেন, সেদিন একথার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শত শত হৃদয়ে তড়িতের ন্যায় পবিত্র সংকল্পের সঞ্চার কে করিতে পারে? মানুষের সাধ্য কি শত শত মানুষের চিত্ত লইয়া খেলা করে? যিনি জনচিত্তবিহারী, হৃদয়বাসী দেবতা, হৃদয় লইয়া খেলা করা তাঁরই পক্ষে সম্ভব। সেই দিন ব্রহ্মমন্দিরে মানবচিত্তে বিধাতাব লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহর্ষিদেব চলিয়া গেলেন— আজ সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ, প্রাণ বিগলিত—এমন সময় শিবনাথ তাঁর অনুষ্ঠিত সেবাযজ্ঞে জীবনাহুতি দিবার জন্য অগ্নিময় ভাষায় সকলকে আহ্বান করিলেন।

এই বৎসরে শিবনাথ যে নগর-সংকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন সেই সঙ্গীতের ভিতর এমন একটা অগ্নি ছিল যে, ১০ই মাঘ হইতে সেই গান গাহিতে গাহিতে লোকের প্রাণে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল। আজও মন্দিরে সেই সঙ্গীতটি গীত হইল। গানটি এই ঃ—

আজ শোনরে, শোনরে তাঁর বাণী
এমনি মধুর আহ্বান, মৃতদেহে জাগেরে প্রাণ
ছিন্ন হয় সংসার বন্ধন রে।
সে বাণীর বর্ণে বর্ণে, সুধারস স্পর্শে কর্ণে
কাটে মোহ নিদ্রার স্বপন রে।
সে বাণী পরশ পেয়ে, নর নারী আসে ধেয়ে
সঁপিবারে জীবন যৌবন রে।
বিষয় বাসনা ফেলি, সুখ স্বার্থ পায়ে ঠেলি
ধায় তারা মত্তের মতন রে।
শুনি সে মধুর বাণী ভব সুখে তুচ্ছ মানি
এস তবে এস ভক্ত জন রে;
বিশ্বাস অনল জ্বালি বৈরাগ্য আহুতি ঢালি
সেবা যজ্ঞের কর আয়োজন রে।

শিবনাথ বলিলেন, "জীবন দান কর ব্রহ্মচরণে, তবেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার হইবে। পাড়াগাঁয়ে কৃষকেরা শীতকালে আগুন জ্বালে। সে আগুনে পুরুষ রমণী সকলে হাত-পা গরম করে যে যাহা পায় সেই আগুনে ফেলে দেয়। ব্রাহ্মদের সেইরূপ একটি জীবন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বালিতে হইবে, যাহাতে আমরা পুরুষ নারী সকলে আহুতি দিব, বিশ্বাসের আহুতি দিব, বৈরাগ্যের আহুতি দিব, ব্রহ্মশক্তি জাগিবে। কে চাও আহুতি দিতে এস? কে চাও? সংসারের পুঁটুলি ফেলে দিয়ে যাও। যার যা আছে দিই এসো। সাংসারিকতার হাওয়া বড় ঠাণ্ডা। আগুন চাই। দাও আহুতি দাও। যার যাহা আছে দাও। যার আর কিছু নাই, সে আপনাকে দাও। বল আমার আর কিছু নাই আমি নিজে পড়িলাম। জেলে তোল আগুন জেলে তোল। প্রেম দিবে, প্রার্থনা দিবে, অনুতাপ দিবে, এস সহায় হও। জ্বলুক, জ্বলুক জ্বলুক ব্রহ্মনামের অগ্নি জ্বলুক, বিষয়বুদ্ধি যাতে দগ্ধ হয়, অগ্নি জ্বলুক।" এক নিমেষের মধ্যে যেন হৃদয়ে হৃদয়ে তড়িৎ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। আজ সকলে আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব দান করিবার জন্য ব্যাকুল। শিবনাথের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় দানবৃষ্টি হইতে লাগিল। যার দিবার কিছু ছিল, সেই সেদিন দান করিয়া ধন্য হইল! শিবনাথের সেদিনকার মুখশ্রী—কখনই ভুলিবার নয়! তিনি

বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভগবৎপ্রেমে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত। কেবল "ওঁব্রহ্ম ওঁব্রহ্ম, ওঁব্রহ্ম! জয় তোমার! জয় তোমার!" এই রব ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল!! অনুনয় বিনয় করিয়াও যাঁদের নিকট হইতে দশটি টাকা সংগ্রহ করা কঠিন, আজ তাঁদের হৃদয়-গ্রন্থি কে সহসা খুলিয়া দিল! আজ কেন তারা সর্ব্বস্ব ভগবানের নামে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত? লোকে বলিবে সাময়িক প্রভাব। ঘরে ফিরিয়া গিয়া আবার সকলে বিষয়ের কূপে নিমগ্ন হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রয়োজন যখন ছিল তখন আনিয়া দিল কে? অভাবের তাড়নায় নিপীড়িত ভক্তের হস্তে ৮০০ টাকা মুহূর্ত্ত মধ্যে আনিয়া কে দিল? সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিবনাথকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। নিজে পরীক্ষকের বৃত্তিরূপে, পুস্তক লিখিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, এই আশ্রমের জন্য অকাতরে ঢালিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে নিজ পরিবারের অভাব মোচনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াও আবার পরিশ্রম করিতেন। এখন নিজের পরিবারের উপর, পরিচারকদিগের পরিবার—পরিজনের সমুদায় অভাব মোচন, তাঁদের পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধ করা কিছু আর সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এখানেও আর কমিটির হাতে ভার নয় যে উদাসীনতা কোথায়ও লক্ষিত হইবে? শিবনাথ এ জীবনে কখন কাহার নিকট অভাবের কথা বলেন নাই, কিন্তু অভাব ত অভাবই, দারিদ্র্য কিছু আর সম্পদ নয়; ক্ষুধার তাড়না উপেক্ষা করা যায় না—শিবনাথের গৃহের অবারিত দ্বার ছিল, সেখানে যিনি আশ্রয় পাইতেন, তিনি চিরদিনের মত আপনার জন হইয়া যাইতেন, সুতরাং অনেকের মুখের গ্রাসের কথা তাঁকে সর্ব্বদাই ভাবিতে হইত।

তাহার ডায়েরিতে দেখিতেছি এক জায়গায় লিখিয়াছেন ঃ—

"24th October, 1890.

I am in train going to Trichinopoly. Yesterday on my return to Coimbatore received a packet of letters among which one from Hem, telling that her first information that the Committee has allowed 15 Rupees increase of my allowance is a mistake. So these gentlemen though they have been told that I was running into debts for insufficiency of allowance. That only shows, the want of fellowship between the members and the missionaries, a thing that is leading to the withering up of the Sadharan Brahmo Somaj. There is none at the head-quarters who really feels for mission work. The missionaries look up to me * * * Society pays its workers in two ways, 1st by money—2nd by love and honour. The 2nd payment alone can be made to the missionaries of the Somaj. If that is wanting no man of parts will have much inducement to enter this life. The present state of apathy must be changed else the Sadharan Brahmo Somaj will be paralysed. Something must be done from the beginning of the next year."

সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার এক বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার মনের ভাব ছিল। সাধনাশ্রমের পরিচারকরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়া যাঁরা তার কার্য্যের জন্য জীবন দান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে যে তিনি পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, সে কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁদের অভাব উপস্থিত হইলে তিনি

নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করিতেন. তাঁর আহার নিদ্রা ভার হইত। তিনি কি করিয়া এতগুলি পরিবার, এতগুলি প্রাণীর আর্থিক পারমার্থিক ভার বহন করিতেন, সে কথা বলিতে গেলে অনেক ব্যক্তিগত কথা বলিতে হয়, তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তিনি সে সময়ে যে কি প্রকার উদ্বেগে সময় কাটাইতেন, তাহা দেখিয়াছি—এই সম্বন্ধে তাঁহার আত্মজীবনী হইতে একদিনের ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"একবার আমি সাধনাশ্রমের কার্য্যভার আশ্রমের একজন পরিচালকের প্রতি দিয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থে লাহোরে গিয়াছিলাম। সেখানে সংবাদ পাইলাম আশ্রমে মহা অর্থ-কষ্ট উপস্থিত! দিনে দুই তিন আনা মাত্র বাজার হইতেছে। যে রবিবার প্রাতে এই সংবাদ পাইলাম, সেই দিন তথাকার এক ব্রাহ্ম বন্ধুর ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল, আহার করিতে যাইবার সময় সঙ্গের একটি ব্রাহ্ম বন্ধুকে বলিলাম 'আজ আমার নিমন্ত্রণ খেতে উৎসাহ হচ্ছে না। কলিকাতার আশ্রমে যাঁরা আছেন, তাঁদের বাজারের পয়সা নাই আর আমি এখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াচ্ছি এ ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করি কথা দিয়াছি না গেলে নয়।' এই বলিয়া কোন প্রকারে গিয়া আহার করিয়া আসিলাম। সায়ংকালে লাহোর মন্দিরে উপাসনার কার্য্য আমাকে করিতে হইল। উপাসনান্তে আমি বেদী হইতে নামিয়াছি, এমন সময়ে একজন আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দিরের পশ্চাতের ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি গিয়া দেখি তিনি একজন বড়লোকের পুত্রবধূ। তাঁহার পতি কিছুদিন পূর্ব্বে হইতে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া গলবস্ত্রে আমার চরণে প্রণত হইলেন, এবং আমার পায়ে একশত টাকার নোট রাখিয়া বলিলেন, 'আপনার স্থাপিত আশ্রমের সাহায্যার্থে দান।' তৎপর দিনই সেই টাকা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলাম।" এই প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার অভাবের জন্য তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইত। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সকল অভাব মোচন হইয়া যাইত।

শিবনাথের ধর্ম্মবন্ধুগণ সাধনাশ্রমকে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধীন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্যর্থকাম হইয়া তাঁহারা "সাধক মণ্ডলী" গঠন করিলেন। শিবনাথ নিজের স্কন্ধে সাধনাশ্রম গঠন ও তাহার পরিচালন ভার লইলেন। বাহিরের কাহাকেও একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দিলেন না। কিন্তু এক বৎসর পরে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধনাশ্রমকে সাধক মণ্ডলীর সহিত যুক্ত করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধীন করিলেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনের হেতু তাঁর নিজেরই কথায় বলি "যখনি বুঝিতে পারা গেল যে, এই আশ্রম ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তির একটি আধারস্বরূপ হইবে, এবং এখানে যে বিশ্বাসী সাধকদল সমবেত হইবেন, কালে তাঁহাদের হস্তে প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি আসিয়া পড়িবে, অমনি চিন্তা হইতে লাগিল যে, যদি এই মণ্ডলীর বহিঃস্থিত, সমাজের লোকদিগের সহিত ইহার আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বন্ধ না থাকে, যদি এরূপ একটি দ্বার খুলিয়া না রাখা যায়, যদ্দ্বারা বাহিরের সমাজের শক্তি আসিয়া এই মণ্ডলীর কার্য্যের সহায়তা করিতে ও তাহাকে সংযত রাখিতে পারে, তাহা হইলে কালে হয়, সমাজের সহিত এই মণ্ডলীর বিচ্ছেদ ঘটিবে, না হয় সমগ্র সমাজের অধোগতি হইবে, তাঁহারা এই নবপ্রবিষ্ট দলের পদানত হইয়া পড়িবেন। এই চিন্তা মনে উদিত হওয়াতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সঙ্গে ইহার কোন প্রকার যোগ স্থাপন করা আবশ্যক বোধ হইল। অনেক দিনের চিন্তা ও প্রার্থনার পরে একটি গঠন প্রণালী (scheme) স্থির করিয়া, লিখিয়া অগ্রে আশ্রমের বন্ধুদিগের নিকটে পাঠ করা গেল। তৎপরে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকটে প্রেরিত হয়।

সেই schemeটির মূল ভাব এইঃ--

১। বিষয় কার্য্যত্যাগী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠিত হইবে।

২। তাঁহাদের ধর্ম্ম সাধনার্থ একটি আশ্রম থাকিবে।

৩। সর্ব্বোপরি একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক থাকিবে। আশ্রমের আভ্যন্তরীণ কার্য্যে তত্ত্বাবধায়কের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। হাতে গড়া প্রিয় সমাজের পাছে অনিষ্ট হয় এই ভয়ে শিবনাথ আবার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত সাধনাশ্রমকে যুক্ত করিলেন। তাঁহার ভয় যে অলীক ছিল তাহা নয়। শিবনাথের মত তত্ত্বাবধায়ক সে সর্ব্বদা মিলিবে তাহার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই প্রকারে যুক্ত হইবার পর সাধনাশ্রমের আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি না পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আবার ভাঁটার টান ধরিল।

যাহোক সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কি কি কার্য্য হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিতেছি ঃ--

১। ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য বোর্ডিং—১৮৯৩ সালে পরলোকগত সীতানাথ নন্দী ব্রাহ্ম বালকদিগের জন্য একটি বোর্ডিং স্থাপিত করেন। শিবনাথ এই ছাত্র-নিবাসের সম্পাদক হইয়া সমুদয় ভার স্কন্ধে লইলেন। দুঃখের বিষয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই সীতানাথ নন্দীর মৃত্যু হইল। তখন শিবনাথ সাধনাশ্রমের পরিচারক গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর উপর এই বালকদিগের বোর্ডিং-এর ভার দিলেন, এবং সতীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী গুরুদাসবাবুর সহকারী হইয়া এই ছাত্রনিবাস চালাইতে থাকেন। গুরুদাসবাবু প্রথমে আর পরে বাঁকিপুর গিয়া সেখানকার সাধনাশ্রমের ভার গ্রহণ করেন। কলিকাতার বোর্ডিং-এর ভার পরলোকগত শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহালানবিশ মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। গুরুদাসবাবুরা বোর্ডিং-এর হিসাবে ৫০০ টাকার ঋণ রাখিয়া যান, এই ঋণ শিবনাথ পরীক্ষকের পারিশ্রমিক হইতে শোধ করেন। সাধনাশ্রমের জন্য তাঁহাকে নিজে পরিশ্রম করিয়া কত যে উপার্জ্জন করিতে হইয়াছে, ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বৃদ্ধ বয়সে এ ভার যথার্থই তাঁহার স্কন্ধে গুরুতর ভার হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠারূপ কার্য্যটিকে তিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। একথা অনেকবার তাঁর মুখে শুনিয়াছি। আমাদের শরীরের পক্ষে যেমন মস্তিষ্ক আর হৃদয়, রেলগাড়ীর পক্ষে তেমনি এঞ্জিন ও কয়লা, গৃহ, গৃহস্থালীর পক্ষে যেমন ভাণ্ডার আর রান্নাঘর, তেমনি ধর্ম্মসমাজের পরি-পোষণের জন্য একটি ঘন নিবিষ্ট বিশ্বাসী ভক্ত সাধক ও প্রচারকমণ্ডলীর আবশ্যক। এই লোকগুলি একান্ত নিষ্ঠার সহিত, ধর্ম্মসাধনা, ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজের সেবা করিবেন, এই তাঁহার ভাব ছিল। এই উদ্দেশ্যটি যে মহৎ তাহা কে অস্বীকার করিবে? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় কত উৎসাহী শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন —যথা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইতে সরিয়া পড়িলেন। শিবনাথ ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট একটি সুলিখিত সুবিস্তৃত প্রবন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর ভিতর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার প্রস্তাব করেন। বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় শিবনাথ কার্য্যপ্রণালীর ভিতর যে দোষ দেখিতে পাইলেন, তাহা প্রতীকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। যে সভায় এই প্রস্তাবটি উপস্থিত হয় আমি তাহাতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার প্রস্তাব যে কেবল অস্বীকৃত হইল তাহা নহে, যথেষ্ট ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা নামঞ্জুর করিলেন। একনায়কত্বের ভয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সশঙ্কিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী গড়িবার সময় শিবনাথের হাত কতখানি ছিল তা এই যুগের ব্রাহ্মগণ ভুলিলেন।

সবচেয়ে কাজ যিনি করিলেন তিনি বুঝিয়াছিলেন ভাল করিয়া কাজ করিতে গেলে লাগে কোথায়? কিন্তু বুঝিলে কি হইবে প্রতীকার করা আর সম্ভব হইল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান নিয়মাবলী কিঞ্চিৎমাত্র সংশোধিত করিতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া শিবনাথের প্রাণ শান্তিহারা হইল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ত একটি যন্ত্র—তাহা ত নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল! এই নিয়ত ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত, নিয়মিত, এবং কার্য্যক্ষম হওয়া কি বড় সহজ ব্যাপার! একজন শক্তিশালী ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব এবং প্রভাব অনুভব করিবার জিনিষ—কমিটির প্রভাবে তাহা হইতে পারে না। শিবনাথ বলিয়াছিলেন আশ্রমের পরিচারকগণ অগ্নিময় মানুষ হইবেন—আরও বলিয়াছিলেন "Religion is caught and not taught" কিন্তু অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিবার মত লোক সংসারে কয় জন? আমি বলি তেমন মানুষের অভাবে কমিটিই ভাল? যাহোক শিবনাথ একাকী বহুদিন সাধনাশ্রমের সমুদায় ভার বহন করিয়াছিলেন। সে ভাবটি কিরূপ?

(১) কলিকাতার সাধনাশ্রমের ভাব
(২) বাঁকিপুরের ,,
(৩) লাহোরের ,,
(৪) ঢাকার ,,

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আশ্রমের পরিচারক হইয়াছিলেন

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী সপরিবারে	সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কাশীচন্দ্র ঘোষাল	চপলা ঘোষ
প্রকাশ দেবজী,	হরিমোহন ঘোষাল
শ্রীবঙ্গবিহারী লাল,	কুঞ্জলাল ঘোষ,
ভাই সুন্দর সিংহ	হেমচন্দ্র সরকার
ইন্দুভূষণ রায়,	

পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম করিলাম না, কারণ তাঁহারা সাধনাশ্রমের সহিত যোগ দিবার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শিবনাথের প্রভাবে যাঁহারা সাধনাশ্রমে আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রকাশ দেবজী, সুন্দর সিংহ, অমৃতলাল গুপ্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ শিবনাথ স্বয়ং এই অমূল্য জীবনগুলি ভগবানের কাজের জন্য প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বে ইঁহারা কেহই ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন না। ব্রাহ্ম-সমাজের সেবার জন্য এই যে উৎকৃষ্ট প্রচারকগুলি পাওয়া গিয়াছে এবং যাহার প্রভাব ব্রাহ্মসমাজে চিরস্থায়ী হইবে, এই মানুষগুলিকে পাওয়া কি শিবনাথের জীবনে অপর সকল কার্য্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য্য নহে? তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার পুস্তক পুস্তিকা, লোকের অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু এই যে মানুষগুলি, যাহা-দিগকে তিনি তাঁহার সেবাব্রতের উত্তরাধিকারীর মত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কি জীবনের সকল কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য নহে? সাধনাশ্রমের সেবকগণ মুষ্টিমেয় হইলেও কলিকাতা, বাঁকিপুর, লাহোর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যে সকল কার্য্য করিয়া-ছেন তাহা সামান্য নহে। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—বাঁকিপুরের রামমোহন রায় সেমিনারী, শিবনাথ ১৮৯৭ সালে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকিপুরের, সাধনাশ্রমের সেবকগণ যথা সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীবঙ্গবিহারী লাল, অমৃতলাল গুহ, প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ের জন্য অশেষ যত্ন ও ত্যাগ স্বীকার

করিয়াছেন। ইহা শিবনাথের প্রতিষ্ঠিত সাধনাশ্রমের এক মহাকীর্ত্তি, এবং এই কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই যে সাধনাশ্রম-রূপ বৃহৎ ব্যাপারটি শিবনাথ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার জন্য ১৮৯২ হইতে ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত এক কলিকাতার শাখার জন্য চৌদ্দ হাজার একশত সাতান্ন টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই অর্থ কোথা হইতে আসিল? সাধনাশ্রমের জন্য নির্দ্দিষ্ট চাঁদাদাতা কেহ ছিল না। যখন প্রথম স্থাপিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, এবং শিবনাথের আত্মজীবনের অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধুগণ প্রভৃতি ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। শিবনাথ কোন সাহসে, কাহার ভরসায় এত বড় কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন? ভরসা একমাত্র যাঁকে করিলে মানুষ নিরাশ হয় না, তিনিই ভরসা ছিলেন।

কি করিয়া আশ্রমের ব্যয় সঙ্কুলান হইত, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্তে দেখিতেছি ঃ—

"আশ্রমের নিয়মিত চাঁদাদাতা নাই বলিলেই হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দান করেন, তাহাই কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আশ্রমের নিয়মানুসারে পারিচারকগণের ঋণ করা নিষিদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এ পর্য্যন্ত আশ্রম পরিচালনের জন্য একটি পয়সাও ঋণ হয় নাই। যাহা প্রয়োজন তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে।" অভাব কিরূপে, পূর্ণ হয় তাহার কতিপয় বিবরণ "ইতিবৃত্ত" হইতে সংগৃহীত করিয়া এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

১৩ই মার্চ্চ ১৮৯৩। একজন পরিচারককে চারিটি টাকা না দিলেই নয়। কিন্তু ভাণ্ডারে ১৸৵০ মাত্র আছে। কার্য্যাধ্যক্ষ শাস্ত্রীমহাশয়কে একথা জানাইলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রার্থনার প্রত্যুত্তর স্বরূপে সেই দিনই ১১।০ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গেল।

১৭ই মার্চ্চ ১৮৯৩। অদ্য ভাণ্ডারে মাত্র দুইটি টাকা আছে, খরচ অনেক, কিরূপে ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে? শাস্ত্রীমহাশয় প্রভুকে জানাইলেন, কিছুকাল পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত দান ৪টি টাকা পাওয়া গেল।

২৫শে অক্টোবর। ১৮৯৪। আশ্রমের ইতিবৃত্তে শাস্ত্রীমহাশয় স্বয়ং লিখিতেছেন, "আমি বলিলাম আমাদের যাহা ভাবিবার করিবার আছে আমরা করি। * * * ঈশ্বরের করুণা অলসদিগের জন্য অবতীর্ণ হয় না। এই বলিয়া তাঁহাকে * * * ঈশ্বর চরণে অভাব নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিতে বলিলাম। নিজেও তদবধি অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছি। অদ্য প্রাতে উপাসনান্তে * * * বলিলেন যে আশ্রমে স্বতঃপ্রবৃত্ত দান ৫ টাকা আসিয়াছে। অমনি আমার দৃষ্টি অন্নদাতার উপর পড়িল।"

৭ই নবেম্বর। ১৮৯৮। শাস্ত্রীমহাশয় লিখিতেছেন "আজ দেশ হইতে ফিরিবার সময় শেলটারের এ মাসের ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। দয়াময় পিতা ভরসা কিন্তু আমরা অদ্যাবধি এই ভাবে চলিয়া আসিতেছি যে আমরা আমাদের করণীয় অংশ সমুচিত রূপ না করিলে, তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হয় না। আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, সর্ব্বোপরি যে লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, সেই লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে, তবে আমরা প্রভুর কৃপার উপযুক্ত হইব। তদনুসারে আমি ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি যে, এ মাসে কয়েক জনকে মফঃস্বলে প্রেরণ করিতে হইবে। আশ্রমে আসিয়াই শুনি. প্রফেসার নিউম্যানের নিকট হইতে একখানি পত্র আসিয়া রহিয়াছে। খুলিয়া দেখি তিনি আমাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার জন্য দুই পাউণ্ড পাঠাইয়া-

ছেন। প্রভুকে ধন্যবাদ। আমার মনে হইতেছে, যিনি বাহিরের প্রার্থনা এত পূর্ণ করিতেছেন, তিনি কি আধ্যাত্মিক প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না? সে কি কথা! আশা হইতেছে রিপুকুলের উপরেও আমরা জয়লাভ করিব? একদিন অর্থাভাব উপস্থিত হয়। মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পূর্ব্বে কার্য্যাধ্যক্ষ শাস্ত্রীমহাশয়কে এই কথা জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যাকালে সকলে উপাসনাতে বসিয়াছেন। উপাসনার পর দেখা গেল, বেদীর উপর কে ১০ টাকার একখানি নোট রাখিয়া গিয়াছেন। সে দিন যে আমাদের অর্থাভাব হইয়াছে তাহা কার্য্যাধ্যক্ষ ও শাস্ত্রীমহাশয় ভিন্ন অন্য কেহই জানিতেন না।

আর নয়। সাধনাশ্রমের বিপুল ব্যয়ভার কিরূপে নির্ব্বাহ হইত, এখানে তাহার সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে। শিবনাথ সমুদায় মন প্রাণ দিয়া সাধনাশ্রম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যেখানে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থত্যাগ, সে কার্য্য কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। হৃদয়ের শোণিত কি করিয়া উৎসর্গ করিতে হয় শিবনাথ তাহা জানিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় যত না কার্য্য হইয়াছে, জীবন্ত বিশ্বাস, অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ, প্রগাঢ় প্রেম তদপেক্ষা শতগুণ ফলপ্রদ হইয়াছে। শূন্যগর্ভ চীৎকারে অসার চিত্ত হইতে, আজ পর্য্যন্ত কোন কার্য্য এ জগতে হয় নাই। সাধনাশ্রমের সে গৌরবের দিন এখন নাই বটে, কিন্তু তা বলিয়া নিরাশ হইবার কারণ নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিবার জন্য আরও অনেকে খাটিয়াছিলেন, শিবনাথ খাটিয়াছিলেন নিঃসন্দেহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ অভাব বোধ করিয়াই এই সাধনাশ্রম তিনি একাকী গঠন করিয়াছিলেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজরূপ সুবৃহৎ সৌধের এই একটি শান্তিক্ষেত্র তাঁর নামে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি!! ভবিষ্যৎবংশীয়েরা বিচার করিও এই আশ্রমটির কত মূল্য!!

॥ বিংশ অধ্যায় ॥

রুগ্নদেহে সেবা

১৯০১ সালের প্রথমেই শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মনোনীত হইলেন। কোন কার্য্য শিথিলভাবে করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সেই প্রখর দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে এই দায়িত্ব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কঠিন মানসিক শ্রমে নিমগ্ন হইলেন। এই বৎসরে এপ্রিল মাসে শিবনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথের সহিত, কটকের সুবিখ্যাত জনহিতৈষী ধর্ম্মপ্রাণ মধুসূদন রাও-এর দ্বিতীয় কন্যা অবন্তী দেবীর বিবাহ হইল। সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বিবাহটি অতিশয় সুখের হইয়াছে। উড়িষ্যা প্রদেশে মধুসূদন রাও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বাস্তবিক এমন আদর্শ চরিত্র পুরুষ বর্ত্তমান সময়ে বড় বিরল। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শিবনাথ পরম তৃপ্ত হইয়াছিলেন। জননী প্রসন্নময়ী পুত্রবধূ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বারবার পতিকে অনুরোধ করিতেন, "আমাকে একটি বৌ এনে দাও।" শিবনাথ বলিতেন "যাহার বিবাহ সে যখন ভার বহন করিতে সক্ষম হইবে তখন বিবাহ করিবে—পুত্রের বিবাহ দেওয়া আমার কার্য্য নয়।"—প্রসন্নময়ী বড়ই দুঃখিত হইতেন, বলিতেন "এখন

সব সাহেবীমত কোথাও শুনি নাই, তুমি বিলাতে গিয়ে একেবারে সাহেব হয়ে গেছ, বাপ মায়ের কর্ত্তব্য ছেলে মেয়ের ভাল বিয়ে দেওয়া।" শেষে তিনি বলিতেন "আমি ভগবানের কাছে ভাল বৌ-এর জন্য প্রার্থনা করিব।" ভগবান প্রসন্নময়ীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। গুণবতী বুদ্ধিমতী পুত্রবধূ আসিয়া তাঁর প্রাণ শীতল করিল। কিন্তু এই সুখ তিনি দুটি মাস বই ভোগ করিতে পারিলেন না। পুত্রের বিবাহের দুই মাসের মধ্যেই ৩রা জুন তারিখে আঙ্গুলে বিস্ফোটক হইয়া প্রসন্নময়ী পরলোক গমন করিলেন। বহুদিন হইতে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাধিগ্রস্ত শরীরেও প্রসন্নময়ী নিরন্তর শ্রম করিতে ছাড়িতেন না। মৃত্যুর ৮ দিন পূর্ব্বেও তিনি আপন হস্তে সমুদায় কর্ম্ম করিয়াছেন। দারুণ যন্ত্রণায় কঠিন অস্ত্রচিকিৎসায়, তিনি ৮ দিন শয্যায় পড়িয়া ছিলেন। তিনি যখন পীড়িত হন, তখন শিবনাথ আসামে ছিলেন, পুত্র প্রিয়নাথ কার্য্যোপলক্ষে রাঁচিতে ছিলেন—জেষ্ঠজামাতা দার্জ্জিলিং ছিলেন। সকলে আসিয়া পড়িলেন—দেশ হইতে শাশুড়ি ননদ, ভাই বোন সকলে শেষ বিদায় দিতে আসিলেন। প্রসন্নময়ী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "আর যাই কারো আমার দুঃখিনী মাকে খবর দিও না, তিনি এক গণ্ডূষ জল মুখে দিতে না পেরে মরবেন।" তাই বৃদ্ধা জননীর নিকট কোন সংবাদ গেল না। নববিধান সমাজের প্রচারকগণ যাঁদের সঙ্গে প্রসন্নময়ী আশ্রমে ছিলেন —যথা কান্তিবাবু, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় সকলেই প্রসন্নময়ীকে দেখিতে আসিলেন। মৃত্যুর ঠিক ১৫ মিনিট পূর্ব্বে হরানন্দ শর্ম্মা পুত্রবধূকে দেখিতে আসিলেন। শয্যাপার্শ্বে বসিলেন, প্রসন্নময়ীর তখন জ্ঞান নাই—জীবনরবি অস্তোন্মুখ, দীর্ঘ শ্বাস পড়িতেছে, গৃহ লোকে লোকারণ্য, সূর্য্যের শেষ রশ্মি পশ্চিম আকাশে লয় পাইতেছে—শিবনাথ মস্তকের নিকট উপবিষ্ট, পুত্র কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। শিবনাথের আজীবনের বন্ধু পুণ্যশ্লোক আনন্দমোহন মুমূর্ষুর মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন, আর অবিরল অশ্রুধারায় তাঁর মুখ ভাসিয়া যাইতেছে--সকলেরই চক্ষে জলধারা আর হাহাকার রব, পুণ্যবতী প্রসন্নময়ী অতি গৌরবময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। শত শত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন। ভারে ভারে পুষ্পগুচ্ছ ও ফুলের মালা, সুগন্ধ দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ীকে নববধূর বেশে সজ্জিত করান হইল—চন্দনচর্চ্চিত ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোভা পাইল —চরণে অলক্তক, কি শোভা হইল! এমন করিয়া কেহ তাঁহাকে এজীবনে সাজায় নাই। ধর্ম্মবন্ধুগণ তাঁহার পবিত্র কলেবর স্কন্ধে করিলেন—তিনি চিরদিন তাঁর ভক্তিভাজন ধর্ম্মবন্ধুদিগকে যথা আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বলিতেন যে, "আপনারা আমায় শ্মশানে লইয়া চিতার উপর দিবেন ত? ভক্তের সঙ্গে যাইতে আমার বড় সাধ।" ভগবান তাঁর সে সাধ পূর্ণ করিলেন। শ্মশানঘাটে সকলে বলিতে লাগিল "কোন ভাগ্যবতী এল রে পাকামাথায় সিন্দুর পরে ফুলের বিছানায় শুয়ে, এত লোক সঙ্গে করে?" হাঁ ভাগ্যবতীই বটে! শিবনাথের সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনী। অন্তিমশয্যায় শায়িত পুত্রবধূকে দেখিয়া হরানন্দ বলিলেন, "জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—দয়াধর্ম্ম—আমার বৌ সেই ধর্ম্ম পালন করে গেছে, তার স্বর্গ নিশ্চিত।" যাহোক প্রসন্নময়ী শিবনাথের ঘরে অনেক দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করে, প্রাণপণ সেবা যত্নে সকলকে সুখী করে অমরধামে প্রস্থান করিলেন। আশৈশব জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী প্রসন্নময়ীকে হারাইয়া শিবনাথ বাহিরে বিচলিত হইলেন না, কিন্তু অন্তরে নিশ্চয়ই তাঁহার বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল, কারণ পত্নীর মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তিনি কঠিন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন হইতে আর সবল

হস্তে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে পারেন নাই। নদীতে যেমন ভাঁটা পড়ে তেমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহ মনের শক্তিতে ভাঁটা পড়িতে লাগিল। ভগ্ন-দেহেও যাহা করিয়াছেন—সে সেবা বড় সামান্য নহে।

১৯০১ সালের শেষভাগে শিবনাথ বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, খাণ্ডোয়া, কৈলরার প্রভৃতি স্থানে পাঁচ ছয় মাস কাটাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময় এলাহাবাদে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাস করিতেন। এলাহাবাদে গিয়া শিবনাথ তাঁহার বাড়ীতেই অতিথি হইয়াছিলেন। এই সময় প্রায় প্রতিদিনই ডায়েরি লিখিতেন। এখনও ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিকতার শ্রীবৃদ্ধি না দেখিয়া পরি-তাপ করিতেন। আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার দুর্ব্বলতার জন্য আপনাকেই দায়ী মনে করিয়া অন্তরে নিদারুণ যাতনা বোধ করিতেন। শিবনাথ এবং তাঁহার বন্ধুগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী রচনা করিয়াছিলেন, এত দিনের কার্য্যের পর দিন দিন শিবনাথের সেই স্বরচিত নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর ত্রুটিসকল ভাল করিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে তাঁর দারুণ অতৃপ্তি উপস্থিত হইল। তাঁর ডায়েরির পত্রে পত্রে তার নিদর্শন দেখিতেছি। নিয়মতন্ত্রপ্রণালী সংস্কার করিবার জন্য তিনি পূর্ব্বেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতীকারের প্রবল বাসনায় সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধর্ম্মজীবনই ধর্ম্মসমাজের প্রাণ। তিনি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া অনেক কাজ করিলেন বটে, কিন্তু সাধনাশ্রমকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়া তাহারও যেন জীবন্ত ভাব হ্রাস হইল। তখন সাধনাশ্রমও আর তাঁর প্রাণে তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না। শেষ জীবনে তাঁর প্রাণের এই দারুণ অশান্তি আমাদিগকে বড়ই পীড়া দেয়। এই অশান্তির ফলে এই সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকপদ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইলেন।

১৯০৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ডায়েরিতে লিখিতেছেন ঃ—"অনুভব করিতেছি সমাজকে যে wrong track-এ দিয়াছি তাহা হইতে বাহির করিবার জন্য ইহার নিয়মতন্ত্রপ্রণালীকে বদলান উচিত। সে সম্বন্ধে কযেক মাস হইল আমার যাহা বক্তব্য তাহা লিখিয়া নিয়ম পরিবর্ত্তনের Sub committee-র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট দিয়াছি। * * * আশ্রমকে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ করিতে হইবে। কিন্তু আশ্রমের কাজও জমিতেছে না। * * * আশ্রম আরও compact করিয়া তুলিতে হইবে। যে নিয়মতন্ত্রপ্রণালী গঠন করিবার জন্য একদিন তাঁরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অবিশ্রান্ত খাটিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার কার্য্যকালে যখন তার প্রধান ত্রুটিসকল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, তখন শিবনাথ সর্ব্বাগ্রে তাহা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ইংলণ্ড হইতে আসিয়াই তিনি নিয়মতন্ত্রপ্রণালীর দোষসকল হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলেন, সংশোধন করা নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিয়াও যখন প্রতিকার করিতে পারিলেন না, তখন সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মভাব প্রবল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। গুরু গৌরবলালসায় শিবনাথ সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই। হৃদয়ে দারুণ অতৃপ্তি! মৎস্য যেমন জল না পাইলে ছটফট করে, শিবনাথের পিপাসু হৃদয়, চারিদিকে ধর্ম্মভাবের শুষ্কতা অনুভব করিয়া "ত্রাহি" "ত্রাহি" ডাক ছাড়িল। কিন্তু কি পরিতাপ, তাঁর প্রাণে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় অতৃপ্তি ছিল। শুধু অতৃপ্তি কেন—আপনাকে সকল অকল্যাণের মূল কারণ বিবেচনা করিয়া হৃদয়ে দারুণ জ্বালা অনুভব করিতেন।

এই অনুশোচনা ও হাহাকার ডায়েরির পৃষ্ঠায়! পৃষ্ঠায়! আমি পিতৃদেবের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া সত্য গোপন করিয়া যাইতে পারি না। শিবনাথ জীবনে যখন যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। নিয়মতন্ত্রপ্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা একথা যখন বুঝিলেন, প্রাণপাত করিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই প্রণালীর কিছু কিছু ধর্ম্ম সমাজের সকল কার্য্যে সহায় নহে, একথা যখন বুঝিলেন তখন তিনিই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—বলিলেন বড় ভুল হইয়াছে, এইখানে ঠিক গড়া হয় নাই—ভাঙ্গো, ভাঙ্গো, আবার নূতন করিয়া গঠন কর। আর তখন কেই বা তাহা শ্রবণ করে? ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা বিচার করিবেন, শিবনাথের এই পুনর্গঠনের চেষ্টা সুফলপ্রদ হইতে পারিত কি না? প্রত্যেক মানুষ নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির অনুসরণ করিতে বাধ্য, এক সময় যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা যদি পরে অকল্যাণের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখনও কি জেদ বজায় রাখিতে হইবে? না, ধর্ম্মবুদ্ধির অনুসরণ করিতে হইবে? শিবনাথ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন, এই নিজের মত বিশ্বাস জোর করিয়া অপরের স্কন্ধে কিছুতেই চাপাইতেন না।

সমাজ তাঁর মতের সমর্থন করিলেন না, তিনি মর্ম্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু রুষ্ট হইলেন না, বা বলপ্রয়োগ করিলেন না। এখানে প্রত্যেকের স্থান আছে—প্রত্যেকের মতের মূল্য আছে। তবে ব্যাধি কোথায় বুঝিতে শিবনাথই বুঝিয়াছিলেন। অপরে বুঝিল না তা কি হইবে?

১৯০৩ সালের ৬ই অক্টোবর আবার ডায়েরিতে লিখিয়াছেনঃ—"কিছুদিন হইতে একটি চিন্তা গুরুতর রূপে হৃদয়কে অধিকার করিতেছে। আমি এতদিন individual ও society সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লিখিয়া বা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই- individual-এর জন্যই society, individual আপনার পূর্ণ বিকাশ লাভ করুক, তারপর society যাক্ আর থাকুক। Individual গড়িতে গিয়া যদি Society ভাঙ্গিয়া যায় কি করা যাইবে? কৃষ্ণ! করোতু কল্যাণং। * * * এই ভাবেই এতদিন উপদেশ দিয়া ও কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, আধ্যাত্মিক জীবনরাজ্যেও এই individualism-কে লইয়া গিয়াছি। আমার ধর্ম্ম-বুদ্ধিই আমার চালক, শাস্ত্র গুরু কিছুই নয়। * * * কিন্তু এখন মনে হইতেছে, অতিরিক্ত individualism আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষেও ভাল নয় কতটা self-discipline ও self-suppression সে পক্ষে ভাল। এজন্য সাধনাবস্থাতে গুরুর অধীন থাকিবার নিয়ম ভালই বোধ হয়।"

এখানে শিবনাথ যাহা সরল হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। নিজ মণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মভাব ম্লান দেখিলে তিনি বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় বেড়াইতেন। তবে অপরের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এই, তিনি অপরের দোষ ত্রুটি না দেখিয়া অম্লান বদনে নিজের স্কন্ধে সমুদয় অপরাধের গুরুভার তুলিয়া লইতেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯১১, ভুবনেশ্বরে বসিয়া ডায়েরিতে লিখিয়াছেন,-"গত কল্য হইতে একটা কথা বড় মনে জাগিতেছে। আমার বিগত জীবনের যত প্রকার ত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে, তাহার মধ্যে একটা প্রধান এই যে, এতদিন হওয়া অপেক্ষা দেওয়ার দিকে বেশী মন দিয়াছিলাম, অতঃপর হওয়ার দিকে বেশী মন দিতে হইবে। এই বিষয়ে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল যে, বিগত জীবনে অতিরিক্ত মাত্রাতে কার্য্যবাহুল্য হওয়াতে, সাধনে নিষ্ঠা ও ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা আশানুরূপ ফুটিতে পারে নাই। আমি যে পরিমাণে কর্ম্মী হইয়াছি, সে পরিমাণে সাধক হই নাই।"

১৯০৪ সালে কনিষ্ঠা পত্নী বিরাজমোহিনীকে লইয়া দীর্ঘ প্রচার-যাত্রা করেন। বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, সাহারানপুর, দেরাদুন, লাহোর, রাউলপিণ্ডী, ইন্দোর, ম্যাঙ্গালোর, কালিকট, কোইম্বাটুর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আসেন। প্রসন্নময়ীর মৃত্যুর পর হইতে বিরাজমোহিনী স্বামীসেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া লইয়াছিলেন।

শিবনাথের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্বামীর পার্শ্বছাড়া হন নাই। একটি সাধ্বী রমণী,—পতিপ্রাণা বিরাজমোহিনী, স্বামীর সেবা বই জীবনে কিছু জানিতেন না, জীবনের তাহাই একমাত্র সুখ শান্তির নিদান বলিয়া জানিতেন। আজ তাঁর হৃদয় শূন্য—জগৎ শূন্য!

১৯০৪ সালের দীর্ঘ প্রচার-যাত্রাই তাঁর রুগ্ন শরীরে শেষ ব্রাহ্মসমাজের সেবা। এই যাত্রা সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরি হইতে উদ্ধৃত করি ঃ—

Bangalore, 18th May, 1904, বুধবার ঃ—

বিগত মে মাসে দার্জ্জিলিং অবস্থিতি কালে একবার সমুদয় ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আর একবার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা হয়। তৎপরে এই ইচ্ছা বারবার হৃদয়ে আসিয়াছে। বিগত উৎসবের মধ্যে এই প্রকার যাত্রার বাসনা মনে প্রবল হয় এবং বন্ধুগণের নিকট তাহা জ্ঞাপন করি। উৎসব শেষ হইলে ৩১শে জানুয়ারি আমার জন্মদিন ও ১লা ফেব্রুয়ারি আশ্রমের জন্মোৎসব হয়। তৎপরেই প্রচার-যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করি। কিরূপে প্রচার-যাত্রার ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে, এই প্রশ্ন মনে উঠিলেই মন বলে যে, যিনি প্রেরণা করিতেছেন, তিনিই ব্যয়নির্ব্বাহ করিবেন। লোকের নিকট ভিক্ষা করিব না, ইহা এক প্রকার স্থির করিলাম। ইতিমধ্যে পঞ্জাবের সুন্দর দাস ভল্লা—প্রকাশ দেবজীর দ্বারা জানাইলেন, যে তিনি আমাকে ৫০ টাকা দিতে চান। আমি তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলাম। তৎপরে আরও কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু কিছু দিলেন। অবশেষে মনে করিলাম, কলিকাতায় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, ও আমার প্রচার-যাত্রার কিছু কিছু সাহায্য করিতে পাইলে সুখী হইবেন, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিবার অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিলাম, এবং বক্তৃতা-স্থলে একটি ভিক্ষার ঝুলি টাঙ্গাইয়া দিলাম। ঝুলিতে প্রায় ৮০ টাকার উপর পাওয়া গেল। এইরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত দান দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ লইয়া আবশ্যক মত কাপড় চোপড় কিনিয়া ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রচারে বহির্গত হইলাম। তদবধি জগদীশ্বর আমাদের কোন অভাব রাখিতেছেন না। আমরা প্রচারে বহির্গত হইয়া প্রথমে বাঁকিপুর আসি। সেখানে ইংরাজীতে একটি, বাঙ্গলাতে দুইটি বক্তৃতা করি। আশ্রমে উপাসনাদি করি। বাঁকিপুর হইতে এলাহাবাদে আসিয়া এখানেও বক্তৃতা করি, সমাজেও অন্যত্র উপাসনাদি করি। বাঁকিপুর ও এখানে আমাদের আগমনে লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলাহাবাদ হইতে কানপুরে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ীতে আসি। সেখানে একদিন ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা হয়, ও বাঙ্গালীবাবুদের সহিত একদিন মজলিস। তৎপরে লক্ষ্ণৌ গমন করি, সেখানে একটি ইংরাজী বক্তৃতা হয়, তথাকার লুপ্তসমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্ণৌ হইতে আগ্রা যাত্রা করি। এখানে একদিন বাঙ্গালা ও একদিন ইংরাজী দুইটি বক্তৃতা হয়। আগ্রাতে দুই একদিন বিলম্ব করিয়া দিল্লীতে গমন করি। এখানে একদিন বাঙ্গালীদিগকে লইয়া উপাসনা ও একদিন ইংরাজী বক্তৃতা হয়। দিল্লী হইতে সাহারানপুর হইয়া দেরাদুনে গমন করি। দেরাদুনে একটি বক্তৃতা ও স্থানীয় সমাজে উপাসনা হয়। তদনন্তর জ্বর রোগে আক্রান্ত

হইয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিতে বাধ্য হই। দেরাদুন হইতে লাহোর যাইবার পথে সাহাবানপুরে একটি ইংরাজী বক্তৃতা করি, ও একদিন সান্ন্যালদিগের পরিবারে উপাসনা করি। সাহারানপুর হইতে লাহোর আসি। সেখানে একদিন বাঙ্গালা বক্তৃতা ও একদিন ইংরাজী বক্তৃতা ও কয়েক দিন পারিবারিক উপাসনাদি হয়। লাহোর হইতে রাউলপিণ্ডী গমন করি। সেখানে একটি বাঙ্গালা বক্তৃতা ও একটি ইংরাজী বক্তৃতা হয়। তদনন্তর আবার লাহোরে ফিরিয়া আসি। লাহোর হইতে ১লা এপ্রিল আশ্রমের উৎসব করিয়া ৩রা এপ্রিল ইন্দোর অভিমুখে যাত্রা করি। ইন্দোরে দুই দিন ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। ইন্দোর হইতে বোম্বাই হইয়া মাঙ্গালোর যাত্রা করি। মাঙ্গালোর আসিয়া প্রায় ১৭ দিন অবস্থান করি। এখানে তিন দিন ইংরাজীতে বক্তৃতা করি দুই দিন ইংরাজীতে উপদেশ দিই। ইঁহাদের সমাজের constitution স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করি। সেখানে Mr. M. Venkeertappao-র বিবাহ দিয়া কালিকট যাত্রা করি। কালিকট পেঁৗছিয়া পাঁচ দিন থাকি। এখানে ইংরাজিতে দুইটি বক্তৃতা করি এবং সমাজে দুই দিন ইংরাজীতে উপদেশ দিই। এখানে ব্রাহ্মসমাজ মৃত। Theosophy জয়যুক্ত।

কালিকট হইতে কোইম্বারটুর আসি। এখানে ব্রাহ্মসমাজ মৃতপ্রায়। * * * কেবল গণেশনারায়ণ দেবল নামক একজন অনুরাগী ব্রাহ্ম আছেন—তিনিই আমাদিগকে আনেন। তাঁহার পরিবারে থাকিয়া প্রীত হইয়াছি। এখানে একদিন ইংরাজী বক্তৃতা হয়। দেবলের পরিবারে উপাসনা হয় তৎপরে আমরা চলিয়া আসি।

কোইম্বাটুর হইতে বাঙ্গালোরে আসিয়াছি। এখানে আমরা Dr. Ramswami Iyengwar-এর বাড়ী আছি। ইঁহাকে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করি. এবং পরলোকগত ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের দৌহিত্রী হিরণের সঙ্গে বিবাহ দিই। ইহারা সুখে ঘরকন্না করিতেছে, দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। * * * Northern Circus-এর ব্রাহ্মসমাজগুলি দেখিয়া ১লা জুলাই-এর পূর্ব্বে দেশে ফিরিব সংকল্প করিয়াছি।

এখানে আসিয়া দেখিতেছি প্রায় চারটি স্থানীয় সমাজ আছে কিন্তু প্রাণ নাই। * * * এখানে Ramkrishna Mission ও Theosophy খুব প্রবল। রামকৃষ্ণ মিশন-এর Secretary-র সহিত সেদিন কথা হইল। এখানে যোগীশ্বরানন্দ নামে একজন রামকৃষ্ণ মিশনের লোক আছে। সভ্যসংখ্যা একশতের অধিক। ইঁহাদের অনেকে রামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। Theosophist প্রায় ৮০ জন। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এত দুর্ব্বল।

সমুদয় দেশ ভ্রমণ করিয়া কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম—দেশের সর্ব্বত্রই এই Hindu Reaction-এর স্রোত প্রবাহিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছে। ইহারা লোকের এই সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে যে, ব্রাহ্মেরা অর্দ্ধেকের অধিক খৃষ্টীয়ান ও স্বজাতি ও স্বদেশের অনুরাগী নহে। সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, ব্রাহ্মেরা একটি praying body মাত্র হইয়া পড়িতেছেন, যেন দেশের ভদ্রাভদ্রের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মেরা দেশের ভদ্রাভদ্র চিন্তা হইতে যেন সরিয়া পড়িতেছেন। এই জন্য ব্রাহ্মগণ অবজ্ঞার তলে তলাইয়া যাইতেছেন।" রুগ্নদেহে সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসা বড় সহজ ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি ইংরাজী বাঙ্গালাতে বক্তৃতা দেওয়া। এই তাঁর শেষ দীর্ঘ প্রচারযাত্রা। তাঁর শরীর দিন দিন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল যে সে জন্য বারবার বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইতে লাগিল।

॥ একবিংশ অধ্যায় ॥

জীবনের শেষ অধ্যায়

১৯০৭ সাল হইতে শিবনাথের জীবনের কাহিনী তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস বসিয়াছিল। এই সময়ে Thiestic Conference-এর জন্য শিবনাথকে অত্যন্ত খাটিতে হইয়াছিল। এবারকার Thiestic Conference বড় জমাট হইয়াছিল।

শিবনাথের শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল সেইজন্য প্রায় প্রতি-বৎসর বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কোথাও না কোথাও যাইতে হইয়াছে। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, পর বৎসর মে মাসে আবার দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়াও তাঁর শরীর ভাল ছিল না। হঠাৎ দেশে পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, এবং দেশে যান। দেশে কয়দিন তাঁকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার ভিতর বাস করিতে হইয়াছিল—তার ফলে বালীগঞ্জের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ১৭ই জুন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হন। এই রোগে তাঁকে ৪।৫ মাস শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। বালীগঞ্জের বাড়ী হইতে চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য তাঁকে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভার বাড়ীতে আনা হয়। এই যে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়াছিলেন এই সময়ে বসুজায়া ও বসু পরিবারের সমুদায় লোক শিবনাথের যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত সংসারে বড় বিরল। শিবনাথের বন্ধুবান্ধব যে যেখানে ছিলেন, এই সময় তাঁর জন্য অর্থসাহায্য দ্বারা আন্তরিক টানের পরিচয় দিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে অযাচিত ভাবে শত শত টাকা আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় শিবনাথের মা তাঁর নিকট আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। যখন সকলে তাঁর প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাঁর জননী আশা ছাড়িয়া দেন নাই। তিনি জোর করিয়া বলিতেন, 'একি কখন হয়, আমি বেঁচে থাকতে আমার সবেধন ছেলে যেতে পারে কি? ও আমার নিশ্চয় বেঁচে উঠবে।" ওদিকে শিবনাথের পিতা হরানন্দ শর্ম্মা দেশে তিন দিন ধরিয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। স্বস্ত্যয়ন শেষে শিবনাথের তিন ভগিনী দেশ হইতে সেই জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেইদিন শিবনাথের রোগের বাড়াবাড়ি—রাত্রি আর কাটে না। বোনেরা স্বস্ত্যয়নের জল মৃতকল্প দাদার মুখের দিলেন। তার পর দিন হইতে রোগের শুভলক্ষণ দেখা দিল। শিবনাথের মাতাপিতার বিশ্বাস স্বস্ত্যয়নের জন্য পুত্রের রোগমুক্তি হইল। কিন্তু পিতামাতার আকুল প্রার্থনাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন তাহা কে অবিশ্বাস করিবে? দীর্ঘ পাঁচমাস শিবনাথ রোগশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। বসুজায়া তাঁর সমুদায় বাড়ীটি শিবনাথের জন্য ছাড়িয়া দিয়া নিজের শত সহস্র অসুবিধা অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। সাধে কি শিবনাথ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পরিবার পরিজন-দিগকে এত ভালবাসিতেন? এত ভালবাসা যত্ন আর কোথাও তিনি পান নাই, আপনার পুত্র কন্যার নিকটও নহে। লোকে আপনার পিতার জন্য যত না করে, সুবর্ণপ্রভা এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী লাবণ্যপ্রভা শিবনাথের জন্য তার অধিক করিতেন। শিবনাথের কোন প্রকার অভাব ইঁহাদের যত্নে অপূর্ণ থাকিত না। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সুবর্ণপ্রভা শিবনাথের জন্য নানাবিধ ফল ও সুপথ্য

জোগাইয়া আসিয়াছেন। এক না ফুরাইতে আবার আসিয়া উপস্থিত! আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পুত্রকন্যাগুলি শিবনাথের পরম আদরের ছিল। ডায়েরিতে কত স্থানে তাদের কথা কত লিখিযাছেন। লাবণ্যপ্রভার উপর তাঁর হৃদযের যে অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহা অতুলনীয়। ডায়েরিতে একস্থানে লিখিতেছেন ঃ—

"লাবণ্যপ্রভার ঋণ কি কখনও শুধিতে পারিব? আমাকে এরূপে কেহ কখনও ভালবাসে নাই। আমি বোধ হয এত ভাল আর কাহাকেও বাসি নাই। * * * প্রায় ২৪।২৫ বৎসর পূর্ব্বে লাবণ্যকে প্রথম দেখি। তৎপরে ১৮৮৭ হইতে বিশেষ সম্পর্ক হইযাছে, তদবধি ছায়ার ন্যায় আমার সংগে সংগেই আছেন, ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী, বন্ধুর ন্যায় হিতকারিণী, শিষ্যার ন্যায় অনুগামিনী আছেন। হায! আমি লাবণ্যের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিতে পারি না।" বাস্তবিক লাবণ্যপ্রভা পিতার ন্যায়, গুরুর ন্যায শিবনাথকে ভক্তি করিতেন। তাঁরই বিশেষ অনুরোধে শিবনাথ 'আত্মজীবনী' লিখিতে আবম্ভ করেন।

ঘটনার দিক দিয়া মানুষের জীবন দেখিলে—তাঁর ভিতরের অর্থ বোঝা যায় না। মানুষের জীবনের ভালবাসার অবলম্বন কি তাহাও বুঝিতে হয়—মানব জীবনের ইহাই হইল প্রকৃত অর্থ, গূঢ় তাৎপর্য্য। শিবনাথের আত্মজীবনীখানি বাঙ্গলা-ভাষার এক সম্পদ, লাবণ্যপ্রভার নির্ব্বন্ধাতিশয় ব্যতিরেকে এ রত্ন বাহির হইত কিনা সন্দেহ। শিবনাথের প্রতি লাবণ্যপ্রভার অসীম ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। শিবনাথের জীবন-চরিত লিখিবেন এরূপ তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হায়! তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হইল না। শিবনাথ চলিয়া গেলেন, লাবণ্যপ্রভা ত্বরায় তাঁর পদানুসরণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগের সময় বলিতেন, "আমি যাচ্ছি, দেখছ না আমার গুরু আমায় ডাকছেন, ঐ যে শাস্ত্রী মহাশয় আমায় ডাকছেন।" শিবনাথ আর কাহাকেও ডাকিলেন না, লাবণ্যপ্রভাকে ডাকিলেন, তিনি চলিয়া গেলেন!

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভুবনেশ্বরে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরি, উদয়গিরির নিকটে তাঁর বৈবাহিক কটকের সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন রাও মহাশয়ের একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে, শিবনাথ এই স্থানটি অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এখানে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন এমন সঙ্কল্পও তাঁর হৃদয়ে ছিল।

১৯০৮ এবং ১৯০৯, উপর্য্যুপরি দুই বৎসর দার্জ্জিলিং-এ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে মে মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং-এ Philosophers-Cottage-এ ছিলেন। দার্জ্জিলিং-এ থাকিতে তিনি সেখানকার স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রতি রবিবার উপাসনা করিতেন। সেবার ২৭এ সেপ্টেম্বর রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং-এ বসিয়াও শিবনাথ সেবাব্রত পালন করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই।

১৯১০ এবং ১৯১১ সালে কারসিয়াং গিয়াছিলেন। সেখান হইতে সর্ব্বদা দার্জ্জিলিং-এ আসিয়া স্থানীয় সমাজে উপাসনা করিতেন।

১৯১১ সালে আবার তাঁর প্রিয় স্থান ভুবনেশ্বরে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য যান। সেখানে একটি সাধনক্ষেত্র করিবার জন্য প্রাণে প্রবল বাসনা হয়। নির্জ্জনে প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়ায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইবেন এই তাঁর প্রাণের প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই। কে তাঁহাকে অর্থ দিয়া ক্ষুদ্র একটি কুটীর বাঁধিয়া দিবে? তিনি যে কপর্দ্দকশূন্য! ভুবনেশ্বরে থাকিতে বোম্বাই-এর দামোদরদাস গোবর্দ্ধনদাস তাঁর নামে পঁচিশ হাজার টাকার একখানি চেক পাঠাইয়াছিলেন। সেই চেকখানি পাইয়া লিখিতেছেন ঃ—

ভুবনেশ্বর, ২০শে অক্টোবর, ১৯১১।

"আমি ভাবিতেছিলাম যে পরের কাছে টাকা চাওয়ার দায়িত্ব আছে। আশ্রমে মানুষ ডাকিয়া টাকা তুলিলাম, অনেকে আসিল, প্রচুর অর্থব্যয় করিলাম, পরে সকলে সরিয়া পড়িল এরূপ করিয়া পরের টাকা ব্যবহার করিলে টাকার অসদ্ব্যবহার করা হয়। তাই মন আশ্রমের একটি বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, ইতিমধ্যে দুই তিন দিন হইল বোম্বাইয়ের দামোদরদাস গোবর্দ্ধনদাসের নিকট হইতে এক পঁচিশ হাজার টাকার cheque আসিয়া উপস্থিত। কি জন্য দিয়াছেন, তাহা এখনও লেখেন নাই। * * * এই পঁচিশ হাজার টাকা বিধাতা হাতে আনিয়া দিলেন কেন? তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি সর্ব্বদা তাঁকে বলি শিশুর ন্যায় আমার হাত তোমার হাতে দিয়া চলি। তাই হউক।"

কি আশ্চর্য্য পাঁচটি হাজার খরচ করিয়াই একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে পারিতেন, সেখানে অপরাপর সাধনার্থীও থাকিতে পারিতেন তবু স্বার্থের গন্ধ যাহাতে আছে এমন কাজে শিবনাথের প্রাণ সরিল না। বোম্বাই-এর দামোদরদাস গোবর্দ্ধনদাস তাঁহার হাতে ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ধরিয়া দিয়াছেন। শিবনাথ ইচ্ছা করিলে সাধনভজনের সহায়তা ও নির্জ্জন বাসের জন্য তাঁর কিছু অংশ ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু আপনার জন্য কপর্দ্দক-মাত্র ব্যয় করিতে কিছুতেই পারিলেন না। পরিশিষ্টে এই দানের আনুসঙ্গিক ঘটনাসকল বিবৃত হইবে।

ভুবনেশ্বরে বসিয়া অবশিষ্ট জীবন কি প্রকারে কাটাইবেন সেই চিন্তা সর্ব্বদাই করিতেন।

শিবনাথ আজীবন নিজের ধর্ম্মজীবনের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। ১৯০৭ সালে ১৭ই ফেব্রুয়ারি রবিবার হরিনাভি সমাজের উৎসবে গিয়াছিলেন। উপাসনার পূর্ব্বে এক নির্জ্জন উদ্যানে গিয়া চিন্তা করিতে করিতে নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন:--

দেবেন্দ্র কেশবশ্চৈব বৃদ্ধো রামতনুস্তথা।
রাজনারায়ণঃ সাধুঃ শিবচন্দ্রস্তথৈবচ॥
নবীনো বিনয়াধারদুর্গামোহন এবচ।
আনন্দমোহনো বন্ধু রষ্টৌতে গুরবে মম॥

সেই সময় হইতে গুরুবন্দনাটি তাঁর সাধনের অঙ্গ হয় এবং দিন দিন ইহার কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকে। এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বৃদ্ধ রামতনু লাহিড়ী, সাধু রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, নবীনচন্দ্র রায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু এই তাঁর ব্রাহ্মসমাজের অষ্ট গুরু। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া তিনি গুরুকীর্ত্তন উচ্চারণ করিতেন, ক্রমে একটি একটি করিয়া চরণ বাড়িতে লাগিল। অবশেষে এক সুদীর্ঘ গুরুবন্দনা রচিত হইল। তাহা এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

শিবনাথের গুরুকীর্ত্তন।

পিতুঃ পিতামহো বৃদ্ধো ন্যায়লঙ্কারসংজ্ঞিতঃ।
সিদ্ধঃ শান্তো রামজয়ো মগ্নো ধর্ম্মস্য সাধনে॥
পিতাচ মে হরানন্দ স্তেজস্বী সত্যবাক্ দৃঢ়ঃ।
জননী গৃহিণী দক্ষা সুব্রতা ধর্ম্মচারিনী॥
মাতামহী মম শ্যামা দয়াদ্রা সত্যধর্ম্মিনী।
মাতুলো দ্বারকানাথঃ স্বকর্ত্তব্যে দৃঢ়ব্রতঃ॥

ঈশ্বরো বিশ্ববাবন্ধুঃ কর্ম্মবীরঃ কৃপানিধিঃ।
প্রেমচন্দ্রঃ কবি মগ্নঃ কাব্যাস্বাদরসামৃতে॥
জয়নারায়ণঃ সাধু জ্ঞানসিন্ধো তিমিংগলঃ।
ধর্ম্মাত্মা দ্বারকানাথঃ কৃতধর্ম্মে দৃঢ়ব্রতঃ॥
প্রসন্নো বিনয়ী বিদ্বান ধীমান্ স্বজনবৎসলঃ
মহেশো ধার্ম্মিকো ধীরো গাম্ভীর্য্যে সাগরোপমঃ॥
মহেন্দ্রো দৃঢ়নিষ্ঠস্তু সত্যধর্ম্মে সনাতনে।
বাল্যে নেতা ধর্ম্মগুরু রুমেশো জন্মতঃ শুচিঃ॥
কালীনাথঃ শুদ্ধমতিরধ্যাত্মসাধনে রতঃ।
দেবেন্দ্রো ব্রহ্মবান্ ধীরো ব্রহ্মাস্বাদরসে রতঃ॥
আদেশানুগতো ভক্ত কেশবো ব্রহ্মসেবকঃ।
কেশবানুচরা ভক্তা যোগবৈরাগ্যভূষণাঃ॥
বিজয়াঘোরগোবাশ্চ কান্তিচন্দ্রোদয়স্তথা।
প্রকাশো বিনয়ীভূতঃ প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
বৃদ্ধো রামতনুঃ সত্যে সুপ্রতিষ্ঠঃ সুনির্ম্মলঃ।
রাজনারায়ণঃ সাধু ভৃঙ্গো ভক্তি-সুধা-রসে॥
শিবচন্দ্রো মিতাচার আত্মোন্নতিপরায়ণঃ।
নবীনো বিনয়াধারঃ শান্তঃ পরহিতব্রতঃ॥
কালীনারায়ণো মগ্নো ভাবধর্ম্মরসামৃতে।
নির্ভীকঃ সত্যসংকল্পে দুর্গামোহন এব চ॥
আনন্দমোহনো বন্ধু ব্রহ্মার্পিততনুঃ সুহৃৎ।
রামকৃষ্ণঃ শক্তিসিন্ধো মাতৃভাবসমন্বিতঃ॥
বিশ্বাসী বিনয়ী ভক্তো জর্জ্জশ্চ মুলারাত্মজঃ।
নুমানঃ সত্যসন্ধিৎসুঃ সদেবেকাশ্রয়ো ধিয়া॥
ঋষির্ভক্ত স্তত্ত্বদর্শী মার্টিনো জ্ঞানদীক্ষিতঃ।
কববংশোদ্ভবা ফ্রান্সেস্ প্রেমিকানন্দ সংপ্লুতা।
ধর্ম্মে দৃঢ়মতিঃ সাধ্বী সোফিয়া কলেটাত্মজা।
এতে মে গুরবঃ সর্ব্বে যোষিতঃ পুরুষাশ্চ যে॥
স্মৃত্বৈতান্ মহতীং শক্তিং লভেহং ধর্ম্মসাধনে॥

অর্থাৎ—পিতার পিতামহ ধর্ম্মসাধনে মগ্ন সিদ্ধ শান্ত রামজয় ন্যায়লঙ্কার; দৃঢ় সত্যবাক্ তেজস্বী পিতা হরানন্দ; সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী গৃহিণী দক্ষজননী, স্বকর্ত্তব্যে দৃঢ়ব্রত মাতুল দ্বারকানাথ, বিধবার বন্ধু কর্ম্মবীর কৃপানিধি ঈশ্বর (বিদ্যাসাগর); কাব্যরসিক প্রেমচন্দ্র; জ্ঞানসিন্ধু সাধু জয়নারায়ণ; ধর্ম্মাত্মা দৃঢ়ব্রত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, স্বজনবৎসল, বিদ্বান, বিনয়ী ধীমান প্রসন্ন (সর্ব্বাধিকারী); গাম্ভীর্য্যে সাগরের মত ধীর ধার্ম্মিক মহেশচন্দ্র (চৌধুরী); দৃঢ়নিষ্ঠ মহেন্দ্রলাল (সরকার); বাল্যের নেতা ধর্ম্মগুরু জন্ম শুচি উমেশচন্দ্র (দত্ত); অধ্যাত্ম সাধনে রত শুদ্ধমতি কালীনাথ (দত্ত); ব্রহ্মরস পানে রত ব্রহ্মবান দেবেন্দ্রনাথ (ঠাকুর); আদেশানুগত ভক্ত ব্রহ্মসেবক কেশবচন্দ্র (সেন); কেশবের অনুচর যোগ বৈরাগ্য ভূষিত, বিজয়, অঘোর, গৌরগোবিন্দ ও কান্তিচন্দ্র; প্রেমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বিনয়ী ভক্ত প্রকাশচন্দ্র (রায়); সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নির্ম্মল চরিত্র বৃদ্ধ রামতনু (লাহিড়ী); ভক্তিসুধারসের ভৃঙ্গ সাধু রাজনারায়ণ (বসু); আত্মোন্নতিপরায়ণ মিতাচারী শিবচন্দ্র (দেব); পরহিতব্রত শান্ত বিনয়ী নবীনচন্দ্র (রায়); ভাবধর্ম্ম রসামৃতে মগ্ন কালী-

নারায়ণ (গুপ্ত), সত্যসংকল্প নির্ভীক দুর্গামোহন, ব্রহ্মার্পিততনু বন্ধু আনন্দ-মোহন, মাতৃভাবসমন্বিত শক্তিসিদ্ধ রামকৃষ্ণ (পরমহংসদেব), বিশ্বাসী বিজয়ী ভক্ত জর্জ মুলার; প্রেমিকা ফ্রান্সেস কব; জ্ঞানদীক্ষিত তত্ত্বদর্শী ঋষি মার্টিনো; ধর্ম্মে দৃঢ়মতি সাধ্বী সোফিয়া কলেট; ইঁহারা সকলে আমার গুরু, ইঁহাদের স্মরণ করিয়া আমি ধর্ম্মসাধনে মহাশক্তি লাভ করি।

শিবনাথের গুরুভক্তি কি প্রকার ছিল পাঠক একবার স্মরণ করুন। গুরুপদে যাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছিলেন তাঁদের বৈচিত্র্য দেখুন। প্রপিতামহ, পিতা মাতা, মাতুল, মাতামহী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জয়নারায়ণ, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্রলাল সরকার, উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, সাধু অঘোরনাথ, প্রকাশচন্দ্র রায়, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, নবীনচন্দ্র রায়, কালীনারায়ণ গুপ্ত, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, জর্জ মুলার, ফ্রান্সেস কব, মার্টিনো, সোফিয়া কলেট ইঁহাদিগকে প্রতিদিন প্রাতে প্রণাম করিতেন। ধন্য উদারতা।

২৩এ মার্চ ১৯১৩ সালে ডায়েরিতে একটি ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছেন, বোধ হয় এই তাঁর শেষ কবিতা লেখা। এই তাঁর বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের কাছে শেষ নিবেদন।

ভুলচুক দুষ্প্রবৃত্তি, দুর্ম্মতি, দুষ্কৃতি,
যা করেছি, তা করেছি ফিরিবার নয়;
মাপ কর, মুছে ফেল, দেও হে বিস্মৃতি,
নব প্রেম, নব শক্তি দেও প্রেমময়।

নবপ্রেমে নবচক্ষু দেও প্রাণ খুলে
জগতে মানবে, জীবে পুন ভালবাসি,
বিগত পেয়েছি যত সব যাই ভুলে,
প্রেম দিয়ে, প্রেম পেয়ে প্রেমানন্দে ভাসি।

যা হয়েছে, তা হয়েছে কি হবে তা ভেবে
থাক, থাক, স্মৃতির কবরে;
এই ভেবে ধৈর্য্য ধরি, তুমি ত গো নেবে,
নিরাপদে অনুতপ্ত নরে।

এই ভেবে বাঁধি বুক, মুছি অশ্রুধারা,
নবপ্রেমে সঁপি গো আপনা;
থাক পিছে, যাহা ভেবে লাজে হই সারা,
নব আশা লভুক এ জনা।

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো, ফুরাইল খেলা
ভাঙ্গা চোরা কাজ পিছে ফেলে;
হাত পা বাঁধিয়া পড়ি এই শেষ বেলা,
তব পদে দিও না গো ঠেলে।

অবশিষ্ট দিনটুকু তোমার চরণে,
দেও দেও আপনা ধরিতে;
করিতে যা বাকি আছে, আনন্দিত মনে—
দেও দেও সেটুকু করিতে।

১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতার সাধনাশ্রম হইতে উঠিয়া ৭৮নং ল্যান্স-

ডাউন রোডে শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মজুমদারের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। সেখান হইতে ২২এ জুলাই ১৯১৪—২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে উঠিয়া যান। ১৯১৮ জুলাই পর্য্যন্ত সেখানে থাকেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ২৬নং বীডন ষ্ট্রীটে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

শশীবাবুর বাড়ী হইতে উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে ডায়েরিতে লিখিতেছেন ঃ—

কয়েক দিন হইতে মনে সাধনের একটা ভাব আসিয়াছে, তাহা এই অধ্যাত্ম যোগের আদর্শ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিশ্বাস ও নির্ভরের আদর্শ George Muller, এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ভাবের সঙ্গে সাধন করিতে হাফেজের ন্যায় ভক্তদিগের সরস ভাব। সরস ভাবটা আমরা কিছু কম সাধন করি। কিন্তু এই তিন ভাবের সমাবেশ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আদর্শ এই তিনটিই আমাকে সাধন করিতে হইবে। * * * সাধারণ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল লাগিতেছে না। এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্ব আমার। আমি কি এখনও এমন কিছু করিতে পারি, * * * আমার শরীরে সহিবে কিনা চিন্তার বিষয় কিন্ত অপর দিকে একটা কথা আছে সমাজের জন্য খাটিতে খাটিতে প্রাণ যায় যাক্।'

জীবনের এই শেষ অধ্যায়ের কথা আর কি বলিব? অতঃপর বাঁচিয়া থাকিয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কেবল দুর্ব্বল হস্তে পতাকা ধারণের চেষ্টা। শিবনাথের স্বাস্থ্য গিয়াছিল, দেহের বল গিয়াছিল, মস্তিষ্কের শক্তি গিয়াছিল, সকল শক্তিই গিয়াছিল, যায় নাই তাঁর ভালবাসিবার শক্তি, যায় নাই তাঁর ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা, যায় নাই তাঁর নবভক্তি, নবশক্তি লাভের আশা ও আকিঞ্চন। চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া, ধর্ম্মভাবের শুষ্কতা দেখিয়া তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইতেন, ঘন বিষাদে হৃদয় ডুবিয়া যাইত, কিন্তু এক দিনের জন্যও আশা ছাড়িয়া দেন নাই, বিষয় কিন্তু অপর দিকে একটা কথা আছে, সমাজের জন্য খাটিতে খাটিতে প্রাণ যায় ধরিতেন।

১৯১৬ সালে ৪ঠা জানুয়ারি, ডায়েরিতে লিখিতেছেন ঃ—

"যদি বিষাদের মধ্যে আনন্দ, নিরাশার মধ্যে আশা, দুর্ব্বলতার মধ্যে বল না পাইলাম তবে ভগবানের নাম কি করিলাম? আমার বিষাদের যথেষ্ট কারণ আছে। দারুণ সংগ্রামে জীবন গিয়াছে, মাতাপিতার সহিত সংগ্রাম, আত্মীয়স্বজনের সহিত সংগ্রাম, দুই স্ত্রী লইয়া গৃহ পরিবারে সংগ্রাম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের বন্ধুগণের সহিত সংগ্রাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের সহিত সমাজের কাজ লইয়া সংগ্রাম, এইরূপ নানা সংগ্রামে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শৈশব হইতে শারীরিক ধাতুসকল দুর্ব্বল ছিল, তাহা স্বত্বেও এত প্রকার সংগ্রামের মধ্যে যে বাঁচিয়া আছি এই ভগবানের কৃপা। তিনি যখন বাঁচাইয়া রাখিতেছেন, তখন এখনও আমার কাছে কিছু কিছু কাজ চান। তাহা দিবার জন্য আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎসাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। জীবনের অবশিষ্ট কাল প্রফুল্লিত চিত্ত, উৎসাহিত অন্তরে, প্রীতি ও আনন্দের সহিত, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, এবং ব্রাহ্ম-সমাজের ও জনসমাজের সেবাতে আপনাকে দেওয়া উচিত। দুর্ব্বলতা অপরাধ যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, তাহা পশ্চাতে রাখিয়া ভগবানের নব আদর্শে আত্ম-সমর্পণ করা কর্ত্তব্য—বিধাতা করুন, জীবনের এই শেষ পরিচ্ছেদে, এই সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে, এবং ধর্ম্মসাধন জীবন্ত, জাগ্রত ও ফলপ্রদ হয়।"

কি আশ্চর্য্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ভাব হৃদয়ে কাজ করিয়াছে। শেষ জীবনেও একদিনের জন্য ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁর শিথিল হয় নাই। তাঁর দৈনিক কার্য্য-সকল ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত ছিল। ভোরে ৫টায় উঠিয়া একাকী ভগবানের

নাম করিতেন, এই সময় স্বরচিত গুরুকীর্ত্তনটি আবৃত্তি করিতেন। তৎপরে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেন। শরীরে যতদিন শক্তি ছিল ভোরের ট্রামে গড়ের মাঠে গিয়া ইডেন উদ্যানে ঘুরিয়া আসিতেন। ঊষার সৌন্দর্য্য তিনি আজীবন প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতে ভালবাসিতেন। আর প্রাতঃভ্রমণের সময় কাহাকেও সঙ্গে লইতে চাহিতেন না। আমাকে বলিতেন, "আমি একা একা বেড়াইতে ভালবাসি. তখন অনেক চমৎকার ভাব প্রাণে আসে। কেউ সঙ্গে থাকিলে এ সুখটুকু পাই না।" শরীর যখন দুর্ব্বল হইল, চলিতে গেলে পড়িয়া যান তখনও প্রাতঃভ্রমণ ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যখন প্রাতঃভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিতেন. তখন তাঁর নাতিগণ নিদ্রা হইতে উঠিতেছেন। তার পর কিছু আহার করিয়া বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেন—যথাসময়ে স্নানাহার করিতেন। যতদিন দেহে কিছুমাত্র শক্তি ছিল বেড়াইয়া আসিবার সময় প্রায় অন্যান্য অসুস্থ পীড়িত শোকার্ত্ত বন্ধুদিগকে দেখিয়া আসিতেন। পিতৃদেব আজীবন শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্তপাত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া একদিনও আত্মতৃপ্তি লাভ করেন নাই। যখন তখন বলিতেন যে, "আমি মানুষকে ভালবাসিতে পারি না, কারও ঠিকমত খোঁজ খবর নিতে পারি না—আমার দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মসমাজের এত অনিষ্ট হচ্ছে।" একথা কেবল মুখে বলা নয়, কতদিন নিজের গালে ঠাস ঠাস করিয়া চড় মারিতেন "এই পাজী এই হতভাগার অপরাধে সব মাটী হল. আমাকে সকলে জুতো মার"—বলিয়া মস্তকের কেশ ছিঁড়িতেন। তাঁর এই আত্মনিন্দা আমাদের অসহ্য হইত। আমরা বলিতাম "তোমার দৃষ্টান্ত সিকি ভাগ পালন করলে ব্রাহ্মসমাজের লোক উদ্ধার হয়ে যেত তুমি যে লোকের বাড়ী বাড়ী খোঁজ নিয়ে বেড়াও এই দুর্ব্বল শরীরে, কই তোমার খোঁজ নিতে বড় কাউকে আসতে দেখি না ত? যত লোকের বাড়ী তুমি যাও তার অর্দ্ধেক লোক তোমার বাড়ী আসে না।' পিতৃদেব যখন ট্রামে উঠিতে পারিতেন না তখন বেড়াইতে যাইবার জন্য এত ব্যাকুলতা। হায়. যদি একবার কেহ তাঁকে বেড়াইয়া আনিবার জন্য গাড়ী দিতেন. আজ কত না আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেন। সুবর্ণপ্রভা তাঁর নিজের গাড়ী তাঁকে বেড়াইবার জন্য কিছুদিন দিয়াছিলেন তখন তাঁর কি আনন্দ! ১৩২৩ সালের ২৫শে চৈত্র ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়ের প্রাঙ্গণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় নরনারী বালক বালিকা উপস্থিত হইয়া আন্তরিক প্রীতি ভক্তি প্রকাশ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। এই সভায় তাঁকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। পরিশিষ্টে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। এই দিনে যেরূপ বিপুল জনতা হইয়াছিল, এমন কদাচ হয় নাই। শিবনাথ সেদিন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া প্রচুর আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই প্রকার নিরাকার, ভক্তির নিদর্শন দেখিয়া তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা (এখন যিনি স্বর্গবাসী) বলিয়াছিলেন. "এ কি ভক্তি দেখান? তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের কি সবই নিরাকার. এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বাসের জন্য কি এতগুলি লোক একখানি কুটীর বেঁধে দিতে পারলেন না—নচেৎ এক থলি টাকাও কি হাতে ধরে দিতে পারলেন না যে, বৃদ্ধ বয়সে আর সাংসারিক অভাবের ভাবনা এক দিনও ভাবতে না হয়। এমন সব অনুষ্ঠানে আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই. কি বলব ভগবান আমায় নির্ধন করে মুখ বন্ধ করে রেখেছেন।" আমি যখন তাঁর জামাতার এই উক্তি তাঁর কাছে বলিলাম তিনি হাসিয়া বলিলেন, "ফকীরের মত আছি. মরবও ফকীরের মত।" শিবনাথ কতবার বলিয়াছেন যে যীশু বলিয়াছেন, "শৃগালের গর্ত্ত আছে পাখীর বাসা আছে আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" হায়! একথা কি আমরা সহজে বুঝি যে যিনি যতটা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁর অধিকার ততদূর সুবিস্তৃত হয়। শিবনাথের পার্থিব

অর্থ দেওয়া হয় নাই, ভালই হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে !! অতি ঠিক কাজ! আমি আর একদিন তাঁর মুখে আর একটি কথা শুনিয়া উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাইয়াছিলাম। সে কথা ভুলিবার নয়। গোলোকমণি মৃত্যুর সময় তাঁর সারাজীবনের কষ্টসঞ্চিত, পুঁজি দুটি হাজার টাকা শিবনাথকে দিয়া যান। তিনি বেশ জানিতেন তাঁর পুত্রটি ফকির, অর্থের প্রতি মমতাশূন্য। জীবনে তিনি ব্যাঙ্কে টাকা কখন রাখেন নাই—তাঁকে যাহা দিবেন তৎপরদিন ব্যয় করিয়া বসিবেন। তবু এমনি তাঁর পুত্রের প্রতি টান যে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব আর কাহাকেও দিতে পারিলেন না। পুত্রকে দিয়া গেলেন। দুই হাজার টাকা পাইয়া শিবনাথের ভাবনা হইল সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যয় কি হইতে পারে। আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত মা'র প্রদত্ত দু হাজার টাকায় কি করি ?" আমি ত স্থূল সাংসারিক বুদ্ধিবিশিষ্ট, আমার প্রাণটা ত আর আমার বাবার মত তত বড় নয়, আমি মহাবিজ্ঞতা সহকারে গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "বাবা এ দুহাজার টাকা প্রিয়নাথকে দাও। প্রিয় বেচারী গরিব, আর তোমার বৌমা যে রকম পাকা গিন্নী আর হিসাবী, ইহার এক কড়াও অপব্যয় হবে না; ওদের ভারী উপকার হবে।" তিনি বলিলেন, "আমি মনে করেছি এ টাকাটা ব্রাহ্মসমাজে আমার মা'র নামে দান করব।" আমি প্রতিবাদ করিলাম, "না তা করো না, ঠাকুরমা ব্রাহ্মসমাজের উপর হাড়ে চটা ছিলেন, তাঁর আত্মার এ দানে তৃপ্তি নাই—তিনি ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে নাতির দরদ বেশী করতেন।" শিবনাথ এই কথার উত্তরে যাহা বলিলেন তাহা চিরস্মরণীয়। সে কথা আমি ভুলিতে পারি না—আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আমি যে আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মসমাজের পায় নিবেদন করে দিয়েছি, কেবল কি ঐ দুহাজার টাকা বাদ! আমার সব যে ব্রাহ্মসমাজের!" লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইল। হার মানিল আমার বিজ্ঞতা! হার মানিল আমার ক্ষুদ্রতা ও সাংসারিক বুদ্ধি! পিতৃদেবের বিরাট ত্যাগ কত বড় সেদিন বুঝিলাম।

॥ দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥

শেষ চিত্র

প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ! আমার কাহিনী ত শেষ হইতে চলিল। আমি অতি কঠিন কার্য্যে হাত দিয়াছি। এতটুকু প্রাণ লইয়া, সেই মহান হৃদয়ের ঠিক ছবিটি দেখাইতে পারিলাম না। পিতৃদেব "হিমাদ্রী কুসুম" লিখিয়া সেই পুস্তকখানি আমায় উৎসর্গ করেন, সেই কবিতা-পুস্তকে নায়কের অন্তিম দিন বর্ণনা করিয়া আমায় আদর করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমনি বুড়ো আমি যখন হব তখন তোমাদের কাঁধে হাত দিয়ে এমনি করে চলব।" সেই ছবি—

"ক্রমে তো বার্দ্ধক্য এল, পলিত স্থবির
হলো তারা; আয়ু-রবি যায় অস্তাচলে!
জীবনের সন্ধ্যাকালে, সেনাপতি বীর
পুত্রকন্যা স্কন্ধে ভর করি যথা চলে,
জীবন-সংগ্রাম অন্তে, আজ ধীর স্থির,

সেরূপ চলেছে দোঁহে, ধরিয়া সকলে
ধীরে ধীরে নামাইছে যেন মৃত্যু পানে,
শেষ শয্যা, সুখ শয্যা করিছে যতনে।
* * *
আর কি শুনিবে, দিন হয় অবসান
দিন দিন ভাঁটা পড়ে উভয় জীবনে।
প্রভু হে! এমনি ভাবে দেহ মন প্রাণ
এমনি সেবাতে দিয়ে, এমনি সাধনে,
রত থাকি, এইরূপে প্রেম সুধাপান
করি তব, অবসানে বিশ্বাস নয়নে
ওই সত্য জ্যোতি হেরি, সন্ধ্যা কি আসিবে;
জীবন তোমারি ক্রোড়ে অন্তে লুকাইবে!"

কবির প্রাণের বাসনা ভগবান পূর্ণ করিয়াছিলেন, শিবনাথের কবিতার ভিতর তাঁর হৃদয়খানি ফুটিয়া উঠিয়াছে বই ত আর কিছু নয়; ধর্ম্মযুদ্ধে বীর সেনাপতির অন্তিম ছবি কি আঁকিব। এত বড় কর্ম্মীর জীর্ণ দেহ যখন আর চলে না, মন তখনও সেবার জন্য ব্যাকুল; প্রাণের আপশোষ আর মেটে না। শরীর দিন দিন ক্ষীণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, তার উপর বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার করিয়া রক্তামাশয় ও জ্বরে ভুগিতেন। ১৯১৭ সালের প্রথমেও ডায়েরি লিখিতেন, তার পরে কিছু লেখা পর্য্যন্ত তাঁর পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তথাপি এমনই তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যে সেই অবস্থায়ও কেহ তাঁকে পত্র লিখিলে নিজ হস্তে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেন। হস্তের মুক্তাক্ষর দিন দিন অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। শারীরিক দুর্ব্বলতা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, দুই পা চলিতে টলিয়া পড়িতেন, কিন্তু তবু বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তাঁকে গৃহে ধরিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইত। দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, সকল শক্তিই খর্ব্ব হইতে লাগিল। ১৯১৮ সালের মধ্যভাগে তাঁকে ২৬নং বীডন ষ্ট্রীটে আনা হয়, সেইখানে আসিয়াও হেদুয়ার বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, এত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, দুই পা হাঁটিতেও টলিয়া পড়িতেন, তথাপি প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। ১৯১৯ সালের মাঘোৎসবের সময় প্রতিদিন প্রাতে মন্দিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তাঁকে কয়েক দিন প্রাতে উপাসনার সময় মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ১২ই মাঘের দিন প্রাতে মন্দিরে উপাসনায় গিয়াছিলেন, সেখান হইতে আসিয়া উপরে সিঁড়িতে উঠিতে যেই চেষ্টা করিবেন, অমনি গড়াইয়া একেবারে নীচে আসিয়া পড়িলেন, গুরুতর আঘাত পাইলেন। মাথা, নাক, হাত, পা, প্রভৃতি অনেক স্থান কাটিয়া গেল, ডান হাতের কব্জির হাড় সরিয়া গেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোথায়ও বেশী লাগিয়াছে কিনা, তাতে "বিশেষ কিছু নয়" বলিলেন, হাতে যে কিছু হইয়াছে তাহা বলিলেন না। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে দেখা গেল যে কব্জির হাড় ঈষৎ সরিয়াছে, তাই এতদিন হাত দিয়া আর কিছু ধরিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই 'হাতে ব্যথা" বলিতেন। কাপড় ছাড়াইবার সময় হাত ছুঁইতে দিতে চাহিতেন না। ১৯১৮ সালে অক্টোবর মাসে তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তাঁর কন্যাকে কয়েক লাইন অতি কষ্টে লিখিয়াছিলেন, সেই তাঁর শেষ পত্র। এই শোক তাঁর প্রাণে বড় গুরুতর লাগিয়াছিল, তিনি লাবণ্যপ্রভাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি কাহাকেও কিছু বলি না, চুপ করিয়া আছি, কিন্তু বিপিন আমায় মারিয়া গিয়াছে।" জামাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নিজে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃতকল্প হইলেন। সেইবারেও চিকিৎসকেরা জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

কন্যা হেমলতা টেলিগ্রাফ পাইয়া দারজ্জিলিং হইতে ছুটিয়া আসিলেন, তখন এক-মাসও হয় নাই, তিনি পতিকে হারাইয়াছেন। সদ্যবিধবা কন্যার পক্ষে মৃতকল্প পিতার সম্মুখীন হওয়াই এক কঠিন পরীক্ষা! তিনি আসিয়া দেখেন, পিতা চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছেন। আস্তে আস্তে আসিয়া তাঁর পার্শ্বে এক শয্যায় শুইয়া রহিলেন। শিবনাথ চক্ষু মেলিয়াই কন্যাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, বাক্য উচ্চারণ করিবার তাঁর ক্ষমতা নাই, ইসারায় বলিলেন, "হেম এসেছে আমার কাছে আসুক"—কন্যা গিয়া ধীর শান্তভাবে পিতার মুখের কাছে মুখ দিয়া পড়িলেন, পিতা দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে কন্যার গলা জড়াইবার চেষ্টা করিলেন। পরদিন প্রাতে কন্যাকে বিধবার বেশ পরিধান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হেম, হেম, বিপিনকে ভুলো না, ভুলো না, আজ তাঁর জন্য প্রার্থনা করো।" সেই অবস্থাযও তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁর মৃত জামাতার জন্য প্রার্থনা করা হইল। তবে তাঁর প্রাণে শান্তি! কন্যা হেমলতা এই সময় তিন মাস আসিয়া পিতার কাছে ছিলেন, যখন তখন শিশুর মত পবিত্র হাসি হাসিতে হাসিতে লাঠি ধরিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, কন্যার কাছে আসিয়া বসিতেন। এই তিন মাস তিনি বড় আনন্দ করিতেন। কন্যাকে বলিতেন, "দেখ তোমার জন্য কত লোক আমার বাড়ী আসে, তুমি গেলে আর কেউ আমার কাছে আসবে না।"

কন্যা—"সে কি বাবা! তোমাকে দেখতেই ত সকলে আসে। আমার জন্য আর কয়জন আসে?" তখন শিশুর মত দন্তহীন মুখে মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিতেন, "তাই নাকি, লোকে আমায় এত ভালবাসে?"

শেষ দশায় তাঁকে কেহ দেখিতে আসিলে অত্যন্ত সুখী হইতেন, কিন্তু অনেক-ক্ষণ বসিয়া কেহ কথা কহিলে বড় কাতর হইয়া পড়িতেন, এতটা মনঃসংযোগ কষ্টকর হইত। প্রতিদিন প্রাতে পারিবারিক উপাসনায় বসিতেন। কোন কোন দিন তিনি প্রার্থনা করিতেন। শেষ অবস্থায় দুটো কথা বলা পর্য্যন্ত ক্লান্তিজনক বোধ হইত। কিন্তু উপাসনা কি প্রার্থনার সময় একদিনও তাঁর কোন কথায় কিছুমাত্র ভ্রান্তি দেখা যাইত না। নূতন লোকদের প্রায় ভুলিয়া যাইতেন, কিন্তু পুরাতন পরিচয় যাঁদের সঙ্গে তাঁদের কখনো ভোলেন নাই। কন্যা হেমলতা যে দিন দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন, সেদিন পিতাকে প্রণাম করিয়া যখন বলিলেন, "বাবা! আবার আমি এসে তোমার কাছে থাকব।" তখন পিতা হাসিয়া বলিলেন, "আর কি আমি থাকব? বেঁচে থাকলে ত এসে থাকবে?" সেই কথাই ঠিক হইল। কন্যাকে বিদায় দিবার সময় শিশুর মত, "আমার মা! আমার মা, মা আমার" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখা যায় না। কি ভালই পিতা আমাকে বাসিতেন! জানি না আর কোন কন্যার ভাগ্যে এতখানি পিতৃস্নেহ মিলে কি না? অতি শৈশব কাল হইতে তিনি আমার জন্য অস্থির হইতেন, কি করিয়া আমাকে সুশিক্ষা দিবেন এই তাঁর ধ্যান জ্ঞান চিন্তা ছিল। একবার কোথায় রেলগাড়ীতে যাইতেছিলেন। সেখানে ছোট একটি বিদ্যালয়ের বালককে তার পিতা শিবনাথকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখছিস্ ঐ শিবনাথ শাস্ত্রী।" বালকটি নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "কোন্ শিবনাথ শাস্ত্রী?—হেমলতা দেবীর বাবা?" অর্থাৎ—সেই বালকটি হেমলতা দেবীর "ভারতবর্ষের ইতিহাস" পড়িত, তাই সে শিবনাথ শাস্ত্রীকে হেমলতা দেবীর বাবা বলিয়াই জানিত। শিবনাথ বাড়ীতে আসিয়া কন্যাকে সেই কথা বলিয়া কতই আনন্দ করিলেন। "এখন আমি তোমার বাবা বলে পরিচিত হব।" কন্যাকে বাড়ান তাঁর অভ্যাস ছিল। সংসারে সকল পিতামাতার মত শিবনাথেরও এ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা ছিল। নিজ কন্যার তিল পরিমাণ কিছু দেখিলে,

তিনি পর্ব্বতপ্রমাণ মনে করিতেন। মাতাপিতাকে মুগ্ধ করা সন্তানের পক্ষে কি কোন দিন কঠিন হইয়াছে? তাতে শিবনাথের মত প্রেমের জলধি যে পিতা! আশৈশব শিবনাথ আত্মহারা হইয়া ভালবাসিয়াছেন, সে প্রেমে কখনও ভাঁটা পড়ে নাই—মৃত্যুর সময়েও না।

১৯১৯ সালের মে মাসে হঠাৎ শিবনাথের রক্তামাশয় এবং জ্বর হইল। এই প্রকার রক্তামাশয় জ্বর তাঁর সর্ব্বদাই হইত কিন্তু এবার দুর্ব্বল শরীরে এই রোগের পর আর উত্থানশক্তি রহিল না। আমাশয় ৪৮ দিন পরে সারিয়া গেল বটে, কিন্তু আর উঠিয়া বসিতে পারিলেন না। শুইয়া থাকিতেন, তবুও এমন মাথা ঘুরিতে লাগিল যে চক্ষু মেলিয়া চাহিবার শক্তিও থাকিল না। চারি মাস বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া দিন যাইতে লাগিল। সর্ব্বদা ঘরের দ্বারগুলি খুলিয়া রাখিতে বলিতেন। একদিন ধরাধরি করিয়া ছাদে আরামকেদারায় বসান হইল। আকাশ দেখিয়া, সবুজ গাছ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া—ক্রমাগত "আঃ বাঁচিলাম! আঃ বাঁচিলাম!" বলিতে লাগিলেন। পত্নীকে অনেক সময় বলিতেন, "ও লক্ষ্মি! ও লক্ষ্মি! আমায় তুলে ধর না, আমায় বাহিরের আকাশ দেখাও না।" বিছানায় শুইয়া আকাশের নীলিমা একটু চক্ষে পড়িলে পরমতৃপ্তির সঙ্গে বলিয়া উঠিতেন, 'আঃ চক্ষু জুড়িয়ে গেল।" সেপ্টেম্বর মাস পড়িতে দুর্ব্বলতা আরও বাড়িল। মৃত্যুর পনর দিন পূর্ব্ব হইতে আহারে নিতান্ত অরুচি হইল। আহারে অরুচি কখনই ছিল না। আহার্য্য দেখিলে বিরক্ত হইতেন, অত্যন্ত কষ্টে, নিতান্ত অনিচ্ছায় আহার করিতেন। ২৮এ সেপ্টেম্বর কোন পীড়া নাই, জ্বর নাই, উপসর্গ নাই দীর্ঘ-শ্বাস পড়িতে লাগিল। চিকিৎসকেরা বুঝিতে পারিলেন না। কন্যা হেমলতাকে দারজ্জিলিং-এ কেহ সংবাদ দিল না। তার পরের দিনও তেমনি করিয়া কাটিল, কেবল জোরে জোরে নিঃশ্বাস! ২৯এ বৈকালে, লাবণ্যপ্রভা, শ্রীমতী সুবর্ণপ্রভা তাঁকে দেখিতে আসিলেন। তাঁদের সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইলেন। সুবর্ণপ্রভা আহার করিতে চাহিতেছিলেন না। তাঁকে বার বার ইঙ্গিত করিয়া খাইতে বলিলেন। তিনি আহার করিলেন দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। সেই মুমূর্ষু মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল! মৃত্যুর পূর্ব্বদিন হইতে যে আসিয়াছে যে ডাকিয়াছে, অমনি মধুর হাসি হাসিয়া সাড়া দিয়াছেন। কি প্রসন্নভাব! কি যে মিষ্ট হাসি! কথা কহিবার শক্তি নাই, কিছু করিবার শক্তি নাই, কেবল হাসি! সে হাসি যে দেখিয়াছে সে এ জীবনে ভুলিবে না। ২৯ সেপ্টেম্বর রাত্রে শ্বাসের কষ্ট বাড়িল, সেই সময় পত্নীর হাত লইয়া পুত্রবধূর হাতে দিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শক্তি নাই যে হাত দুখানি টানিয়া আনেন। তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া হাত পড়িয়া গেল। নীরবে অব্যক্ত ভাষায় পত্নীর ভার পুত্রবধূর হস্তে তুলিয়া দিলেন! জীবনের এই শেষ ভার, এই শেষ কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। মুক্ত আত্মার আর কোন ভার নাই—বন্ধন নাই। ৩০এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আজ শিবনাথের জীবনে শেষ সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শহরে বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িল, দলে দলে বন্ধুগণ, ভক্তগণ, শেষ দর্শনা-কাঙ্ক্ষী হইয়া গৃহে সমবেত হইলেন! বাড়ীতে লোক আর ধরে না। ক্রমে চক্ষুর পাতা বন্ধ হইয়া আসিল, ডাকিলে চক্ষু খুলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু চক্ষু আর খুলিতে পারিলেন না। প্রিয়জনদের ডাক কর্ণে গেল, মুখে হাসি ছড়াইয়া পড়িল, শয্যাপার্শ্বে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতে লাগিল। কাশীচন্দ্র ঘোষাল উপাসনা করিলেন। শিবনাথ প্রীতি নিঃশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে 'ও ব্রহ্ম!' বলিতে লাগিলেন। কণ্ঠে তখন ধ্বনি নাই, কেবল ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে! পত্নী মুখের কাছে কান পাতিয়া

শুনিলেন, অতি মৃদু 'ওঁ ব্রহ্ম' ধ্বনি। দুইবার নিঃশ্বাস ফেলিলেন—শান্তিবচন শুনিতে শুনিতে শিবনাথের পবিত্র আত্মা জীর্ণ দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া অনন্তে উড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময় শ্রীমতী সরোজিনী (স্বর্গীয় হরনাথ বসু মহাশয়ের নাতনী) সহসা দৈবশক্তির প্রেরণায় আবিষ্টের মত আকুলভাবে গাহিতে লাগিলেন—

পেয়েছি অভয় পদ আর ভয় কারে ?
আনন্দে চলেছি ভব পারাবার পারে।

সে গানে হাহাকার নাই—বিলাপ নাই চক্ষের জলে সকলের বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শয্যার দিকে সকলে চাহিয়া দেখেন যেন কোন যোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন। মুখশ্রী শান্ত, সুন্দর পবিত্র ও নির্মল। সেদিন কলিকাতা শহরে পূর্বে কেহ যাহা কখনও দেখে নাই—সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গেল। শিবনাথের দেহ সুসজ্জিত ও পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া যখন শ্মশান পথে মহাযাত্রা করিল তখন শত শত পুরুষ তার অনুগমন করিতেছিল—এবং মনস্বিনী নারী কয়জন পদব্রজে ভক্তিভাজন আচার্য্যের সঙ্গে চলিয়াছেন। মনস্বিনী কামিনী তার মধ্যে একজন। উচ্চকুলজাত নারীগণ কখন কি কোন মৃতদেহের সঙ্গে পদব্রজে শ্মশানে গিয়াছেন ? শিবনাথের রচিত সংগীত 'বলরে বলরে সবে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'—প্রভৃতি গান গাহিতে গাহিতে সকলে চলিলেন। পথের লোক যে দেখিল ভক্তিভরে করজোড়ে প্রণাম করিল। কে চলিয়াছে চিতাশয্যায় শয়ন করিতে? যিনি চলিয়াছেন তিনি যে সামান্য কেহ নহেন একথা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইল না। অপর কেহ নয়—দীন হীনের বন্ধু দরিদ্র শিবনাথ।

॥ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥

শিবনাথের চরিত্রের বিশেষত্ব

প্রত্যেক যন্ত্রের যেমন একটি মূল সুর থাকে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির একটি মূলভাব থাকে। সেইটি হইল সেই প্রকৃতির বিশেষত্ব, এবং সেই ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষণ। শিবনাথের প্রকৃতির মূল সুরটি কি ? এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই মনে হয়, সেইটি তাঁর হৃদয়শীলতা। মানবচিত্ত জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই ত্রিবিধ শক্তির আধার—এই তিনটি শক্তির কোন এক শক্তি ব্যক্তিবিশেষের ভিতর প্রবল দেখা যায়—কেহবা মস্তিষ্কপ্রধান, তাঁরা সংসারে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হন। কাহারও প্রেমের শক্তি অত্যন্ত গভীর তাঁরাই সংসারে মানব জাতির সুহৃদরূপে পূজিত হন—ইচ্ছাশক্তি প্রবল হইলে তাঁরা উদ্যোগী, কর্ম্মী পুরুষ বলিয়া খ্যাত হন। শিবনাথের চরিত্র অনুধ্যান করিলে এই ত্রিবিধ শক্তিরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্কের শক্তিতে তিনি হীন ছিলেন না, তাঁর রচিত পুস্তকাবলীর ভিতর তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের শক্তিতে অসাধারণ ছিলেন। এই হৃদয়শীলতাই তাঁকে উদ্যোগী এবং অক্লান্ত কর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার বল তাঁর চরিত্রের এক প্রধান বিশেষত্ব ছিল। যাহা করিবেন মনে করিতেন তাহা করিতে পারিতেন। দুর্বলের ভয়ে বা মৃদুস্বভাবে কোন কার্য্য করা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। শান্ত শিষ্ট উদ্যোগবিহীন লোক তিনি আদৌ দেখিতে পারিতেন

না। কতদিন বলিয়াছেন যে, "লোকে উদ্যোগী হইয়া বদমায়েসী করে, তাও সহ্য হয়; কিন্তু আধমরা, শান্তশিষ্ট, উদোগবিহীন লোক আমি সহ্য করিতে পারি না।" "যাহা করা কর্ত্তব্য তাহাই ভাল করিয়া কর" এই তাঁর মন্ত্র ছিল। ৪০ বৎসর বয়সে ইংরাজ জাতির নিয়ম নিষ্ঠা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। আজীবন নানাপ্রকার ব্রত, সাধনের উৎকর্ষতার জন্য গ্রহণ করিতেন, প্রাণপণে ব্রতরক্ষা করিয়া তবে ছাড়িতেন। এ সকল সাধনের কথা গোপন রাখিতেন। ডায়েরিতে দেখি কখনও অসিধারা ব্রত করিতেছেন, কখনও বিশেষ কোন শাস্ত্রপাঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—কেবল ব্রত গ্রহণ আর পালন। এই প্রকার সাধন-নিষ্ঠা তাঁর ইচ্ছাশক্তির পরিচায়ক। এই ইচ্ছাশক্তি তাঁর প্রকৃতি-নিহিত পুরুষকারেরই অঙ্গবিশেষ। আশৈশব সকল কার্য্যে তিনি ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে ভালবাসিতেন। পঠদ্দশায় গণিত তাঁর ভাল লাগিত না—তিনি জোর করিয়া সাহিত্য ছাড়িয়া গণিত লইয়া মগ্ন থাকিতেন। পরিণত বয়সে তিনি কথায় কথায় বলিতেন, "মনের কান মলিয়া ঠিক করিতে হইবে।" মনের উপর প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা তাঁর অভ্যাস ছিল। পুরুষের পুরুষকারকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন; সেই জন্য রাম-মোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও তাঁর নিজের পিতার উপর তাঁর হৃদ্গত একটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ভাব ছিল। এই তিন ব্যক্তির পুরুষকারের গল্প বলিতে বলিতে তিনি মুগ্ধ হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। উৎসাহে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। রামমোহন রায় বিলাত যাইবার সময় পুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "পুরুষ বাচ্চা কাঁদ কেন?" পুরুষ বাচ্চা কি প্রকারে হইতে হয় তাহা জানিতেন রামমোহন রায়। পুরুষ বাচ্চা ছিলেন বিদ্যাসাগর। শিবনাথের পিতা হরানন্দ, এবং হরানন্দের পুত্রটিও পুরুষবাচ্চার নমুনা ছিলেন। মহৎ চরিত্রে অনেক বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শিবনাথের চরিত্রও তার দৃষ্টান্তস্থল। তিনি আশৈশব অতিশয় স্নেহশীল ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। বাক্যে বা কার্য্যে কাহারও অন্তরে ব্যথা দিতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিতেন। অপরের মনোরঞ্জন করিতে বাল্যাবধি তাঁর একটা প্রয়াস ছিল সেই জন্য চিরদিনই সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁর সঙ্গ লোকের অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইত। এমন সদালাপী সুরসিক প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কে না ভালবাসিবে? আশৈশব মাতাপিতার অনুগত বাধ্য সন্তান ছিলেন। ধর্ম্মচেতনা যখন শিবনাথের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন তাঁর প্রকৃতি-নিহিত পুরুষকার জাগ্রত হইয়া উঠিল। মায়ার বন্ধন, জননীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, আত্মীয়স্বজনের নিন্দা দারিদ্র্যের কষাঘাত, কিছুতেই তাঁকে এক চুল টলাইতে পারিল না। সেই সময়ে পিতাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এ দেহে জীবন থাকিতে কাহারও অনুরোধে অথবা সমাজের ভয়ে আমার দ্বারা আর কোন প্রকার অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্ত্তব্য কার্য্যের নিকট লোকভয় নাই, গুরু বা বন্ধুদের অনুরোধ নাই এবং কালাকালের বিচার নাই।"

এই হইল জীবনে প্রথম পুরুষকারের দৃষ্টান্ত—তখন তাঁর বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। জনক জননীর মনে পাছে কোন ক্লেশ দিতে হয় ভাবিয়া যিনি কাতর হইতেন—তিনিই এমন নিদারুণ ক্লেশ জনক জননীর হৃদয়ে দিলেন, যাতে তাঁর নিজেরও হৃদয় ভেদ হইয়া গেল! কিন্তু তবু কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রাণের গভীর আকর্ষণ ছিল, তাঁকে ছাড়িতে তাঁর প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তথাপি ছাড়িতে পারিলেন—যে ব্যথা হৃদয়ে পাইয়াছিলেন, তাহা ভগবান ভিন্ন কে বুঝিবে? তারপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের সহিত কত মতভেদ হইয়াছে, কত তীব্র বাক্য শুনিয়া-

ছেন, কিন্তু কখনও কোন লোকের মুখের দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। সাধনাশ্রম যখন স্থাপন করিলেন আজীবনের বন্ধুগণ পর্য্যন্ত তীব্র কটাক্ষ করিলেন, অবিচার করিলেন, বাধা দিলেন, শিবনাথের পুরুষকার কোন দিন মরে নাই, তিনি বীরের মত একাকী দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতে ভীত হইতেন না। তাঁর জীবনের মন্ত্রই ছিল, "যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্ শুনে চলি তোমারি ডাক।" পুরুষকার ছিল শিবনাথের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। পুরুষকারের একটি বিশেষ লক্ষণ স্বাধীনতাপ্রিয়তা, তাহা ত শিবনাথের চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি বলিতে গেলে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হৃদয়শীলতা হইল শিবনাথের প্রকৃতির বিশেষত্ব। বাস্তবিকই শিবনাথের হৃদয় বস্তুটি অসাধারণ রকমের ছিল। ভালবাসিবার শক্তিতে তাঁকে পরাস্ত করিতে পারেন এমন ব্যক্তি সংসারে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস হইল, প্রেমের ইতিহাস। বাল্যকাল হইতে জননীকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছেন, ভক্তি করিয়াছেন, একদিনের জন্যও তাঁর মাতৃভক্তিতে ভাঁটা পড়ে নাই। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কথা বলিতে গিয়া তিনি ভাষা খুঁজিয়া পাইতেন না, এমনই তাঁর প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস হইত। সেই কথা বলিতে গিয়া নিজের জননীর মূর্ত্তিখানি তাঁর চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। মাতৃভক্তিতে যে-কেহ তাঁকে পরাস্ত করিতে পারে তাহা তিনি মানিতেন না। একুশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার সময় তিনি যে তাঁর পিসতুতো ভাইকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাতে এক জায়গায় লিখিয়াছেন ঃ—

"যদি কেহ বলেন যে আমার অপেক্ষা তাঁর পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি অধিক তাহা আমি স্বীকার করি না।" বাস্তবিক একথা অহঙ্কারের কথা নয়, শিবনাথের পক্ষে একথা যথার্থ ছিল। তৎপরে ভগ্নী উন্মাদিনীকে যে প্রকার ভালবাসিতেন, তার বর্ণনা পূর্ব্বেই করিয়াছি, কয়জন ভাই ছোট বোনকে এমন আত্মহারা হইয়া ভালবাসিতে পারে? তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিবার সময় উন্মাদিনী তাঁকে শালতীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। শিবনাথ লিখিতেছেন, "যখন সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল পাগ্গা দাদা, (অর্থাৎ পাগলা দাদা) আমার জন্য পুতুল এনো—তখন আমি কাঁদিয়া অধীর হইলাম। সে চলিয়া গেল আমার মনে হইল, আমার বুকের হাড় খুলিয়া লইয়া গেল।"

তখন শিবনাথের বয়স আট বৎসর। সেই ক্ষুদ্র বালকের প্রাণে বোনটির জন্য এমন গভীর ভালবাসা।

পঠদ্দশায় বন্ধু অনেক পাইয়াছিলেন, বন্ধুদের জননী ভগিনীদের প্রতি তাঁর প্রাণের কত ভালবাসা!

সতীর্থ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের পত্নী মহালক্ষ্মীর জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন এ সংসারে কয়জন অপরের জন্য এতটা ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে? এতটা আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে? এই মহালক্ষ্মীর প্রসঙ্গে শিবনাথের চরিত্রের আর এক বিশেষত্বের কথা বলি, সেইটি তাঁর নারীজাতির প্রতি গভীর সহানুভূতি ও প্রেম। এ স্থলে বিশেষ কোন নারী নয়, সমগ্র নারী জাতির কথাই বলিতেছি। নারীকে নারী বলিয়াই তিনি ভালবাসিতেন, চির জীবন তাঁর চরিত্রে এই বিশেষ ভাবটি দেখিয়াছি।

১৮৮৮ সনের ৯ই নবেম্বর বিলাত হইতে আসিবার সময় রোহিলা জাহাজে বসিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া লিখিতেছেন ঃ—

"আমি দেখিয়াছি আমার মনের উপর, স্ত্রীজাতির * * * এক প্রকার আকর্ষণ আছে। আমি তাদের সঙ্গে মিশিতে, কথা কহিতে, আমোদ প্রমোদ করিতে ভালবাসি।

* * * যাহাহউক এ কথাটা সত্য যে আমার মনের উপরে স্ত্রীজাতির কোমলতা, প্রেমিকতা, ও রূপের এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। * * * যদি সৌভাগ্যক্রমে এমন দুই একটি হৃদয় পাওয়া যায়, যাহা হইতে নিজের উন্নত ভাবসকলের সায় পাওয়া যায়, তবে সেখানে নিজের হৃদয় স্বভাবতঃ লৌকিকতার আবরণ ভেদ করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে ঠেকাঠেক করিতে চায়। ইহা স্বাভাবিক। পুরুষ ও রমণীর মধ্যে এই আত্মীয়তার গ্রন্থি বদ্ধ হইলে স্থলবিশেষে ও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ বোধ হইতে পারে; কিন্তু ইহাও সত্য যে এইরূপ আত্মীয়তা আমাদের মানব-জীবনের পরমান্নবিশেষ। সভ্য সমাজের লৌকিকতা ও বহিঃ প্রবলভাব আমাদিগকে হৃদয়ের তৃপ্তিপ্রদ আত্মীয়তার সুখ হইতে বঞ্চিত করিতেছে।"

শিবনাথ বলিতেন, "এ জগতে প্রেমের বড় দরকার।"—প্রেম প্রেম করিয়া তিনি পাগল হইতেন। আর বড়ই আশ্চর্য্যের কথা কেবল লিখিতেন আর বলিতেন যে, আমার প্রাণে যথেষ্ট প্রেম নাই। একি সেই সক্রেটিসের উক্তির মত? সক্রেটিস যেমন বলিয়াছিলেন যে, "আমি জানি আমার জ্ঞান অতি সামান্য; অন্য লোকের সঙ্গে প্রভেদ এই, তারা জানে না যে তারা অজ্ঞ, ভাবে খুব জ্ঞানী।" শিবনাথ ডায়েরিতে লিখিয়াছেন ঃ—

২২শে আগষ্ট বুধবার, লণ্ডন।

"বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র রায় আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, তোমার simplicity ও lovingness এই দুইটি গুণে তুমি সকলের প্রিয়। আমার simplicity কখনও কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় যায়, সেজন্য আমি সময়ে সময়ে লজ্জিত হইয়াছি।"

"আমার lovingness সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ। আমার প্রেমের শক্তি কম না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কাজ আরও কত হইত। আমার জননী, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি বালক বালিকা এবং কয়েকজন বন্ধু ভিন্ন এমন কেহই নাই, যার নাম স্মরণ হইলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার হয়, হৃদয় নিকটে যাইতে দেখিতে ও কাছে থাকিতে চায়।"

শিবনাথ প্রেমিক ছিলেন, তাই অনুভব করিতেন যে, তাঁর প্রাণে যথেষ্ট প্রেম নাই; তাঁর প্রেমের আদর্শ অতি উন্নত ছিল। তিনি বলিতেন, "প্রেম এমন স্বর্গীয় বস্তু যে, যে প্রাণে প্রবিষ্ট হইবে তাহাই পবিত্র হইয়া যাইবে। প্রেমের মধ্যে আবার মলিনতা কোথায়? প্রেম পবিত্রতার হাত ধরিয়া যায়।" এই প্রেমের কথা জীবন ভরিবা কত যে বলিয়াছেন কত যে লিখিয়াছেন তাহা আর বলিবার নয়।

১লা নবেম্বর ১৯০১ সালে ডায়েরিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"Beatrice-এর প্রতি Dante-এর যে প্রেম তাঁর বিষয় যখনই ভাবি তখনই মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। কিরূপ পবিত্রচিত্ততা হইলে এরূপ প্রেম এতদিন স্থির থাকিতে পারে? Dante ও Beatrice, August Compte ও Clobilde, John S. Mill ও Mrs. Taylor—এ সকল পবিত্র হৃদয়ের গভীর প্রেমের নিদর্শন। এরূপ ভাল যে বাসিতে পারে তার হৃদয় অতি পবিত্র।"

শিবনাথের হৃদয়ে কোন আদর্শই ক্ষুদ্র ছিল না, প্রেমের আদর্শও নহে। হৃদয়-শীলতার যে প্রধান লক্ষণ উদারতা ও মহাপ্রাণতা, তাহা তাঁর চরিত্রে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইত। তাঁর হৃদয়ের ত্রিসীমায় কোন প্রকার ক্ষুদ্র মলিন অভিসন্ধি স্থান পাইত না। হৃদয়ের বিশালতায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এই জন্য আজীবন কঠোর দারিদ্র্য ভোগ করিয়াও তিনি অর্থ সম্বন্ধে মমতাশূন্য ছিলেন,—মুক্তহস্তে নিজের যথাসর্ব্বস্ব অপরের জন্য ব্যয় করিতে তিলমাত্র দ্বিধা করিতেন না। অপরের

জন্য জামিন হইয়া শত শত টাকা দণ্ড দিয়াছেন, তার জন্য একবারও অনুতাপ করেন নাই। পরের টাকা আফিসের বাক্স হইতে চুরি গিয়াছে, তাহা নিজের ঋণ মনে করিয়া প্রসন্নচিত্তে পরিশোধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য ব্রাহ্ম বালকদিগের বাড়ীভাড়ার জন্য শত শত টাকা ঋণ শোধ দিয়াছেন। অপরের জন্য অন্যান্য কত ঋণ তিনি অম্লান বদনে শোধ দিয়াছেন। পরীক্ষকের বৃত্তিরূপে বহুদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর বিস্তর উপার্জ্জন করিতেন, সে টাকা আমি কখনও তাঁকে বাক্সে তুলিতে দেখি নাই। অর্থ আসিবার পূর্ব্বেই তাহা ব্যয় বলিয়া ধরা হইত। লক্ষ টাকা হাতে পড়িত না তাই, নতুবা লক্ষ টাকা পরের জন্য কপর্দ্দক না রাখিয়া দেওয়া তার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না। অর্থের প্রতি বিন্দুমাত্র লালসা তাঁর চিত্তকে কখন কলুষিত করে নাই। পার্থিব কোন বিষয়ের উপর যদি তাঁর লালসা থাকে তবে সে কবি-যশের উপর থাকিতে পারে, কারণ তাঁর কোন লেখা ভাল বলিলে তিনি আনন্দে গলিয়া যাইতেন। লেখকরূপে যশ তাঁর স্পৃহনীয় ছিল সন্দেহ নাই। আমার বেশ মনে পড়ে, আমি যখন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়িতাম, তখন একদিন তাঁর নিকট নিম্নলিখিত শ্লোকটি বুঝাইয়া লইবার জন্য গিয়াছিলাম।

> বিপদি ধৈর্য্যং মথাভ্যুদয়ে ক্ষমা।
> সদসি বাক্‌পটুতা, যুধি বিক্রমঃ।
> যশসি চাভিরুচি ব্যসনংশ্রুতৌ।
> প্রকৃতি সিদ্ধ মিদং হি মহাত্ম নাম।

এই কবিতাটি আমাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে এ জীবনে তাহা ভুলিতে পারিলাম না। বলিলেন, "সংস্কৃত ভাষার এই মহিমা, চারি লাইনের ভিতর বড় মনের এমন নিখুঁৎ ছবি আর হতেই পারে না—বিপদে ধৈর্য্য, সৌভাগ্যের দিনে ক্ষমাশীলতা, সভায় বাক্‌পটুতা (পরনিন্দায় ঘরের কোণে নয়), যুদ্ধে বিক্রম (দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে নয়), যশে অভিরুচি (ক্ষুদ্র সুখে নয়), শাস্ত্রচর্চ্চায় আসক্তি (নীচ আমোদে নয়)—এই হইল বড় মনের লক্ষণ!"

'যশসিচাভিরুচি' বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে মহৎ চিত্তের একটি মাত্র দুর্ব্বলতা আছে, তাহা যশস্পৃহা, অন্য দুর্ব্বলতা তাঁহাদিগের নাই। তখন বুঝিয়াছিলাম তিনিও সে দুর্ব্বলতার উপরে নহেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য এই যশলিপ্সাটুকুও তাঁকে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। জীবনে এই ত্যাগই মহাত্যাগ! তাঁর প্রকৃতির আর এক বিশেষত্ব ছিল তন্ময়তা—যখন যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন, তন্ময় হইয়া যাইতেন। অন্য কথা হৃদয়ে স্থান পাইত না। বাল্যকালে ইহার জন্য পিতার হস্তে কত নিগ্রহই না সহ্য করিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যখন যে বিষয়ে লিপ্ত হইতেন, তখন অন্য কোন কার্য্য অন্য কোন কথা হৃদয়ে স্থান পাইত না।

শিবনাথ ছিলেন ধর্ম্মগত প্রাণ। এই হৃদয়শীলতা হইতেই তাঁর আধ্যাত্মিকতার উৎপত্তি। প্রেমপ্রবণ প্রকৃতির পরিণামই হইল ভক্তি। প্রেমের কিছু প্রকৃতিগত আকারভেদ নাই। শৈশবের মাতৃপিতৃ ভক্তির পরিণাম হইল তাঁর ভগবৎ-ভক্তি। তিনি ভক্ত ছিলেন, প্রেমিকও ছিলেন। সেই সরস কোমল হৃদয়ে ভগবৎভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইবে তাতে আর বিচিত্র কি? প্রীতি যত ধারায় মানব হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, সকল ধারায় অতি স্বাভাবিক রূপে তাঁর হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সেই প্রেমের জলধিতে তাঁকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। স্বজনপ্রেম, স্বদেশ-প্রেম, বিশ্ব-

প্রেম, সকলই তাঁর বিশাল হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল। আজীবনের দুরন্ত শ্রমে তাঁর স্বাভাবিক দুর্ব্বল দেহ কঠিন রোগে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জীবনের শেষ চারিমাস শয্যায় উঠিয়া বসিবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না। এমন যে মস্তিষ্ক তার শক্তিও খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। সকল শক্তি যখন গিয়াছিল, তখনও ভালবাসিবার শক্তি যায় নাই, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়াছেন। শিবনাথের চরিত্রের মূল সুরটি এমনি করিয়া ধরা পড়িয়াছে।

॥ চতুর্বিংশ অধ্যায় ॥

সাধকরূপে—ধর্ম্মরাজ্যে

শুভক্ষণে ভারতের যুগসন্ধি স্থলে ঘোর অন্ধকারের ভিতর দীপ্তিময় নবসূর্য্যের ন্যায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উদিত হইয়াছিলেন। ইতিহাস বলিতেছে, ভারতের বর্ত্তমান যুগ ব্রিটিশ যুগ। আমরা বলি এখন ভারতবর্ষে রামমোহন-যুগ চলিয়াছে। ধর্ম্ম-জগতেও রামমোহন রায় এক যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। রামমোহন-যুগের প্রধান লক্ষণ হইল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন। এই যুগধর্ম্মে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ধর্ম্মভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। রামমোহন রায় এদেশে একমাত্র সত্যস্বরূপ, নিরাকার, চিন্ময়, পরব্রহ্মের মানসপূজা ঘোষণা করিলেন। তিনি উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ উদ্ধার করিয়া স্বদেশবাসীর নিকট প্রচার করিলেন। এ অমূল্য-নিধি ভারতেই ছিল, কিন্তু কেবল যদি তাহাই হইত ইহাকে যুগধর্ম্ম না বলিয়া সনাতনধর্ম্ম বলিতাম। অতীতের গৌরব যতই থাক্ বর্ত্তমান কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বিশেষ বিশেষ অভাবমোচনের জন্য এই যুগধর্ম্মের অভ্যুদয়। এই যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। যেমন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগতীর্থ, তেমনি ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাবের সঙ্গমস্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ এই যুগধর্ম্মের আবির্ভাব। উপনিষদের বাণী হইল, "নিজ নিজ আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন কর।" হিন্দুধর্ম্মে সামাজিক ভাবে ধর্ম্ম-সাধনের ব্যবস্থা নাই। যদি ধর্ম্মলাভ করিতে চাও সংসার হইতে উপরত হও।"—ইহা ত সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, "জনসমাজের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া ধর্ম্মসাধন কর।" ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, "জনসমাজের দিকে সম্মুখ ফিরিয়া ধর্ম্ম-সাধন কর।" প্রাচীন ধর্ম্ম বলিতেছে, "উপাস্য দেবতার সন্তোষ সাধনার্থ কিছু দিতে হইবে।" ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছে, "ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে কিছু করিতে হইবে।" প্রাচীন ধর্ম্ম বলিতেছে, "গুরু বা আচার্য্য তোমার হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে পারে।" ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বলিতেছে, "মুক্তি কেহ কাহাকে দিতে পারে না। ধর্ম্মতত্ত্ব প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে অন্বেষণ ও লাভ করিতে হইবে।" হিন্দুধর্ম্ম তাহাদিগকেই কোলে স্থান দিবেন, যারা সৌভাগ্যক্রমে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের সন্তানই ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছে, যে জাতির লোক হও না কেন—কি পুরুষ, কি নারী—যিনি ব্রহ্মকে চাহিবেন তিনিই ব্রাহ্ম! এই যে যুগধর্ম্ম ইহা সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিতে গিয়া রামমোহন রায়ের পুরুষকারের জ্ঞান প্রেম কর্ম্মশক্তি

ফুটিয়া উঠিল। এই ধর্ম্ম অন্তরের অন্তরে পালন করিতে গিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মযোগ সম্ভব হইল। এই ধর্ম্ম গৃহ পরিবারে, মানবসমাজে সাধন করিতে গিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নবভক্তি, নবশক্তি ও নবপ্রেম জাগ্রত হইল। এই ধর্ম্ম সমুদয় দেহ মন প্রাণ দিয়া আয়ত্ত করিতে গিয়া শিবনাথের জীবনের এই অপূর্ব্ব বিকাশ হইল। শিবনাথ এই যুগধর্ম্মের প্রকৃতিটি যেমন ঠিক বুঝিয়াছিলেন, যেমন ঠিক ধরিয়াছিলেন, এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ধরিতে দেখি নাই। তাঁরই মুখে শুনিয়াছি, এ যুগধর্ম্ম সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মভাবের ভিতর পরস্পরবিরোধী ভাবসকলের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। এখানে আমি তাঁর নিজের কথায় এই যুগধর্ম্মের সামঞ্জস্যের কথা বলিতেছি ঃ—

"এই যুগধর্ম্ম কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাবের সমাবেশ করিলে চলিবে না, আরও অনেকগুলি পরস্পরবিসম্বাদী ভাবের সমাবেশ প্রয়োজন। প্রথমে—জগতের ধর্ম্মসকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নীতিপ্রধান ও অপর কতকগুলি ভাবপ্রধান। য়িহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নীতিপ্রধান ভাব একদিকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা ও ভাবপ্রবণতা অপর দিক। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস সকলের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই যে, আত্মা আসক্তিহীন হইয়া সমুদায় অনিত্য বিষয়কে বর্জ্জন করিয়া নিত্য ব্যস্ত যে পরমাত্মা তাঁহাতে স্থিতি করিবে—ইহাব নাম মুক্তি। ও-দিকে য়িহুদী ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবহুলতা, নিয়মাধিক্য, কঠোর নীতিপরায়ণতার মধ্যে প্রেম ও আত্মসমর্পণের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম মহাবিপ্লব সাধন কবিয়াছেন। যুগধর্ম্মে এই উভয়ের সমাবেশ চাই—ভাবুকতা ও নীতি উভয়েরই সংমিশ্রণ চাই। নীতিহীন ভাবুকতা, ও ভাবুকতাহীন নীতি উভয়ই বর্জ্জন করা চাই।

"দ্বিতীয়তঃ—যুগধর্ম্মে আর দুইটি পরস্পরবিসম্বাদী ভাবের সমাবেশ আবশ্যক। তাহা সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা।

"তৃতীয়তঃ—সাধুভক্তি ও স্বাধীনতার ন্যায় দুইটি বিসম্বাদী ভাব আছে—তাহা সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি। সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি উভয় তুল্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হওয়া চাই—ভাবের তরঙ্গও চাই—চিন্তার গভীরতাও চাই। নির্জ্জন ও সজন সাধন দুই-এর প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই!

"চতুর্থতঃ—আর একটি বিষয়ে পরস্পরবিরোধী ভাবের সমাবেশ আবশ্যক, তাহা ভূত ও বর্ত্তমানের মিলন। প্রাচীনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা অস্বাভাবিক স্থিতিশীলতার কারণ হইলেও আমরা কি প্রাচীনকে বিস্মৃত হইয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারি? প্রাচীন হইতে বর্ত্তমানকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না। সুতরাং প্রাচীনের প্রতি সমুচিত আস্থা ধর্ম্মজীবনের প্রধান পরিপোষক। অতএব যুগধর্ম্ম ভূতকালের ন্যায় বর্ত্তমানকেও অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত আলিঙ্গন করিবে। বর্ত্তমানকে বিধাতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে। সর্ব্ববিধ মানবীয় উন্নতির মধ্যে আপনাকে সোৎসাহে নিক্ষেপ করিবে—সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে সহায় হইবে, পরাবিদ্যার ন্যায় অপরাবিদ্যাকেও আদর করিবে। বলিতে কি অপরাবিদ্যার প্রভেদ ঘুচাইয়া দিবে, সকল বিদ্যাকেই পরাবিদ্যার চক্ষে দেখিবে। বর্ত্তমানকেই যে কেবল আগ্রহের সহিত ধরিবে তাহা নহে—আশার বাসস্থান ভবিষ্যতে—আশাকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবে। উচ্চ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করাই জীবন। বিশ্বাসীর মনের যে এই আশা ইহা যুগধর্ম্মের মধ্যে প্রধান শক্তিরূপে বাস করিবে।"

শিবনাথ যে ভাবে যুগধর্ম্মকে বুঝিয়াছিলেন ঠিক তাঁর মুখের কথায় এইখানে

তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম। এই যে যুগধর্ম্মের উন্নত আদর্শ তাহা হইতে তিনি এক চুলও ভ্রষ্ট হন নাই। ধর্ম্মমত এবং ধর্ম্মজীবনে প্রভেদ অনেক। ধর্ম্মের কার্য্য গ্রহণ করা--জ্ঞানের কার্য্য জীবনে প্রতিপালন করা, অনুরাগ প্রেম ও শক্তির কর্ম্ম। আদর্শ ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য ধর্ম্মসাধনায় তাঁর হৃদয়শীলতা এবং প্রতিজ্ঞা বল বা পুরুষকার তাঁর সহায় হইয়াছিল। জ্ঞানের আলোকে সত্যদর্শন করিয়াছিলেন, প্রেম এবং অনুরাগের সহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহা সাধন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ছিলেন শিবনাথের নিকট পুরুষকার ও মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ! রামমোহনের স্বাধীনতা-প্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম, হৃদয়ের বিশালতা শিবনাথ সমগ্র প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে যে-কেহ এদেশে জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁকে রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেই হইবে।

রামমোহন একমাত্র পরব্রহ্মের মানসপূজা ঘোষণা করিয়া গেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই পূজাকে আত্মার অন্নজল বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সামাজিক সংস্কারের দিকে তিনি গেলেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশচন্দ্র বলিলেন, "চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে তাঁর উপাসনা করিতে হইবে। ধর্ম্মের ক্ষেত্র পরিবার ও সমাজ। হিন্দু-ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সাধনের ধর্ম্ম।" ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করিয়া তাকে সামাজিকধর্ম্ম করিলেন। এই ভাবটি কেশবচন্দ্র শিবনাথের ভিতর আশ্চর্যরূপে সংক্রামিত করিয়া দিয়াছেন। শিবনাথের ভিতর রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব বড় সামান্য কার্য্য করে নাই। কিন্তু শিবনাথের ধর্ম্মজীবনের ভিতর যেরূপ আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কাহারও ভিতর দেখি নাই। রামমোহনের হৃদয়ের বিশালতা পুরুষকার স্বাধীনতাপ্রিয়তার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও কবিত্ব, তাঁর হৃদয়ে বর্ত্তিয়াছিল। রামমোহন জ্ঞানী ছিলেন, ভক্ত ছিলেন না; শিবনাথ ভক্ত হইলেন। মহর্ষি ভাবুক কবি ছিলেন, সংস্কারক ছিলেন না, বক্তা ছিলেন না; শিবনাথ বক্তা হইলেন, সংস্কারক দলের অগ্রণী হইলেন। এক্ষেত্রে তিনি কেশবচন্দ্রকেও ছাড়াইয়া গেলেন। মহর্ষি চিহ্নধারী সন্ন্যাসের একান্ত বিরোধী ছিলেন। শিবনাথের কখনও ভক্তের সাজ পরিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। মহর্ষি যেমন সহজ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন--শিবনাথও তাহাই।

তিনি প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের দিকে কখন যান নাই। মহর্ষি যেমন বলিয়াছিলেন, আমি কম্ত টম্ত করি না।" তেমনি শিবনাথও কখনও কম্ত টম্ত করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের একদল লোক বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, "শাস্ত্রী ধর্ম্ম-জীবনের গভীরতা কি জানেন, ধ্যান ধারণা কখন করেন নাই।" ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যদি ভগবানের সহিত প্রেমযোগে যুক্ত থাকা হয়, তবে তাঁর চাইতে বড় যোগী, বড় সাধক ব্রাহ্মসমাজে কয়জন ছিলেন? ইংলণ্ডে প্রবাসকালে তাঁর ডায়েরি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ একবার দেখুন, তাঁর ধর্ম্মভাব কিরূপ ছিল।

"যোগের গম্ভীরতা ও ভক্তির উন্মাদনা এই দুইটি আমাদের দেশীয় ভাব। এই দুইটিকে একেবারে ভগ্ন হইতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই দুইটিকে প্রধান হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, তাতে মানবকে জগৎ হিতৈষণা হইতে দূরে লইয়া যাইবে। চারিদিকে দিন দিন সভ্যজগতের চিন্তা ও ভাবের যেরূপ বিকাশ দেখিতেছি, ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ আক্রমণ ও বীতশ্রদ্ধা দেখিতেছি, মানব-হিতৈষণার প্রতি যেরূপ প্রখর দৃষ্টি দেখিতেছি—তাতে যে ধর্ম্মসম্প্রদায় এখন মানব-হিতৈষণা হইতে দূরে পড়িবে

ও স্বার্থপর ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইবে, তার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাহা ঘৃণার সহিত এক কোণে পরিত্যক্ত হইবে।"

আবার :—

"মনুষ্য সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষের সুখ দুঃখ ভুলিয়া যে ঈশ্বর-প্রীতি, তাহা আমার ভাল লাগে না। যেন অস্বাভাবিক ও স্বার্থপর বলিয়া বোধ হয়। তাতে আনন্দ হয় না। এমন একালসেঁড়ে ধর্ম্মভাব আমরা ভারতবর্ষে অনেক দেখিয়াছি, যে মানুষকে ভালবাসে না, মানুষের সুখ দুঃখের প্রতি যার দৃষ্টি নাই, লক্ষ লক্ষ নরনারীব দুর্গতি, অজ্ঞতা, পাপ ও ক্লেশ যার প্রাণকে ব্যথা দেয় না, সে দুঃখ দূর করিবার জন্য যার কিছু করিবার ইচ্ছা হয় না, সে ঈশ্বরকে প্রিয়তম, প্রাণের প্রাণ প্রভৃতি যাই বলুক না কেন তাতে আমার মন ভিজে না।"

বিলাতের ডায়েবি। ২৩শে জুলাই, ১৮৮৮

"পার্কারের প্রার্থনাগুলি আর এক কারণে আমার বড় ভাল লাগে। আমি ইহার মধ্যে পার্কারের যে ছবি পাই তাহা আমার হৃদয়ের অনুরূপ। জড়জগতে, প্রাণীরাজ্যে ও মানব-রাজ্যে, প্রভু পরমেশ্বরের যে করুণা তাহা আমি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। জগতের ধনধান্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, ঊষার আলোকে, শরতের সুনীল গগনে, বসন্তের কোমল পুষ্পদলে তাঁর প্রেম বড়ই অনুভব করি। পশু-পক্ষীর বিশেষতঃ পক্ষীর নির্দ্দোষ শান্তিপূর্ণ আনন্দে আমি সেই আনন্দদায়িনী বিশ্বজননীকে বড়ই দেখিতে পাই। আমি নির্জ্জনে বসিয়া যখন তরুলতার শোভা দেখি, তরুশাখাতে পাখীদের নৃত্য ও প্রেমালাপ দেখি, আমার মন আনন্দে অধীর হইয়া যায়। আমি এরূপ অবস্থা কতবার অনুভব করিয়াছি যেন তাঁর প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া জগতকে প্লাবিত করিতেছে।"

এই সকল চিন্তা কি ভগবানের সহিত যুক্ত আত্মার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি নহে ?

আবার লিখিতেছেন :—

"আমবা ভাবুক ও কল্পনা-প্রিয়। আমাদের মন নির্দ্দিষ্ট রেখাব মধ্যে থাকিতে ভালবাসে না। নির্দ্দেশবিহীন চিত্ত, নির্দ্দেশবিহীন ভাব, আমাদের ভাল লাগে। এই ইংরাজ জাতির ভাব বিপরীত। ইহারা reality চায়। ভাবুকতা ইহাদের প্রকৃতিতে নাই। আমাদের ভাবুক প্রকৃতিতে কতকটা unreality থাকিয়া যায়। অর্থাৎ—আমরা ভাবের স্রোতে যতদূর যাই—এবং ভাবের পক্ষ ধরিয়া যত উচ্চে উঠি, আমাদের জীবন তত উচ্চে যায় না। আমার মধ্যে এই ভাবুকতা রহিয়াছে।"

১৪ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, ১৮৮৮

"জগদীশ্বর সকলকে এক কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। কেহ কেহ খনির গর্ত্তের মধ্যে খুঁজিবেন, কেহ কেহ খনির গভীর গর্ত্তের মধ্যে খুঁড়িবেন। কেহ কেহ পণ্যদ্রব্য মাথায় করিয়া লোকের দ্বারে বহন করিবেন। এমন সময় ছিল যখন আমি কেবল ভাবুক-কবি ছিলাম, কাজকে ঘৃণা করিতাম। চিন্তা ও ভাবের স্রোতে ভাসিতে ভালবাসিতাম। কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। বিগত দশ বৎসর কোথা দিয়া গিয়াছে—কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

শিবনাথের ডায়েরি এক অপূর্ব্ব জিনিস! আশা আছে তাহা একদিন সকলে দেখিবে।

এখন ব্যক্তিগত ভাবে কি করিয়া নিজ জীবনে নিজ পরিবারে ধর্ম্মসাধন করিয়াছিলেন—তার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

শিবনাথের জীবনের কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, দ্বিতীয় বার বিবাহের

পর মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। মনের যাতনায় অধীর হইয়া তিনি অতি স্বাভাবিক রূপে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন। অতি স্বাভাবিক ভাবে এই প্রার্থনা তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হয়। প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হইল। কোন গুরু, কোন বন্ধুর উপদেশ বা সহায়তায় তিনি এভাব লাভ করেন নাই। বড় আশ্চর্য্যের কথা, কে তাঁর হৃদয়ে এই কাতর প্রার্থনা জাগ্রত করিল; প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কোথা হইতে বল ও শক্তির আবির্ভাব হইল; শিবনাথ বলিয়াছেন, তখন হইতে ভগবান তাঁকে আদেশ করিতেন, তিনি তার অন্যথা করিতে পারিতেন না। ঈশ্বরের মুখ চাহিয়াই ভাসিয়াছিলেন, ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া ভাসিবার অপূর্ব্ব ফল ফলিল। ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম্মও তাকে রক্ষা করেন একথা কি মিথ্যা? কেশবচন্দ্র শিবনাথকে ব্রাহ্মসমাজে আনেন নাই—তিনি সেই নবজীবনপ্রাপ্ত, ব্রহ্মার্পিত জীবনটিকে ভগবানের সেবার জন্য ডাকিয়া লইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বাণী শিবনাথের জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিল। কেশবচন্দ্রের জীবনবেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা শিবনাথের প্রাণের কথা। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ন্যায় ঘন বিষাদে মগ্ন হইয়া শিবনাথ ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মানন্দের ন্যায় শিবনাথ প্রার্থনাকে ধর্ম্মজীবনের সম্বল করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র জীবনবেদে লিখিতেছেন ঃ—

"আমার জীবন-বেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই—ধর্ম্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু ও সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্ম্মজীবনের সে উষাকালে প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, এই ভাব এই শব্দ হৃদয়ের ভিতর উত্থিত হইল।" শিবনাথ ২১ বৎসর বয়সে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছেন—"সেই ঘোর মনস্তর্পার সময় আপনা হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম।"

"প্রার্থনাই আমার জীবনের পরম সম্বল। আমি ইহাকেই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়াছি—এবং ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আছি।"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনবেদে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার কথা লিখিয়াছেন। শিবনাথও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁর জীবনও অগ্নিময় জীবন ছিল। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে অগ্নিপরীক্ষায় পার হইয়া তিনি অগ্নিময় হইয়া গিয়াছিলেন। সে আগুনে বিষয় সুখ, যশস্পৃহা, ধন মান পদসম্ভ্রম সবই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। শিবনাথের বাক্য, কার্য্য, উপদেশ, বক্তৃতা হৃদয়ের এই প্রচণ্ড অগ্নি উদ্গীরণ করিত। তিনি ত আর ডিমসথিনিসের ন্যায় মুখে প্রস্তরখণ্ড দিয়া বক্তৃতা করিতে শেখেন নাই; আমাদের দেশে বাণী-বিদ্যাশিক্ষার কোন বিদ্যালয় নাই। তিনি যে এমন অগ্নিময় বক্তৃতাসকল দিতেন, তাঁর যে অসাধারণ বাগ্মীতা শক্তি খুলিয়া গেল, তাহা কেবল হৃদয়ের এই প্রচণ্ড অগ্নির গুণে।

শিবনাথ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, কিন্তু তিনি কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে বাইবেলকে ভালবাসিতে শিক্ষা করেন—চিরদিন বাইবেল পাঠে তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল।

এখন সাধকরূপে তাঁর নিভৃত হৃদয়খানি দেখিতে চেষ্টা করি। আমি সে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কোথায় পাইব—যে সে চক্ষুতে তাঁর অধ্যাত্মরূপ দর্শন করি। দার্শনিকের চক্ষুও পাই নাই যে, বিশ্লেষণ করিয়া সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইব। তবে তিনি যে অক্ষয় পদ পাইয়াছিলেন তাতে আর সংশয় করি না। একথা বলা বাহুল্য যে, ধর্ম্মজীবনের উষাকাল হইতে দৈনিক উপাসনা আত্মার অন্নজল বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপাসনা সরস না হইলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। ভাগ্যে তাঁর ডায়েরি ছিল, নয় ত এই নিভৃত হৃদয়ের গোপন কথাগুলি আজ কেই বা জানিত? পিতৃদেব ক্ষমা করুন, আমি তাঁর প্রাণের নিভৃত প্রদেশে লুক্কাইত কথাগুলি আজ বাহির করিয়া আনিলাম।

২৩শে জুন, শনিবার ১৮৮৮

গতকল্য অবধি সত্যস্বরূপ আমার হৃদয়কে উজ্জ্বল রূপে অধিকার করিতে-ছেন।"

২০শে জুলাই, শুক্রবার ১৮৮৮

"আজ কেন আমার মন অস্থির হইতেছে? পড়িতে যাই মন বসে না, প্রাণ যেন কি শুনিতে চাহিতেছে, কি দেখিতে চাহিতেছে, যেন কি বলিতে চাহিতেছে। প্রাণের মধ্যে অবসাদ প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রাতে ভাল উপাসনা হয় নাই বলিয়াই কি এরূপ হইতেছে? দুপরবেলাও আর একবার প্রভুকে স্মরণ করিয়াছি। আত্মাকে কেন এত একাকী মনে হইতেছে? সময়ে সময়ে এরূপ অস্থিরতা অনুভব করিয়াছি—এসময়ে কিছু ভাল লাগে না। মন ছুটিয়া বেড়ায়, উদাস হইতে চায়। আজ ঢাকার গুপ্ত মহাশয়ের গান মনে হইতেছে-

'ওগো দরদি, আমার মন কেন উদাসী হতে চায়।
ডাক গো, হাক গো না মানে আপনি আপনি চলে যায়।

আজ আমি প্রভুর প্রেমমুখ যেন উজ্জ্বল দেখিতেছি না।" এই গান বাঁধিলেন—

জানলাম না মা বুঝলাম না মা।
এ তোর খেলা কেমন ধারা?
থাক থাক যাও মা কোথায়,
করে আমায় দিশাহারা।

আমি আঁচল ধরা ছেলে, যেতে হব কি মা একলা ফেলে
মায়ের মুখ না দেখতে পেলে ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা।
আমি যদি ধরি জোরে ঠেলিতে কি পার মোরে,
ছেলের জোরে মায়ে হারে, চিরদিন ত আছে ধরা।
যদি বল কি গুণ আছে, বাঁধা রবে আমার কাছে,
তুমি আপনার প্রেমে আপনি বাঁধা—
ওগো ও আমার মা চমৎকারা।
জনম দিয়েছ যারে, কাছে ত থাকিতেই হবে
শিবের গতি হবেই হবে, এভাবে পাবে কিনারা।

আর দেখিতেছি গভীর আত্মানুসন্ধান, আত্মপরীক্ষা নিজের অন্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিসন্ধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কি search light নিজের প্রাণের অন্তঃস্থলে প্রতিদিন ফেলিতেন। তার প্রমাণ ডায়েরির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। তারপর মন্ত্র জপ, ব্রত ধারণ, গুরুকীর্ত্তন এ সকল নিজ উপাসনার অঙ্গ ছিল। কখন কি মন্ত্র জপ করিতেন তার কথাও দেখি, তারপর ব্রত ধারণ—সর্ব্বদাই নানাবিধ ব্রত গ্রহণ করিতেন—অনেক দিন অসিধারার ব্রত করিয়াছিলেন। গুরুকীর্ত্তনের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এসকল কথা কত আর বলিব, বলিবার নয়। তিনি এসকল সাধনের কথা চিরদিন গোপন রাখিয়াছিলেন। এই ত গেল সাধননিষ্ঠা। তাঁর বৈরাগ্যের কথা বর্ণনা করিয়া বলিবার ভাষা আমি শিখি নাই। এ কিছু বৈরাগ্যের ঠাট নহে। গেরুয়া তিনি কখন পরেন নাই। তাঁর চিত্ত পৃথিবীর সমুদয় ভোগ সুখকে বাঁ-পায়ে পদাঘাত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়াছিল। বৈরাগ্য ও ত্যাগ

না থাকিলে কি ধর্ম্মাগ্নি কখনো প্রজ্জ্বলিত হয়. তাঁর সমুদয় দেহ মন বৈরাগ্যের অনলে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিত। যথার্থই তিনি ভাগবতী-তনু লাভ করিয়াছিলেন। ত্যাগ তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিবনাথের মৃত্যুর পর লিখিয়াছিলেন—

'যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে কোন অনল থাকিয়া থাকে তবে তাহা তাঁর আত্মদান। তাঁর প্রভাব, তাঁর বেদী ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে উচ্চারিত বাণীর নিগূঢ় শক্তি, এ এক মূল হইতে—তিনি যে আপনাকে একেবারে দিয়াছিলেন। এমন করিয়া আপনাকে দিতে, আপনাকে হারাইতে, আপনাকে লুপ্ত করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।" তাঁর মৃত্যুর পর 'দৈনিক' কাগজে লেখা হয়, "ধর্ম্মজীবনে শিবনাথ নাম, সঞ্জীবন মন্ত্রের মত শক্তিধর নাম পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন স্রষ্টা, পতাকাধারক বাহক, মনীষী ও মেধাবী। প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জন্য তাহার কতটা পণ করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া তিনি দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া দেশসেবায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এখনকার ছেলেরা তাহা বুঝিবে না, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের জন্য জীবন পণ করিয়া কতটা ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন। যে যুগধর্ম্মের আদর্শ তিনি নিজ জীবনে সাধন করিয়াছিলেন তার সকলগুলি লক্ষণই তিনি জীবনে সাধন করিয়াছিলেন। তাঁর জীবনে ছিল উন্নতনীতি ও ভাবুকতা সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা, নবীনের প্রতি বিশ্বাস, ভবিষ্যতের জন্য আশা, সকল অবস্থায় মহত্ত্বের প্রতি আসক্তি। এই সম্বন্ধে ডায়েরিতে লিখিতেছেন ঃ—

'একটি চিন্তাতে সহস্র প্রলোভনের মধ্যে আমাকে অপূর্ব্ব বল আনিয়া দেয়, সে চিন্তাটি এই, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগ সুখাসক্ত স্বার্থপর জীবন ধারণ করিবার জন্য জন্মি নাই। ইহা অপেক্ষা এক উন্নত জীবন আছে যাহা ধারণ করিতে পারা পরম সৌভাগ্য এবং যাহা ধারণ করাই প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা। সে জীবনে আত্মসংযম, বৈরাগ্য, পবিত্রতা পরসেবা প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়াসক্ত বিষয়ীর জীবন হইতে ইহা কত বিভিন্ন! এই জীবনের চিন্তা আমাকে কোন্ রাজ্যে যেন তুলিয়া লইয়া যায়। কল্য হইতে এই জীবনের চিন্তা আমার মনে জাগিতেছে ও আমার চিত্তকে আনন্দে ভাসাইতেছে। আমার স্বার্থত্যাগের আকাঙ্ক্ষা যেন অসীম। বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা দেখিতে ভাল লাগে, তার কথা শুনিতে ভাল লাগে, তাহা চিন্তা করিতে ভাল লাগে, তাহা পাইতে ভাল লাগে।"

নিজের জীবনের লক্ষ্য কি স্মরণ করিয়া লিখিতেছেন, "আমার জীবনের লক্ষ্য বঙ্গীয় যুবক যুবতীর মনে নৈতিক বল, ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া যাওয়া। বিধাতা সেই দিকেই আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার গ্রন্থাবলী, আমার কবিতা সকলেরই এই দিকে গতি। আমি অনেকবার আপনার মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি, আচ্ছা যদি আমার প্রণীত সমুদয় গ্রন্থ পুড়িয়া যায় এবং আমার নাম গন্ধ না থাকে তাতে আমি দুঃখিত হই কি না। আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাতে আমার দুঃখ হয় না, কারণ আমি যে পরিমাণে জাতীয় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি সেইটুকু আমি আমার নাম থাকুক না থাকুক, সেই পরিমাণে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে।"

শিবনাথের হৃদয়ের নিগূঢ় প্রেম হইতেই তাঁর ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম্মজীবনের উৎপত্তি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন তাহা "ধর্ম্মজীবন" নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এমন ধর্ম্মোপদেশ কেহ কখন শোনে নাই। এই উপদেশগুলি পাঠ করিলেই শিবনাথের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ

কি ছিল তাহা পাঠক বুঝিবেন। সেই আদর্শ যে কত উচ্চ ছিল তাহা অনুভব করিয়া দেখিতে হয়। তবে এই উপদেশগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহা কল্পনার রথে চড়িয়া স্বর্গরাজ্য দেখা নয়, ইহা ভাষার স্রোতে অক্ষয়ধামের তীরে যাওয়া নয়—ইহা স্রোতে ভাসা ভক্তির পদ্মফুল নয়—ইহার প্রত্যেকটি অক্ষর অধ্যাত্মরাজ্যে বিহারের ফল, ইহা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। তাই একথাগুলি জীবন্ত জীবের ন্যায় শ্রোতার হৃদয়ক্ষেত্রে পড়িয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবনের জন্ম দিয়াছে। তাঁর দেহত্যাগের পর সে কথার সাক্ষ্য অনেকে দিয়াছেন। এবার যদি আমরা মানুষ হই তবে ফল ফলিবার সময় আসিয়াছে। পুরুষ এবং নারী সাক্ষ্য দিবেন তাদের হৃদয়ক্ষেত্রে সে বীজ কি সোনার ফসল ফলাইয়াছে। শিবনাথের মৃত্যুর পর লাবণ্যপ্রভা লিখিয়াছেন :—

তিনি আমাদের জন্য জীবনের সেই পথের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, যার আদিতে কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ অন্তে কল্যাণ। আমরা তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে আসিয়া এখন বুঝিতেছি, কি আলোকময় রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নানা প্রতিকূলতা ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। বিধাতা তাঁর যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা, সে অদ্ভুত শ্রমের শক্তি, হৃদয় মনের প্রচুর ভাবসম্পদ এবং অবাধ প্রমুক্ত আধারে যে স্ফুরিত দান দিয়া মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন, তাঁর উপাসকমণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণকল্পে তিনি চিরজীবন তাহা নিঃশেষে ব্যয় করিয়াছেন।

* * *

বিষ্ণুর চরণ-নিঃসৃত ভাগীরথী যে পথ দিয়া সাগরের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে, তার উভয় কুল যেমন উর্ব্বরতায় শস্যশ্যামল হইয়া উঠিতেছে, সেইরূপ ভগবৎ সত্তার উৎসমুখ হইতে নিঃসৃত তাঁর পবিত্র জীবনের মধুর রসধারায় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন পুষ্টিলাভ করিয়াছে।"

মনস্বিনী কামিনী রায় আচার্য্য শিবনাথের উদ্দেশে যে ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে দুই এক ছত্র তুলিয়া দিলাম—"যেমন কবিতায় তেমনি উপদেশ ও বক্তৃতায়, সামাজিক জীবনে ধর্ম্মপিপাসা, উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁর সরস উপাসনার দ্বারা তিনি বহু বৎসর ধরিয়া সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মমণ্ডলীর এবং সমাজের বাহিরের বহু নর নারীর ধর্ম্মভাব সরস ও সজীব রাখিয়াছেন। এক এক বৎসর মাঘোৎসবের সময় মনে হইয়াছে যেন আমরা একটা নিম্ন ভূমিতে বিশ্রাম করিতেছিলাম, ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় শক্তির ন্যায় তিনি সমস্ত সমাজটাকে একটা উন্নত ভূমিতে উঠাইয়া আনিলেন। অথচ পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় তিনি নিজে মাথা তুলিয়া দাড়ান নাই। সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সকলের মধ্যে আপনাকে বণ্টন করিয়া এক উচ্চ অধিত্যকাই রচনা করিয়াছেন। গুরু হইয়া, দলের এক নায়ক হইয়া পূজা গ্রহণের ইচ্ছা তাঁর কোন দিন দেখি নাই। তিনি আপনার ভিতরের আগুন চারিদিকের মানুষের প্রাণে ছড়াইয়া সমস্ত সমাজটাকে উদ্দীপ্ত দেখিতে চাহিতেন।

তাঁর ধর্ম্ম কেবল ভক্তির ধর্ম্ম ছিল না, ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ জীবন এবং সেবাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল।—তিনি সেই ধর্ম্ম বাক্যে ও জীবনে প্রচার করিতেন।"

আমাদের দেশের লোক এখনও এই প্রকার সাধকের জীবনের মূল্য বুঝিবে না। নিরাকার চিন্ময় দেবতার পূজার এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বাভাবিক সাধনপ্রণালীতে কয়জন সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন? নবযুগের এই ত হইল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাধনপ্রণালী। এ সাধনায় উৎকৃষ্ট উন্নত নীতির সহিত হৃদয়ের

সরস সুকোমল ভক্তির মিশ্রণ. কি প্রগাঢ় তাঁর সাধুভক্তি ছিল—সাধুতা তাঁর ধ্যানে, জ্ঞানে. কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল—কি স্বাধীনতা ও পুরুষকার সেই পুরুষ সিংহের ছিল, আহা কি বাণীই শুনাইয়াছেন—

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ মান রে;
পিতারে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমান রে।

তাঁর জীবনের মন্ত্র ছিল—"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম. মানবে প্রীতি, ঈশ্বরে ভক্তি"—শিবনাথের জীবনই এই মন্ত্রের সিদ্ধির ফল!

॥ পঞ্চবিংশ অধ্যায় ॥

সাহিত্য-ক্ষেত্রে

শিবনাথের জীবনের কাহিনী শেষ হইয়াছে। বাল্যে. যৌবনে. বার্দ্ধক্যে—গৃহে, সাধনক্ষেত্রে, ধর্ম্মসমাজে তাঁর প্রকৃত চিত্রটির আভাষ দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন সাহিত্য-জগতে তাঁর আসনখানি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। তিনি বিস্তর পুস্তক, পুস্তিকা, গদ্য, পদ্য, উপন্যাস, আখ্যান, জীবনচরিত প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁর প্রত্যেকখানি পুস্তকের সমালোচনা করা অসম্ভব। কেবল তার লিখিত পুস্তকসকলের সমালোচনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক রচিত হইতে পারে। সেই বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এস্থানে সম্ভব নয়। শিবনাথ একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। সর্ব্বাগ্রে ছিলেন কবি। অতি শৈশব হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন। সে সকল বালকের লেখা। তাঁর প্রথম কবিতাপুস্তক "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" সতের বৎসর বয়সে লিখিত হয়।

"নির্ব্বাসিতের বিলাপ" বাস্তবিক একখানি উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য। একজন সতের বৎসরের বালকের লেখনী হইতে এমন ভাষা ও ভাব-সম্পদ যে প্রসূত হইতে পারে ইহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার! এই কবিতাগুলির ভিতর মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব লক্ষিত হয়। এই পুস্তকখানি অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষার পাঠ্য ছিল; সুতরাং পাঠকসমাজে একেবারে অপরিচিত নহে। নির্ব্বাসিতের বিলাপের দুই চারি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করিঃ—

একি হে জলধি! আজ করি বিলোকন?
কেন এ ভীষণ ভাব করেছ ধারণ?
এ হেন চঞ্চল কেন তোমার হৃদয়।
হইলে উতল সিন্ধু, কেন এ সময়?
কেন তরঙ্গের ভঙ্গে কহ বার বার
করিছ আঘাত কূলে? তুমি কি আমার
দুঃখ দেখে রত্নাকর হয়েছ দুঃখিত?
তাই কি হৃদয় তব এত উদ্বেলিত?

পুষ্পমালা—শিবনাথের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক "পুষ্পমালা" ভবানীপুর

বাসকালে ১৮৭৫ সালে রচিত হয়। ইহার অধিকাংশ কবিতা সেই সময়কার 'সমদর্শী' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। শিবনাথের কবিতার মধ্যে পুষ্পমালার কবিতাগুলি অত্যুৎকৃষ্ট। বঙ্গ-সাহিত্যে এই কবিতাগুলির তুলনা নাই। শিবনাথের তখন যৌবনকাল, হৃদয়ে কবিত্বের উচ্ছ্বাস কাণায় কাণায় উঠিয়াছে। এই সময় তিনি কবিত্বের ঝোঁকেই কবিতা লিখিতেন—লোকশিক্ষক, উপদেষ্টা, আচার্য্য তখনও হইয়া উঠেন নাই; সুতরাং শিবনাথের কবিত্ব শক্তির উচ্চতম বিকাশ দেখিবার স্থান পুষ্পমালা। শিবনাথ হেমচন্দ্রের সমসাময়িক—সাহিত্য-জগতে হেমচন্দ্রের কবিতার যে আদর হইয়াছে শিবনাথের কবিতার তাহা কখনো হয় নাই। তার প্রধান কারণ তাঁর ধর্ম্মান্তর গ্রহণরূপ অপরাধের জন্য জনসাধারণের আক্রোশ। শিবনাথের লেখার ভিতর কেবল কবিত্ব নয়—হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—সজীব, সতেজ, সুমধুর ভাষায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের ইতিহাস তাঁর সমুদায় লেখার ভিতর মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাঁর কবিতা হইতে দেখাইতে পারি কিন্তু স্থানাভাববশতঃ অধিক আর পারিব না।

শিবনাথ নিজের জীবনের সংগ্রাম স্মরণ করিয়া পুষ্পমালায় লিখিয়াছেন ঃ—

যতবার পড়ে উঠে ততবার,
বীর মন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার
নরের নরত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব,
এ সংগ্রাম বিনা নর দেব কিনা
কে আর প্রকাশে ? রক্ত স্রোতে যার
বক্ষঃস্থল ভাসে, কিন্তু তবু প্রাণ
কভু ম্লান নয়, শুভ ইচ্ছাময়,
যার খরতর, শরে জর জর,
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান
নরত্ব দেবত্ব এক স্থানে তার।

কি স্বদেশ প্রেম ?—

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তাও যদি হয় হো'করে কপালে।
বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ;
তবে যে জাগিবে ভারত সন্তান,
আয় জন কত ধরি এই ব্রত,
খাটিয়া জীবন করি অবসান
তবে যদি জাগে ভারত সন্তান'

পুষ্পমালার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে, ভগবৎ প্রেম স্বদেশ প্রেম, সদ্ভাব ও কবিত্ব শক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

হিমাদ্রী কুসুম—১৮৮৬ সালে শিবনাথ কয়েকজন সাধক বন্ধুর সঙ্গে কার্সিয়াং-এ ছিলেন, তখন নিৰ্জ্জনতা পাইয়া তাঁর কবিত্ব শক্তি আবার জাগ্রত হয়। হিমাদ্রী কুসুমে লোকশিক্ষার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব কবিতার স্রোতে লিখিয়াছেন—কবিত্ব হিসাবে বইখানি পুষ্পমালার সমকক্ষ না হইলেও—ইহাতে খাঁটি কবিত্বের অভাব নাই। হিমাদ্রী কুসুমে মানবের নব জীবনলাভ, দীক্ষা, সৌন্দর্য্য, বিচ্ছেদ ও বৈরাগ্য বিষয়ক চারিটি কবিতা আছে। ধ্যানস্থা বিনোদিনীর বর্ণনাটি কি সুন্দর ঃ—

ধ্যানে মগ্না বিনোদিনী, মুকুতা গলিয়া
বহে যেন দুকপোলে! বায়ু দিবাকর
উভয়ে ঝগড়া করে সে মুখ চুম্বিয়া
কে আগে শুখাবে অশ্রু! ভক্তিতে সুন্দর
প্রস্ফুটিত মুখ পদ্ম দেয় ছড়াইয়া
কি এক অপূর্ব্বভাব! বনের বানর
বিস্ময়ে অবাক হয়ে সেই মুখ হেরে,
বনপশু যায় আর চায় ফিরে ফিরে।

পুষ্পাঞ্জলি—নানা সময়ে রচিত অনেকগুলি কবিতা পুষ্পাঞ্জলি নামে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে সেণ্ট আগষ্টিনের দেশত্যাগ, ভাইবোন ও মহেশ সর্দ্দারের মত সুন্দর কবিতা বঙ্গ ভাষায় অতি অল্পই আছে।

মণিকা মাতা কাঁদিয়া বলিতেছেন ঃ—

হা পুত্র! সুধীর শ্রেষ্ঠ হবে কি শিখিলে?
শিখিলে না যদি রে বিনয়।
খোয়াইয়া ধনরাশি কি লাভ করিলে?
পেলে না ত ধর্ম্মের আশ্রয়।

"ভাই বোন" নামক কবিতাটি কি মিষ্ট ঃ—

শোন্ শোন্ বোন আমি নিজে নৌকা বেয়ে
ভাবিয়াছি গাঙ্গ হবো পার।
আর একজন চাই, তুই কিন্তু মেয়ে,
হবি কিলো সঙ্গিনী আমার?—

প্রেমের মিলন" ঠিক এইরূপ—

জাতিতে কৈবর্ত্ত নাম মহেশ সর্দ্দার,
মাছ ধরে ভূমি চষে আর,
পিতা মাতা ভাই বন্ধু সব গত তার,
পত্নী মাত্র সহায় ধরায়।
শ্রমে কেহ ক্লান্ত নয়, খাটে পাশাপাশি
সুখে কাটে খাটিয়া সময়।
দুজনে বেগুন তোলে আর হাসি হাসি
প্রণয়েতে কত কথা কয়।

ছায়াময়ীর পরিণয়—তাঁর শেষ কবিতা গ্রন্থ, ১৮৮৯ সালে ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। ছায়াময়ীর পরিণয় একখানি রূপক কাব্য। ছায়াময়ী, অর্থাৎ—জীবাত্মা এই সংসার-রূপ বৃদ্ধের পালিতা কন্যা, বৃদ্ধের নয়নের মণি, পরম আদরের ধন। ছায়াময়ী পরমাত্মারূপ পুরুষ রতনের সহিত প্রেমে পড়িয়া পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া আনন্দধামের যাত্রী হন। অনেক পরীক্ষায় পার হইয়া সাধনা ও কামনার সাহায্যে আনন্দধামে উপস্থিত হইয়া পুরুষ রতনের সহিত পরিণীতা হন। এই রূপক কাব্যখানি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনের ইতিহাস। দিন দিন শিবনাথের হৃদয় সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া অধ্যাত্মরাজ্যে নিমগ্ন হইতেছিল। কিন্তু প্রকৃত কবির শক্তি কখনও কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য কাজে লাগাইলে ফোটে না। শিবনাথের হৃদয়ে লোকশিক্ষার বাসনা অত্যন্ত জাগ্রত হওয়াতে কবিত্ব খর্ব্ব হইতে লাগিল। বলিতে কি তিনি শিশুহন্ত্রী মাতার মত অবশেষে নিজের

কবিত্ব শক্তির গলা টিপিয়া মারিলেন। ধর্ম্ম সমাজের সেবার জন্য এই যে ত্যাগ ইহা যথার্থই বিরাট ত্যাগ! ছায়াময়ীর বর্ণনাও এইরূপঃ—

ছায়াময়ী স্বর্ণলতা বাপ সোহাগী মেয়ে,
রূপের প্রভায় উঠলো ফুটে যৌবনে পা দিয়ে।
নধর নধর বাহুদুটি, আঙুল চাপার কলি,
হাতের পাতায় দুধে আলতায় রাখিয়াছে গুলি;
মাড়ায় কিনা মাড়ায় মাটি কোমল দুটি পা,
নখের আগায় মাণিক জ্বলে উছলে পড়ে তা;
হাসি রাশি সদাই ফোটে বিম্বাধরের পাশে;
চলে গেলে ছড়ায় হাসি প্রাণের তিমির নাশে।
বাপ সোহাগী ছায়াময়ী ভাবনা কি জানে
যা চায় তা পায়, যতন করি দশ জনে আনে।

এইবার তার রচিত উপন্যাসগুলির বিচার করি। তিনি সর্ব্বসুদ্ধ চারখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। (১) মেজবৌ (২) যুগান্তর (৩) নয়নতারা (৪) বিধবার ছেলে। ১৮৮০ সালে মেজবৌ প্রকাশিত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এমন চমৎকার, সরল, সুন্দর, স্বাভাবিক ছবি আঁকা বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। মেজবৌ বিষাদান্তক উপন্যাস সুতরাং চক্ষের জল না ফেলিয়া কেহ এই বইখানি শেষ করিতে পাবে না। পুস্তকখানিতে ভাষার কোন আড়ম্বর নাই অথচ কি মিষ্টতা! নিদর্শন দেখুনঃ—

'কালরাত্রি ক্রমে প্রভাত হইয়া গেল, পশুপক্ষী আবার জাগিল, বনকুঞ্জ আনন্দ কোলাহলে আবার পূর্ণ হইল, প্রতিবেশিগণ স্ব স্ব কার্য্যে আবার নিযুক্ত হইল, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী আজ ঝটিকাবসানে উদ্যানের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রহিল। আজ সূর্য্য সেই ভবনে আলোক না আনিয়া যেন অন্ধকার আনয়ন করিল।" "হায়! হায়! পতিত রৌদ্র যেমন আর উঠে না, নির্বান্ত প্রদীপ যেমন আর পূর্ব্ব শোভা ধরে না—শুকন্ত ফুল যেমন আর ফুটে না, মানবের কপালও বুঝি একবার ভাঙ্গিলে আর গড়ে না।" তার সব কয়খানি উপন্যাসের মধ্যে যুগান্তর-খানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় মনীষীও শতমুখে এই পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন সমাজ এবং পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিত্র তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের ভিতর এমন নিখুঁৎ হইয়াছে কেন? ইহা ত কাল্পনিক চিত্র নয় —তর্কভূষণ মহাশয়ের ভিতর শিবনাথের মাতুল বিদ্যাভূষণের চিত্র দেখা যাইতেছে। এসকল দৃশ্য ছবির ন্যায় শিবনাথের চক্ষে ভাসিত; কল্পনার পটে রং ফলাইয়া যেখানে নব্য সমাজ গড়িতে হইয়াছে সেখানে তেমনি সুন্দর হয় নাই। নয়নতারার ভিতর নূতন সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সুশিক্ষিতা নারী কত-দূর উন্নত আর পবিত্রহৃদয়া হইতে পারে নয়নতারা তার দৃষ্টান্ত স্থল। রায় মহাশয়ের চরিত্রে দুর্গামোহন দাসের সহৃদয়তার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু কি জানি প্রাচীন সমাজের চিত্রের ভিতর শিবনাথ যতটা সৌন্দর্য্য এবং স্বাভাবিকতা আনিতে পারিয়াছেন, নবীন তন্ত্রে তত পারেন নাই। তাঁর কবিত্বও যে কারণে খর্ব্ব হইতেছিল, ঠিক সেই কারণে উপন্যাসের সৌন্দর্য্যও খর্ব্ব হইতে লাগিল অর্থাৎ— পাঠকের হৃদয়ে ধর্ম্মানুগত আদর্শজীবন যাপনের বাসনা যাতে প্রবল হয় এই উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস লিখিতে বসিয়া তিনি সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নরহিতৈষণা তাঁকে চিত্রকরের সুখ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল।

বিধবার ছেলে—তাঁর শেষ বয়সের রচনা সাধুকার্য্যের নেশায় এই বইখানি লিখিয়াছিলেন। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে আমাকে একখানি দিয়া জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, 'তোমার 'বিধবার ছেলে' কেমন লাগিল ?" আমি বলিলাম, "বাবা এ কি রকম ? তোমার উপন্যাসের নায়ককে কেন ভাল কাজের ঝাঁকামুটে করিয়াছ ? কেবল রাশি রাশি সৎকর্ম্ম মাথায় করিয়া বেড়ায় ?" বাবা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন,—"ঐ ভাবই আমায় পেয়ে বসেছে। তাই ত বইটা ভাল হয় নাই তুমি ঠিক বলেছ।'

সকলগুলি উপন্যাসের ভিতর উন্নত নীতি, মুক্ত স্বাধীনভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর লেখা কখনই সৌন্দর্য্যবিহীন হইতে পারে না। বাঙ্গালা-ভাষার উপর তাঁর দখল বড় সামান্য ছিল না।

সংবাদপত্রে শিবনাথ সময়ে সময়ে যে সকল সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতেন তার কয়েকটি সংগৃহীত হইয়া প্রবন্ধাবলী নামে একখানি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পদ। এমন সুচিন্তিত, সুলিখিত প্রবন্ধ বঙ্গ-ভাষায় আর আছে কিনা জানি না। একাধারে তিনি সাহিত্যিক, দার্শনিক, কবি বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রবন্ধাবলীতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাম-মোহন রায়, ঋষিত্ব ও কবিত্ব বাবা ও কবিত্ব জাতীয় উদ্দীপনা ও জাতীয় সাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের তুলনা নাই। ইহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার নয়। যিনি পড়িবেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। কি ভাবের গৌরব, ভাষার সম্পদ ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ক সাহিত্যের মধ্যে শিবনাথের উপদেশাবলী—'ধর্ম্মজীবন' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এমন ধর্ম্মোপদেশ বঙ্গভাষায় আর নাই। অমৃতকথা এমন অপূর্ব্ব ভাবে বলিতে কেহ পারে নাই। শিবনাথের বক্তৃতা কয়েকটি বক্তৃতাস্তবকে প্রকাশিত হইয়াছে। শিবনাথের বক্তৃতার ভিতর যেমন ভাবের গাম্ভীর্য্য, তেমনি ভাষার সৌন্দর্য্য, তেমনি ওজস্বিতা—বঙ্গসাহিত্যে এগুলি অপূর্ব্ব জিনিস। ইহা ভিন্ন আরও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক ও পুস্তিকা আছে। এই প্রসঙ্গে শিবনাথের "গৃহধর্ম্ম" পুস্তকখানির নাম না করিয়া পারিলাম না। গৃহধর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির গৃহধর্ম্ম পালন কি করিয়া করিতে হয় তাহা লিখিত আছে। পুস্তকখানি অতি উপাদেয় ও শিক্ষা-প্রদ। জীবনী লিখিতে শিবনাথ কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার পরিচয় রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিতে—এবং আপনার "আত্মচরিতে" দিয়াছেন। রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজের চিত্র। এই পুস্তকখানি রচনা করিতে তিনি কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আর বলিবার নয়। বঙ্গসাহিত্যে এই পুস্তকখানি অতি মূল্যবান বস্তু। শিবনাথের "আত্মচরিত"খানি অতি সহজ স্বাভাবিক ভাষায় কি মনোরম চিত্র! বালক পর্য্যন্ত পড়িতে চায়। এমন সহজ ভাবে এত বড় বড় কথা আর কেহ বলিতে পারে নাই। শিবনাথের প্রদর্শনের ভাব কখন ছিল না। এমন ভাবে আপনার উন্নত চরিত্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন, যেন তিনি জানিতেনই না, তাঁর ভিতর অসাধারণত্ব বিন্দুমাত্র ছিল। বাস্তবিক বলিতে কি এইখানেই শিবনাথের অসাধারণত্ব। কেবল যে বাঙ্গালা ভাষায়ই শিবনাথের লেখনী চালিত তাহা নহে, তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথাঃ—

(1) History of the Brahmo Somaj, (2) Mission of the Brahmo Somaj, (3) Men I have seen, (4) Theism as universal religion, (5) Theism as practical religion, (6) The mission of theism in India, (7) True worship and power of Divine worship, (8) Revelation what it is and what it is not.

এখানে এই সকল ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা করিতে পারিব না। আমি বঙ্গসাহিত্যে তাঁর আসন নির্ণয় করিতে বসিয়াছি। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, উপন্যাস লিখিয়াছেন উচ্চদরের সারবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অমৃতোপম ধর্ম্মোপদেশ লিখিয়াছেন—এইবার দেখাইতেছি শিশুদিগের জন্য কত অমূল্যনিধি রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুপাঠ্য লেখাগুলি অধিকাংশ পুরাতন "সখা"য় এবং "মুকুলে" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলি আচিরে প্রকাশিত হইলে তখন ইহা বালক বালিকাদিগের কি সম্ভোগের বস্তুই হইবে। শিবনাথ কত বড় মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন এবং শিশুর চিত্র অঙ্কনে তাঁর কতদূর নিপুণতা ছিল তাহা মেজবৌ গ্রন্থে শিশু "গোপালের" চিত্রে দেখাইয়াছেন। ছেলেদের কথা তাঁর মুখে কি মিষ্ট শুনাইত! শিশুপাঠ্য রচনাগুলিও কি তেমনি! শিশুদের জন্য তিনি শিশু হইয়া কলম ধরিয়াছেন। তাদের জন্য "পেটুক পুষি", "আবদেরে ছেলে", "শ্যামচাঁদের পাঁচ দশা", "লেজ কাটা বাঘ" প্রভৃতি হাসির গল্প, আবার সরল ভাষায় কত জীবনচিত্র দিয়াছেন—যথা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, রঙ্গনাথ শাস্ত্রী, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, অহল্যা বাঈ, রামতনু লাহিড়ী, জেমসেটজী তাতা, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জেমস এব্রাম গারফিল্ড ইত্যাদি। কত কবিতা লিখিয়াছেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ নাতি বিজলীবিহারী যখন ছয় বৎসর পার হইয়া সাত বৎসরে পা দিল, তখন তাকে একখানি ছবির বই উপহার দিয়া তাহার প্রথম পাতায় নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়াছিলেনঃ—

দাদামশার সাধের নাতি ফড়িংবাবু নাম।
চুয়াল্লিশ নম্বর রসারোড ভবানীপুরে ধাম।
তালপত্রের সিপাই ভায়া লিকলিকে শরীর।
চলেন যদি ওড়েন যেন পা দুটি অস্থির।
কি যে করেন, কোথা যে যান হয় না তা নির্ণয়।
বুদ্ধি শুদ্ধি গজাবে যে, হয় না সে সময়;
লেখা পড়ায় মন বসে না বইকে লাগে ডর।
পড়াশুনা শিকেয় তোলা কেবল খেলায় ভর,
বাড়ীর লোকে পাগল পারা এক ফড়িং-এর চোটে,
কি হবে যে তাদের গতি আর একটি যদি জোটে?
দিবে আজি ফড়িং ভায়া সাত বছরে প—
দাদা বলে আপদ বালাই সব দূরে যা—
মা বাপের আশা বিফল হবে না কখন
দাদামশার সাধের নাতি হবেন একজন।

এই কবিতাটি পাঠ করিলে ফড়িংবাবুর মত লক্ষ্মী ছেলেদের প্রাণ একেবারে গলিয়া যায়। যাহা পাঠ করিতে শিশুরা রস পায় তাই ত শিশুপাঠ্য। তাদের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত কাটা ছাঁটা নীতিগর্ভ লেখাই পাঠ্য নহে। শিবনাথের ন্যায় শিশুর প্রাণ হরণ করিতে যিনি জানেন, তাঁরই শিশুপাঠ্য রচনা লিখিতে যাওয়া সাজে। শিবনাথের প্রাণটি যে শিশুর মত সরল, নির্ম্মল ও সরস ছিল। শিশুদিগের সহিত তাঁর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল।

আমি অতি সংক্ষেপে শিবনাথের লেখনিপ্রসূত সাহিত্যের একটি চিত্র দিলাম। এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে এমন বিবিধ রত্নরাশি দিতে পারিয়াছেন? শিবনাথের জীবদ্দশায় বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক পুস্তকে তাঁর নাম যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জিত হইয়াছে। সাহিত্য-জগতে যে এমন একদেশ-

দর্শিতা চলে তাহা আমি জানিতাম না। আমি চিরদিন এজন্য ক্ষোভ করিয়াছি। পণ্ডিতদেবের নিকটও পরিতাপ করিয়াছি কিন্তু তাঁকে পরিতাপ করিতে শুনি নাই। তাঁর পরে সংবাদপত্রে তাঁর সম্বন্ধে "হিন্দুস্থান" লিখিয়াছেন, শুধু ব্রাহ্মসমাজের নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একটা দিক্‌পালবিশেষ ছিলেন। যখন ৩১।৩২ বৎসর তাঁর বয়স, তখনই 'প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া তিনি সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই সময়েই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন—"নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দকৃষ্ণ রায় বর্ত্তমান কালের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" ও "পুষ্পমালা" প্রভৃতি কাব্য সম্বন্ধে কেবল আধুনিক পাঠক নহে—আধুনিক লেখকগণও বড় একটা উচ্চবাচ্য করেন না সত্য, কিন্তু এককালে শিক্ষিতসমাজে উহার যথেষ্ট আদর প্রতিপত্তি ছিল।

তবে কবিতা লিখিয়া তাঁর যশ হইলেও তাঁর রচিত উপন্যাসাবলীই তাঁকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিল। তারকনাথের পর বোধহয় তিনি সামাজিক উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁর মেজবৌ, যুগান্তর ও নয়নতারাই বাঙ্গালার উপন্যাস সাহিত্য-ভাণ্ডারে সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া তিনি "আত্মচরিত" 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক দুইখানি মূল্যবান জীবনী গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন তেমনি উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন।"

একদিন পূজ্যপাদ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হায় কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাঁতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব্ব হইল। এত বড় কবিকে ব্রাহ্মসমাজ মারিয়া ফেলিল।" যথার্থই তাহা হইয়াছিল। শিবনাথ ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াই সংকল্প করেন যে 'লেখনী চালনা করিয়াও যদি অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় তাহা হইলেও সেই লেখার ভিতর দিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব।' শিবনাথ নিজের কাছে নিজে খাটি ছিলেন। ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য, জনসাধারণের মনে উন্নত নৈতিক চিত্র ধরিবার জন্য এরূপ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আর অন্য ভাবে হৃদয়ে স্থান দিবার রুচি তাঁর ছিল না। কিসে মানুষের প্রাণ ভগবানের দিকে যায়, কিসে নীতির নির্ম্মল জীবনপ্রদ বায়ু প্রবাহিত হয়, এই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তায় প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি যে একজন বড় দরের কবি, তিনি যে একজন সুলেখক এ সকল তাঁর গণনায় আসিত না। নর-প্রীতিতে কি মানুষ এতটা আত্মবিলোপ করিতে পারে? আমার ঠিক মনে হয়, প্রচণ্ড বেগবতী স্রোতস্বতীর অবাধ জলোচ্ছ্বাস যেমন বাধা দিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিয়া লোকালয়ের পথ, ঘাট, গৃহ আলোকিত করেন, তেমনি শিবনাথ স্বয়ং তাঁর হৃদয়ের অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস সংযত, বশীভূত ও খর্ব্ব করিয়া হৃদয় মধ্যে এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তেজ ও আলোকের সৃষ্টি করিয়া স্বদেশবাসীর জীবন, গৃহ, পরিবার, সমাজ, সমুদয় আলোকিত, উদ্ভাসিত ও শ্রীসম্পন্ন করিবার জন্য এক মহা তপস্যা করিয়াছিলেন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, বিংশ শতাব্দীর মহাতাপসের জীবনব্যাপী তপস্যার অর্থ বুঝিতে পারিলে কি? শিবনাথের সাহিত্যিক যশঃ কেন খর্ব্ব হইয়াছিল বুঝিতে পারিলে কি?

শিবনাথ সুকবি, স্বভাবকবিই ছিলেন। জীবনের প্রবল কর্ম্মময় যুগের আবর্ত্তে পড়িয়া তাঁর কোমল কবি হৃদয়, কবিত্বের স্পন্দনে সুখে নৃত্য করিবার অবসর পাইত না· তাই কবিত্ব শক্তি, তাঁর হৃদয়ে পরিণত বয়সে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই—যেন সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগে যে সকল রচনা তাঁর লেখনী-

মুখে নিঃসৃত হইল তাতে ব্যক্তিত্ব. ধর্ম্মভাব এবং পুরুষকারের ছবি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শিবনাথ বঙ্গ-সাহিত্যভাণ্ডারে কত অমূল্যরত্ন দিয়া গিয়াছেন. তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ছাপ চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া থাকিবে—সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে. ইহাতে সংশয়-মাত্র করি না। সেই ধর্ম্মের প্রেরণায় জীবন্ত মানুষ যে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা সুন্দর সজীব, মনোহর শান্তিসঞ্চারক এবং অপার্থিব সম্পদে ভূষিত হইবে তার সংশয় নাই। এই প্রকার সাহিত্য লুপ্ত হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী জাতিকে উন্নত এবং মনুষ্য পদবীর যোগ্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে!!

পরিশিষ্ট

(১)

এই পরিশিষ্টে সর্বপ্রথমে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নিকট কুচবিহার বিবাহের প্রাক্কালে তেইশ জন ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত যে প্রতিবাদপত্রখানি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সন্নিবিষ্ট হইল। শিবনাথের ডায়েরি পড়িয়া জানিতে পারিয়াছি, এই পত্রখানি শিবনাথই লিখিয়াছিলেন, তৎপরে সকলের পরামর্শে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই পত্রখানি এই :—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন
মহাশয় সমীপেষু

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়!

আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, কুচবিহারের রাজার সহিত শীঘ্র আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সাধারণতঃ পুত্র-কন্যার বিবাহ পিতামাতারই বিবেচ্য বিষয় এবং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপরের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র, কিন্তু আপনার অবিদিত নাই যে, আপনার কার্য্যের উপর আমাদের সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের শুভাশুভ বহু পরিমাণে নির্ভর করে; সুতরাং এবিষয়ে আমাদের মৌনী থাকা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। আমরা নিতান্ত বিষণ্ন ব্যাকুল ও ক্ষুব্ধচিত্তে আপনাকে আমাদের কতিপয় অভিপ্রায় জানাইতেছি, আশা করি আপনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেগুলি বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন। এই বিবাহে আমাদের অনেকগুলি আপত্তি আছে।

প্রথমতঃ—আমরা বাল্যবিবাহকে পাপ মনে করি; প্রকৃত বিচার করিলে, কন্যার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং পতিমর্য্যাদাবোধ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আপনি নিজে যখন এবিষয়ে প্রধান প্রধান চিকিৎসকের মত জিজ্ঞাসা করেন তখন তাঁহাদের অনেকে অষ্টাদশ বা ততোধিক বর্ষকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশকাল বোধে ১৮৭২ সালের ৩ আইনে ন্যূনকল্পে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষকে কন্যার পক্ষে বিবাহ-কাল বলিয়া নিয়ম করা হয়। আপনি সে সময়ে এই নিয়মটি সন্নিবেশিত করিবার পক্ষে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন; এবং আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে আপনি রাজবিধি-নিরূপিত ন্যূনকল্প বয়সের মুখাপেক্ষা না করিয়া বরং তদপেক্ষা অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিত রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজে সৎদৃষ্টান্ত দেখাইবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আপনার কন্যার চতুর্দ্দশ বর্ষও পূর্ণ না হইতে আপনি বিবাহ দিতে অগ্রসর হইতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ—আপনারই পরামর্শানুসারে উক্ত আইনে পুরুষের পক্ষে ন্যূনকল্পে পূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষকে বিবাহকাল বলিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাকেও একপ্রকার বাল্যবিবাহ বলা উচিত; কিন্তু শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে, আপনি উক্ত রাজার ষোড়শ বর্ষও পূর্ণ না হইতে হইতেই, তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। যদি এরূপ বলা হয় যে, বিবাহের পর দম্পতী কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকিবেন, এ প্রকার কোন নিয়মপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বাল্যবিবাহজনিত আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না, তাহা হইলে ইহার উত্তরে আর কিছু না বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আদিসমাজ সংসৃষ্ট কোন ব্রাহ্মের কন্যার

বিবাহ উপলক্ষে ঠিক এইরূপ নিয়মের কথা বলায় তৎকালে ইণ্ডিয়ান মিরারে তাহার উত্তরে যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

তৃতীয়তঃ—আপনি এতদিন উপদেশে ও প্রকাশ্য পত্রে বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া আসিয়াছেন, তদনুসারে যাহাদের অদ্যাপি বিবাহের দায়িত্ব বোধের শক্তি জন্মে নাই তাহাদের বিবাহকে বিবাহই বলা যায় না, অথচ আপনি এক শিশুর হস্তে আর এক শিশু অর্পণ করিতেছেন।

চতুর্থতঃ—কেবলমাত্র উপাসনাপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বৈধ হয় কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমাদের সমাজের অনেকে এবং বিশেষরূপে আপনি ঘোরতর আন্দোলন ও পরিশ্রম করিয়া একটি রাজবিধি প্রণয়ন করাইয়া লন। তদবধি অনেক স্ত্রী ও পুরুষ এবং অনেক পরিবার এই রাজবিধি অনুসারে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া সমাজচ্যুত ও জাতিচ্যুত হইয়াছেন। উক্ত রাজবিধির কোন কোন অংশের প্রতি অনেকের আপত্তি আছে, এরূপ স্থলে কোথায় আপনি উক্ত রাজবিধিতে যাহাতে লোকের রুচি জন্মে তাহার চেষ্টা করিবেন, না আমাদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি যে উদ্দেশ্যেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন, আপনার দৃষ্টান্তে অনেক ব্রাহ্ম পাত্রের পদসম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া উক্ত রাজবিধি অতিক্রম করিবে।

পঞ্চমতঃ—উক্ত রাজবিধি অনুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ; কিন্তু সেই বিধি অতিক্রম করিয়া আপনি যে রাজবংশে কন্যা দিতেছেন, বহুবিবাহ তাঁহাদের বংশে কৌলিক প্রথা। বর্ত্তমান রাজা ইংরাজদিগের দ্বারা শিক্ষিত, ঈশ্বর করুন তাঁহার সেরূপ দুর্ম্মতি না হউক, কিন্তু রাজা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তাঁহার চরিত্র আজিও সংগঠিত হয় নাই; এরূপ অবস্থাতে এই শিক্ষার ফল অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং এই বিবাহ দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে আপনি জামাতার ধনে এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে কন্যার দাম্পত্য সুখের ব্যাঘাত হওয়াকেও আশঙ্কার কারণ মনে করেন না। বলা বাহুল্য যে আপনার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ হওয়াও আমাদের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর ও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক।

ষষ্ঠতঃ—আমরা কি অপর কেহ এতদিন উক্ত রাজাকে কি রাজপরিবারকে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্মে উৎসাহী বলিয়া জানি নাই, শুনিও নাই। বরং কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতবর্ষে তাঁহার যে বিবাহের কথা হয় তাহাতে পৌত্তলিক মতেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এরূপ স্থলে কিরূপে ব্রাহ্মপরায়ণ "ব্রাহ্ম" বলিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করা হইবে। আর আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার কন্যার সহিত বিবাহ ঘটনা না হইত, তাহা হইলে রাজা ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতেন কি না? যদি তাহা না হইত, এরূপ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে এখন ব্রাহ্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া সেই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা কিরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে?

সপ্তমতঃ—ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে কন্যার ভাবী ধনমান অপেক্ষা ধর্ম্মই পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য বিষয়, কিন্তু রাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তিনি জ্ঞাতচরিত্র ব্রাহ্ম নন, বিদ্যা সম্বন্ধে যদি দেখা যায়, এখনও প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্তও দেন নাই। বিশেষতঃ পাত্র যদি রাজা না হইয়া মধ্যবিত্ত লোকের সন্তান হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে দিতেও আপনি কখনই সম্মত হইতেন না। এরূপ স্থলে তাঁহাকে কন্যা দান করিলে লোকে সহজে মনে করিবে যে আপনি কন্যার ভাবী ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাত্রের বিদ্যাবুদ্ধি

দেখা অপেক্ষা কন্যার রাজবাণী হওয়া অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন। এরূপ মনে করিবার অবসর দেওয়াও কি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে শোচনীয় নহে?

আমরা আবার বলিতেছি—এবং এই ভাবী ঘটনার সংবাদ আমাদের মর্ম্মে আঘাত দিয়াছে বলিয়াই বার বার বলিতেছি, আমরা বাল্যবিবাহকে অত্যন্ত জঘন্য প্রথা এবং পিতামাতার পক্ষে তাহাতে লিপ্ত হওয়া পাপ মনে করি। এতদ্ভিন্ন আরও যে সকল আপত্তি আছে, তাহাও বলা হইল। অবশেষে আমাদের এই অনুরোধ যে আপনি উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের ভাবী মহৎ অনিষ্টের আশংকা নিবারণ করিবেন।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
„ দুর্গামোহন দাস
„ প্রসন্নকুমার চৌধুরী
„ আনন্দমোহন বসু
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য
„ কালীনাথ দত্ত
„ কিশোরীলাল মৈত্রেয
„ দুকড়ি ঘোষ
„ ক্ষেত্রমোহন দত্ত
„ রূপচাঁদ মল্লিক
„ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীগুরুচরণ মহলানবীশ
যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হরকুমার চৌধুরী
„ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়
„ রাধিকাপ্রসাদ মৈত্র
ভুবনমোহন ঘোষ
গণেশচন্দ্র ঘোষ
ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রজনীকান্ত নিয়োগী
সত্যপ্রিয় দেব

॥ ২ ॥

১৯১৭ সালের ইষ্টারের ছুটীর সময় কলিকাতায় এক বিশেষ উৎসব হয়। সেই উৎসবের সময় ৭ই এপ্রিল শিবনাথকে সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের নরনারী এক অভিনন্দন প্রদান করেন।

"অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ের প্রাঙ্গণে ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন প্রদানার্থ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদের এক সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়র প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, কে, সি, এস, আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিলে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মফঃস্বল সমাজসমূহ হইতে প্রাপ্ত সহানুভূতিসূচক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠ করেন। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, কুমারখালি, টাঙ্গাইল, বাণীবন, বরাহনগর, বাঁচি, কাঁথি, বাঁকিপুর, গিরিডি, বর্দ্ধমান, বগুড়া, ময়মনসিং, কটক, শান্তিপুর সমাজ হইতে পত্র এবং লাহোরস্থ সাধনাশ্রম, আত্মোন্নতি সভা, রামমোহন বালিকা বিদ্যালয়, আপার ইণ্ডিয়া মিশন ও কোকনদ অন্ধ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী, বোম্বাই, বগুড়া ও বরিশাল সমাজ এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্তের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

"তৎপরে সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন:—

পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

মহাশয় ভক্তিভাজনেষু

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,

অদ্য আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত নরনারীগণ আমাদের হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তির অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল আপনি যেরূপ গভীর অনুরাগ, জ্বলন্ত উৎসাহ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত এই সমাজের সেবা করিয়াছেন, তদুপযুক্ত প্রতিদান আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই সামান্য অর্ঘ্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার অকিঞ্চিৎকর নিদর্শনমাত্র।

যৌবনকাল হইতেই বিধাতার বিশেষ কৃপা আপনার জীবনে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া আপনাকে তাঁহার মনোনীত সেবকরূপে চিহ্নিত করিয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঘোর দারিদ্র্য উৎপীড়ন ও সংগ্রামের মধ্যে আপনি বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন জীবনের উষাকালেই আপনার অসাধারণ প্রতিভা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সুশোভিত এবং স্বদেশবাসীকে সত্যধর্ম্ম, সুনীতি ও সমাজসংস্কারের দিকে উন্মুখ করিয়াছিল। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজপুরুষদিগের যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই উচ্চপদ, প্রচুর অর্থ ও সংসারের নানা সুখ ভোগ করিয়া শেষ বয়সে রাজকীয় বৃত্তি ও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু দেশের দুর্গতি ও ব্রাহ্মসমাজের বিপদ দর্শনে ভীত ও ব্যথিত হইয়া বিধাতার ইঙ্গিতে আপনি সে পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশ ও সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন কঠোর বৈরাগ্য ও ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরের সহিত এই পবিত্র সেবাব্রত আযৌবন পালন করিয়া আপনি দেশের সমক্ষে নিঃস্বার্থবান ও উন্নত জীবনের একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনকালে ও তৎপরবর্ত্তী দীর্ঘ সময়ে আপনি ইহার সেবায় যেরূপ গভীর চিন্তা কঠোর পরিশ্রম ও একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা অসম্ভব। আপনার ওজস্বিনী বক্তৃতা ও প্রাণস্পর্শী উপদেশ, আপনার প্রেমানুরাগপূর্ণ উপাসনা, আপনার প্রতিভাদীপ্ত ও পুণ্যসৌরভময় কাব্য উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী এবং আপনার সুযুক্তি ও সাধুভাব সমন্বিত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ শত শত নরনারীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত ও উচ্চ জীবনাদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, বিশ্বাসে দৃঢ়তা ও চরিত্রে সংযম বৃদ্ধির জন্য আপনার জীবনব্যাপী সাধনার তুলনা অতীব বিরল। সমাজের সকল প্রকার কল্যাণকর কার্য্যে আপনার অনুরাগপূর্ণ সেবার সুস্পষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। আমাদের নিয়ম ব্যবস্থা ও সভাসমিতি, আমাদের বিদ্যালয় সকল, আমাদের সাময়িক পত্রাদি, আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধনের ব্যবস্থা, আমাদের প্রচারচেষ্টা ও প্রচারের আয়োজন এবং আমাদের দরিদ্রসেবা ও অন্যান্য সমুদয় লোকহিতকর অনুষ্ঠানেই আপনার প্রেম ও উৎসাহের প্রভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ভগ্ন স্বাস্থ্য ও বার্দ্ধক্য উপেক্ষা করিয়া আপনি দিবারাত্রি আমাদের কল্যাণচিন্তায় মগ্ন আছেন এবং অক্লান্ত-ভাবে সমাজের সেবা করিতেছেন।

আমরা আপনার নির্ম্মল চরিত্র, ব্রহ্মপরায়ণতা ও একনিষ্ঠ সেবা স্মরণ করিয়া আপনাকে বার বার প্রণাম করি, এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আরও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রক্ষা করুন, আপনার জীবনের সৌরভ সমাজে

ও দেশমধ্যে বিস্তার ও চিরস্থায়ী করুন এবং এই সমাজ ও এই দেশের কল্যাণের জন্য আপনার জীবনব্যাপী প্রার্থনা পূরণ করুন।

২৫শে চৈত্র, ১৩২৩ একান্ত অনুগত
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ

ব্রাহ্ম মহিলাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কাদম্বিনী গাঙ্গুলী নিম্নলিখিতরূপে অভিবাদন করেন ঃ—

ভক্তিভাজন! নারীজাতির কল্যাণকামী আপনাকে আজ ব্রাহ্মসমাজের মহিলাগণের পক্ষ হইতে আমি অভিনন্দন করিতেছি। আপনার সঙ্গে রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আপনি আমার পরমাত্মীয়, কারণ আপনি আমার পরলোকগত পিতৃদেবের বন্ধু এবং স্বর্গগত স্বামীর সুহৃৎ ও কর্ম্মসখা। আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আপনাকে সমৃদ্ধ করিব সে স্পর্দ্ধা আমার নাই, তবে আপনার গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত ইহা জানাইবার এই সুযোগটুকুকে আমি অবহেলা করিতে পারিতেছি না।

আজ আমার বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে, ভারত রমণীর দুর্দ্দশা মোচন করিতে আপনারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই কথা। আজ আপনার সহযোগীদিগের মধ্যে কেহই প্রায় অবশিষ্ট নাই, আজ আপনার সম্বর্দ্ধনায় আমরা তাঁহাদিগের সকলকেই স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্ত হইতেছি।

ব্রাহ্মসমাজ আপনার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। আজ এই সমাজে জীবনধারার যে সরস প্রবাহ অনুভূত হইতেছে, প্রাণে প্রাণে যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিতেছে তাহার মূলে আপনার অক্লান্ত পরিশ্রম-প্রদীপ্ত বাণী ও অদ্ভুত আত্মত্যাগপূর্ণ জীবনের দৃষ্টান্ত। আপনার নির্ম্মল চরিত্র, অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব ও জ্বলন্ত বিশ্বাস আমাদিগের চরিত্র উন্নত, ধর্ম্মে মতিমান করিয়াছে; সমাজ জীবনযাত্রার পথে পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে। উপদেষ্টার আসনে বসিয়া আপনি কথার দ্বারা প্রাণ স্পর্শ করিয়াছেন, প্রেম দ্বারা চিত্ত জয় করিয়াছেন, সেবা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, আজ তাই আপনাকে সম্মিলিতভাবে আমাদিগের আন্তরিক ভক্তি-কৃতজ্ঞতা দিবার এই অবসর পাইয়া আমরা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি।

ব্রাহ্মসমাজের নারীচিত্তে আপনি যে সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছেন তাহাতে আজ আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে সম্মানিত করুন। আপনি আমাদিগের ভক্তি-কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত নমস্কার গ্রহণ করুন।

তৎপরে শ্রীমতী কামিনী রায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করেন ঃ—

আর্য্য, আপনার প্রতি আমার অন্তরের যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, আমার সাধ্য নাই আমি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করি। বিশেষ এত বড় সভায় এত লোকের সম্মুখে আমাকে কিছু বলিতে হইবে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। কিন্তু আমাকে যখন প্রকাশ্যভাবে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ ও সম্মান দেওয়া হইয়াছে, তখন কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। আমার পূজনীয় পিতৃদেবের প্রতি আমার যে ভক্তি ছিল আপনার প্রতি ভক্তি তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে, এবং আমার জীবন গঠনে আপনার ও পিতৃদেবের প্রভাব বোধ হয় সমানই। বাল্যে আপনার সহিত পরিচিত হইয়াছি, কৈশোর হইতে আপনাকে ভাল করিয়া জানিয়াছি এবং আপনার স্নেহ যত্ন লাভ করিয়াছি, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য মনে করি। কেবল আপনার কবিতায়, আপনার বক্তৃতায়, আপনার উপদেশে নহে, আপনার সহিত আলাপেও জীবনের উচ্চ আদর্শ পাইয়াছি, তাহার উপযুক্ত জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আপনি নারীজাতিকে কি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, আপনি তাহাদের কিরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমরা সকলেই তাহা জানি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্যাগণ বিশেষ-ভাবে আপনার স্নেহ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আপনার পবিত্র চরিত্র, আপনার কঠোর ত্যাগস্বীকার, আপনার প্রকৃতির মধুরতা, স্নেহপ্রবণতা ও আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিয়া দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। আপনার জননী রত্নগর্ভা ছিলেন। নিজে জননী হইয়া প্রার্থনা করিয়াছি, যেন আপনার মত সন্তানের জননী হইতে পারি। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার স্নেহের ও যত্নের এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নারীরা আপনার মত পুত্র রাখিয়া যাইতে পারেন। অদ্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে আপনাকে জানাইবার ও নিকটে পাইবার সৌভাগ্য তিনি দিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করি, তিনি আপনাকে আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে রাখুন, আমাদের শিশু সন্তানেরাও আপনাকে জানিবার সৌভাগ্য লাভ করুক এবং আপনার চরিত্রের প্রভাব তাহাদের উপরও থাকুক। আপনাকে প্রণাম করি।

প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বরিশালের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মনো-মোহন চক্রবর্ত্তী, আদিসমাজের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উৎকলের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের শিক্ষা ও তাঁহার নিকট সকলে কিরূপ ঋণী সেই বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পল্লীবাস্থ সভ্য ও সহানুভূতিকারকগণ যে পত্র লিখিয়া পাঠান তাহা পণ্ডিত নির্ম্মলচাঁদ পাঠ করেন।

॥ ৩ ॥

পিতৃদেব নানা সময়ে নানা স্থান হইতে অনেক অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিলেন। সমুদায়গুলি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা সহজ নয়। বিলাত গমনের প্রাক্কালে ছাত্রসমাজের সভ্যগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্রখানি প্রদান করেন তাহা এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। তখন যাঁহারা ছাত্রসমাজের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার উপদেশ এবং শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ দেশের মধ্যে কর্ম্মী। শিবনাথ যে কার্য্যের জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন তাহারই ফল তাঁহারা। সুতরাং এই অভিনন্দনখানির আমার নিকট মূল্য অনেক, তাই সেখানি এখানে সন্নিবিষ্ট হইল।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ

মহাশয় শ্রীচরণেষু

আর্য্য।

আমরা, ছাত্রসমাজের সভ্যগণ, অদ্য আপনার বিলাত-যাত্রা উপলক্ষে, আমাদের হৃদয়ের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সামান্য চিহ্নস্বরূপ এই অভিনন্দন পত্র লইয়া আপনার চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

আমরা আপনার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। নয় দশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন ব্রাহ্ম-সমাজের ভিতরে গৃহবিবাদের প্রদীপ্ত অনলশিখা দেখিয়া, পাপ ও কলঙ্কের দুর্গে জয়ধ্বনি পড়িয়াছিল, সুযোগ পাইয়া প্রাচ্য পৌত্তলিকতা ও পাশ্চাত্য নাস্তিকতা ধীরে ধীরে সর্ব্বভাবে সমরাঙ্গন অধিকার করিতেছিল সেই সময়ে ঈশ্বরের আদেশে আপনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। একদিকে, [illegible] জড়বাদ, আর এক-দিকে, [illegible] নিজবলে আপন [illegible] বিস্তার করিতেছে। কত জ্ঞান-বৃদ্ধ

উন্নত সাধক, সেই সঙ্কটকালে পথ হারাইলেন। অদূরদর্শী যুবকগণের আর কথা কি? সেই বিষম বিপদের সময়ে আপনি, গম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে গন্তব্য পথে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সে আহ্বানের ফল ফলিয়াছে। অনেকে সত্যের পথ অনুসরণ করিযাছেন। অসংখ্য যুবকের জীবনে আপনার উপদেশ, অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হইযাছে।

নয় বৎসর পূর্ব্বে আপনি ছাত্রসমাজের প্রধান বক্তার পদ গ্রহণ করিযাছিলেন। অদম্য উৎসাহের সহিত, এই নয বৎসরকাল, আপনি স্বীয় ব্রত পালন করিযাছেন। আজিও আপনার রসনা নীরব হয নাই। যতদিন কণ্ঠে প্রাণ থাকিবে নীরব হইবে না। কিন্তু আপনার জীবন আপনার বক্তৃতা অপেক্ষাও মহত্তর। আমরা এই জীবন দেখিয়াই আকৃষ্ট হইয়াছি। অদম্য উৎসাহ, অতুলনীয় কর্ম্মানুরাগ, উজ্জ্বল বিশ্বাস পরমার্থিকী নিষ্ঠা, অবিচলিত নিঃস্বার্থ স্নেহ ব্যক্তিগত বিবেকের প্রতি অসাধারণ সমাদর—কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টির নাম করিব? আমরা যখন আপনার কথা ভাবি তখন নিরাশ প্রাণেও বল সঞ্চার হয।

আমাদিগের হৃদয আনন্দ ও বিষাদের মধ্যস্থলে দুলিতেছে। আপনি স্বাধীনতার জন্মস্থান এবং জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের রঙ্গভূমি ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। সেখানে সমুন্নত মতগুলি—সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল সত্য প্রচারিত হইবে, আপনার নিকটে এদেশের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া সে দেশের পুরুষ রমণী নানা ভাবে এদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার চিত্তের প্রসন্নতা ও বিদেশীয় বায়ু সেবনে শরীরের স্বাস্থ্যলাভ হইবে, এই আমাদের আনন্দ। কিন্তু এ বৎসরকাল আপনার স্নেহময মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব না আপনার মধুর অথচ ওজস্বী উপদেশ শুনিয়া প্রাণে বিশ্বাস ও বলের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিব না,—এই আমাদের দুঃখ।

আজ, বিদায়ের দিনে, আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমরা যেন আপনার অনুসরণ করিতে পারি। আপনি, বৎসরান্তরে যখন ফিরিযা আসিবেন তখন যেন অধিকতর সমুন্নত জীবন লইযা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারি। বিধাতা আপনার দীর্ঘজীবন বিধান করুন, সত্যের বিমল জ্যোতিঃ এই দুঃখী দেশে অধিকতর প্রকাশিত হউক।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
ছাত্রসমাজের সভ্যগণ

॥ ৪ ॥

দামোদর গোবর্দ্ধনদাসের লক্ষ টাকা দান

এই স্থানে বম্বে প্রার্থনা সমাজের সভ্য দামোদর গোবর্দ্ধনদাস শক্করওয়ালা পিতৃদেবের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন সেই সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র যাহা শিবনাথের নিকট ছিল, তাহা সন্নিবিষ্ট করিলাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এত বড় দান কেহ কখন করেন নাই—ইহা এক মহাদান। এই টাকার মধ্যে পিতৃদেব পঁচিশ হাজার টাকা সাধনাশ্রমের জন্য চাহিয়াছিলেন। মহামনা দামোদর গোবর্দ্ধনদাস প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহাই। শিবনাথ যে যে সর্ত্তে এই টাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ধরিয়া দিয়াছিলেন তাহাও এখানে দেওয়া হইল।

(No. 1)

Bazar Gate Street
Bombay, 23rd June—1912

Pandit Shivanath Shastry

Reverend Sir,

With reference to your letter of the 17th inst I beg to state that you can use the interest of Rs Twenty five thousand in any way you like for Sadhanashram As regards the remaining sum I shall send it at my earliest convenience

I have the honour to be,
Sir,
Yours Obediently
(Sd) Damodar Gobhordhandas
Sukhadvala

(No 2)

Bazar Gate Street
Bombay, 22nd July—1912

Pandit Shivanath Shastry, Esqr M A

Dear Sir,

I beg to acknowledge receipt of your letter of the 17th June I enclose herewith a Hundi on the firm of Messrs Abdulla and Jumabhai Laljee of No. 14, Polock Street, Calcutta, for Rs. 25,000/- more

Please recover the amount and invest the same in the Government Paper or in the Port Trust Bonds or other authorised Securities

I shall send you later on instruction for the use of interest of the same bonds

Please send the account of Rs 25,000/- sent last

Yours Sincerely
(Sd) Damodar Gobhordhandas
Sukhadvala

(3)

Port Bazar Gate Street
Bombay, August 25th, 1912

Dear Panditji Shivanath Shastry
Calcutta

Sir,

In reply to your letter of the 22nd inst. requiring from me the instruction as regards the use of interest of Rs. 50,000 you

will allow me to inform you to use the interest of Rs. 25,000 only at present, for, I think I shall send some additional sum after sometime. Please write to me when you receive the interest of Rs. 25,000 in future and oblige.

Yours Sincerely
(Sd) Damodar Gobhordhandas

(4)

Bazar Gate Street,
Bombay, 27th August, 1912

Dear Panditji Shivanath Shastry
Calcutta

Sir,

With reference to your second letter of 23rd inst. I have the pleasure to inform you that you may use the balance left at your discretion after you have spent something for renewing some of the Government Papers at your discretion and oblige.

Yours very truly
(Sd) Damodar Gobhordhandas

(5)

Bazar Gate Street
Bombay, 25th September, 1912

Dear Pandit Shivanath Shastry,

I am duly in receipt your letter of the 19th September and note about the renewal of papers and the interest accrued.

As suggested you can deposit the Papers and the money in the hands of the Executive Committee of the Sadharan Brahmo Somaj for safe custody.

Yours Sincerely
(Sd) Damodar Gobhordhandas

দামোদর গোবর্দ্ধনদাস মহাশয়ের যে পাঁচখানি পত্র উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে শিবনাথ তাঁহার মনোমত কোন সাধুকার্য্যে এই টাকাগুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন, দাতার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। আর শেষ পত্রখানি হইতে স্পষ্টই বুঝিতেছি, শিবনাথের বিশেষ অনুরোধে দামোদর গোবর্দ্ধনদাস মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে এই টাকা রক্ষার ভার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী নিজের দায়িত্বে সমুদায় অর্থ রাখিলে এবং ব্যয় করিলে দাতার কিছুমাত্র আপত্তি হইত না। শিবনাথ বৃদ্ধ বয়সে এত বড় গুরুতর দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে কিছুতেই রাখিতে চাহিলেন না। তিনি যে যে সর্ত্তে এই টাকাগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ধরিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত পত্র হইতে জানিতে পারা যাইবে।

দামোদর গোবর্দ্ধনদাস মহাশয় শিবনাথের নামেই টাকা হুণ্ডি দিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে তাহা দিয়া তবে প্রাণে শান্তি পাইয়াছিলেন। দামোদর গোবর্দ্ধনদাস মহাশয় আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা পরে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের হস্তে দিয়াছেন।

Sadhanashram
1st October, 1912

To

The Secretary,
Sadharan Brahmo Somaj.

Sir,

I have the honour to inform you that Mr. Damodardas Gobhordhondas Sukhadwalla of Bombay, has placed in my hands Rs. 50,000 (Rupees fifty thousand only) to be used for some public purpose, to be indicated by him afterwards when he sends further instalments with instructions.

With this money I have purchased under his instruction Government Securities valued at Rs. 51,300 (Rupees fiftyone thousand and three hundred only) leaving in my hands in the shape of balance and interest Rs. 268-12-4 (Rupees two hundred sixty eight, annas twelve and pies four only).

It is the intention of Mr. Damodardas that till final disposal the interest of twenty five thousand rupees of this sum will be used for the Sadhanashram as you will find in the letters to be submitted with Government Securities. And it is also his intention that the interest of the remainder will accumulate till final disposal.

As a safe custody I asked for his permission to place the whole sum in the hands of the Executive Committee of the Sadharan Brahmo Somaj, to which he has consented.

Accordingly I wish to place the Government papers along with the balance money in the hands of the Executive Committee on the following conditions :—

(1) Any portion or the whole amount may be withdrawn by me at any time, of course under his instruction and with his consent.

(2) The interest is to accumulate in the hands of the Committee as a trust property to be delivered whenever demanded.

(3) The interest of Rs. 25,000 (twenty-five thousand only) to be used for the Sadhanashram as I indicate. As I am think-

ing of leaving town at an early date, I shall thank you to let me know within this week, whether the Executive Committee are ready and willing to take charge of the trust.

Of course it is understood that though the Government papers have been purchased in my name I claim no property in them But no use can be made by the Executive Committee of the papers or of the money accruing as interest without my knowledge and sanction.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant
Shivanath Sastri
Superintendent, Sadhanashran

॥ ৫ ॥

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পরলোক গমনের পর শোকোচ্ছ্বাস

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজে একটা গভীর শোকোচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য দেহ মনের সমুদায় শক্তি নিঃশেষে দান করিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার জন্য শোক করিবে ইহা ত স্বাভাবিক। তাঁহার মৃত্যুর পর চারিদিক হইতে সহানুভূতিসূচক পত্র আসিয়া পড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের নানাস্থানে তাঁহার জন্য শোকসভা আহূত হইল। সর্ব্বপ্রথমে জন্মভূমি মজিলপুর গ্রামে তাঁহার জন্য এক বিরাট শোক-সভা আহূত হয়। কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতার অনেক ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে তাঁহার বিষয়ে নানাপ্রকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে সেই সময় ভারতবর্ষের নানাস্থানে যাহা কিছু করা হইয়াছিল বা বলা হইয়াছিল, তাহা এ স্থানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সংবাদপত্রে যত কথা লিখিত হইয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিতে গেলে আর একখানি পুস্তক হইয়া উঠিবে. তাহাও সম্ভব নহে। আমি কেবল অতি সামান্যভাবে এ স্থানে সে সকলের উল্লেখ করিতে পারি। শিবনাথের দেহত্যাগের পর বিস্তর লোক ব্যক্তিগতভাবে শোকার্ত্ত পরিবারকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে ভারতসভা তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া শোকার্ত্ত পরিবারকে পত্র লেখেন। তাহার পর সাহিত্য পরিষদ হইতেও সহানুভূতিসূচক পত্র আসিয়াছিল। এই প্রকার চিঠিপত্রের অধিক উল্লেখ আর করিতে পারিব না।

এই ত গেল ব্যক্তিগতভাবে চিঠিপত্রের কথা। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজগুলিতে একটা শোকের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল। যথা,—ধুবড়ী, গৌহাটি, ডিব্রুগড় শিলং ঢাকা, ময়মনসিং. গিরিডি, বরিশাল, কুমিল্লা, কুমারখালি, ফরিদপুর দিনাজপুর, বর্দ্ধমান, কুচবিহার, বাঁকিপুর, লাহোর. আগ্রা, নাগপুর, বম্বে প্রার্থনা সমাজ, বাঙ্গালোর. টিনেভেলি, কোকোনাদা, রাজমহেন্দ্রী, অন্ধ্র ব্রাহ্মসমাজ. ইত্যাদি।

এমন কি, স্থানে স্থানে দান ধ্যান দরিদ্রভোজন প্রভৃতিও হইয়াছিল। তত্ত্বকৌমুদী, মেসেঞ্জারের কথা ছাড়িয়া দিই. সঞ্জীবনী, প্রবাসী, Modern Review,

ভারতী ব্যতীত বাঙ্গালা দেশের এবং অন্যান্য স্থানের অনেক সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে স্যার নারায়ণ চন্দ্রবরকার, রঘুনাথ সহায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, নীলমণি চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রজনীকান্ত গুহ, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, চুনিলাল বসু, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, যদুনাথ সরকার, লবণ্যপ্রভা সরকার, কামিনী রায় অমলচন্দ্র হোম প্রভৃতি অনেকে অতি সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি এতই সুন্দর যে সেগুলি সংকলিত হইয়া মুদ্রিত হইলে একখানি সুপাঠ্য পুস্তক হয়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানেব ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে তাঁহার বিষয়ে অনেক গুণগ্রাহী প্রবন্ধ লেখেন। ব্রাহ্মদিগেব দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছিল তাহা এ স্থানে উদ্ধৃত করিব না—কিন্তু যাঁহাবা মত ও বিশ্বাসে তাহার সমভাবাপন্ন ছিলেন না তাঁহারা তাঁর সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাবই কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কলিকাতার অধিকাংশ ইংবাজি বাঙ্গালা সংবাদপত্র যথা—Bengalee, Amrita Bazar Patrika, নায়ক, বাঙ্গালী, হিতবাদী, বসুমতী প্রবাসী, ভারতী, ভাবতবর্ষ সঞ্জীবনী, Modern Review, World and the New Dispensation, লাহোরের Tribune, পুনের Subodh Patrika প্রভৃতি অনেক সংবাদপত্র তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

"বাঙ্গালী" লিখিলেন,—

যে নামে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল বাঙ্গালাব সাহিত্যেব এবং ধর্ম্মক্ষেত্রেব প্রায় অর্দ্ধেক অংশ পূর্ণ হইয়াছিল, সে নাম এবং সেই নামধর দেহী আজ অনন্তেব ক্রোড়ে লুকাইল! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালাব এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজেব একটা বড নাম—শ্রদ্ধার এবং শ্লাঘার নাম। সাহিত্যে শিবনাথ একটা অতি বড নাম, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের নাম চূড়ার উপর ময়ূরপাখার প্রদীপ্ত অক্ষরে লিখিত, এ পক্ষে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অগ্রণী। ধর্ম্মজীবনে শিবনাথ নাম মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের মত শক্তিধর নাম; পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন স্রষ্টা, ধাতা, ধারক এবং বাহক ও মনীষী; মেধাবী, মনীষী প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জন্য তাঁহার সবটা পণ করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া তিনি দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া দেশসেবায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এখনকাব ছেলেরা বুঝিবে না, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের জন্য জীবন পণ করিয়া কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়ার অবস্থার এম-এ এবং শাস্ত্রী। তিনি শিক্ষাবিভাগেই যদি থাকিতেন, তাহা হইলে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন। হাইকোর্টের উকীল হইলে হাইকোর্টের জজীয়তী তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য পদ হইত না। এই ত গেল আর্থিক ও অভ্যুদয়ঘটিত ক্ষতি। তাহার উপর পণ্ডিত শিবনাথ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনেয়, সুপণ্ডিত এবং সুচরিত্র জনকের পুত্র; বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহার পদমর্য্যাদা খুব ছিল। তিনি সামাজিক ও সাংসারিক পদ-মর্য্যাদার সকল লোভ ছাড়িয়া পণ্ডিত পিতার উৎকট বিরক্তি, আত্মীয়স্বজনগণের উপেক্ষা, সামাজিক নিন্দা এবং অবনতি সহ্য করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। এখন সে হিন্দুসমাজ নাই, সে সমাজে শাসন নাই, এখনকার লোকে বুঝিতে পারিবে না,

গোড়া ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য কতটা ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল, কি কঠোর সমাজনিগ্রহ সহ্য করিয়াছিল। এই সকল ত্যাগী পুরুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে শিক্ষিত সমাজের সেব্য ও পূজ্য সমাজ হইয়াছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ কবি, ভাবুক, রসিক পুরুষ ছিলেন; সংস্কৃত সাহিত্য ভাল করিয়া জানিতেন বলিয়া তাঁহার গদ্যে পদ্যে ভাষার পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ সাহিত্যের হিসাবে একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন।

চলিয়া গেল—একে একে ব্রাহ্মসমাজের সকল স্ফটিকস্তম্ভ খসিয়া পড়িল। যাহারা ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা, যাঁহারা ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ এত বড় হইয়াছিল, যাহাদের মহিমার জ্যোতিতে সমগ্র বাঙ্গালার ধর্ম্মক্ষেত্র সমালোকিত ছিল, একে একে তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মসমাজের সে আকর্ষণ শক্তি, সে বিশ্বজন-মোহন প্রভাব আর রহিল না। পণ্ডিত শিবনাথ ইদানীং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবরাত্রির সলিতার মত ছিলেন; তিনি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়াছিল তিনি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের একটা মোহ ছিল। তিনি চলিয়া গেলেন, এখন রহিল কেবল ঘোষণা। আমরা হিন্দু, চিরদিনই শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছি, পরন্তু তাঁহার মনীষা, তেজস্বিতা, একনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়াও সে সকলের পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক অবনত হইত। আজ ব্রাহ্মসমাজের যাহা গেল, তাহা আর মিলিবে না, ব্রাহ্মসমাজ এইবার সত্যই পংগু হইয়া পড়িল—বাঙ্গালী জাতি অমূল্য নিধি হারাইল।

"হিন্দুস্থান" লিখিলেন ঃ—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৌরব-চূড়া খসিয়া পড়িল,—শাস্ত্রী শিবনাথ আর ইহ-জগতে নাই। পূজার ষষ্ঠীর দিন অপরাহ্নে প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় মহাকালের কোলে তিনি চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সংগে সংগে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর তাঁহার তুল্য প্রভাব বিস্তার করিতে ব্রাহ্মসমাজে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মসমাজ যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে এই তিনজন প্রতিভাশালী পুরুষেরই নাম করিতে হয়।

শুধু ব্রাহ্মসমাজের নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রেরও তিনি একটা দিক্‌পাল-বিশেষ ছিলেন।

তবে কবিতা লিখিয়া তাঁহার যশ হইলেও তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীই তাঁহাকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিল। তারকনাথের পর বোধ হয় তিনিই সামাজিক উপন্যাস-রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'মেজ-বউ', 'যুগান্তর', ও 'নয়নতারা' বাঙ্গালার উপন্যাস সাহিত্যভাণ্ডারে সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া, তিনি 'আত্ম-চরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক দুইখানি মূল্যবান জীবনী-গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন, তেমনই উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন।

"নায়ক" লিখিলেন ঃ—

আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ, 'নায়ক' গোঁড়া ব্রাহ্মণের মুখপত্র। প্রথম কিশোরকাল হইতে আজ পর্যন্ত, জীবনের অর্দ্ধেকটা আমরা যেরূপ প্রতিবেশ প্রভাবের অধীন থাকিয়া মানুষ হইয়াছি, তাহাতে আমাদিগকে আগা-গোড়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মগত এবং সমাজগত মতের প্রতিবাদ করিতেই হইয়াছে। তথাপি আমরা সোজা সরল ভাষায় ব্যক্ত করিব যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের একটা দিক্‌পালের পাত হইল।

* * *

পণ্ডিত শিবনাথ সম্বন্ধে কথা কহিতে হইলে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিবৃত্তের একাংশের আলোচনা করিতে হয়। আমাদের তেমন স্থান নাই;—সাধ হইলেও তাহা মিটাইতে পারিলাম না।

শেষ কথা বলিব—পণ্ডিত শিবনাথের মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহা হারাইলেন, তাহা আর পাইবেন না, ব্রাহ্মসমাজের স্ফটিক স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এবং প্রতিভা দুই নষ্ট হইল। যাহা গেল তাহা আর মিলিবে না, তেমনটি আর গড়িয়া উঠিবে না—কেন এমন ঘটিতেছে, তাহা প্রয়োজন হইলে পরে বুঝাইয়া বলিতে পারি। আজ আমরাও পণ্ডিত শিবনাথের মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়াছি, কেন না,—নূতন বাঙ্গালার শেষ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

The World and the New Dispensation তাঁহার মৃত্যুর পরে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির করেন, তাহার শেষ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

He had intense faith in the cause he stood for,—and this faith sustained him in his struggle, roused all his enthusiasm. He has gone to his rest—the hero in the cause of nation and humanity, a poet of no mean order, an enthusiastic preacher gifted with fiery eloquence, of the principles of simple Theism and social equality, and a man of high ideas, which have materialised themselves in the institutions for the education of boys and girls, and took him to all length of self-sacrifice, true and faithful in all his private relations. The ship has crossed the bar, and beyond all limitations of earthly life, it sails full-breasted with new horizons and outlooks—visions realised to open out new visions, new currents of life and with a fuller realisation of the Infinite in sweeter relationship and deeper communion with the spirits which ever called him to nobler heights beyond himself, beyond his past.

-*The World and the New Dispensation*
October 16, 1919.

বিদেশীয় সংবাদপত্রে শিবনাথের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল। যথা :—

Not only Bengal, but the whole of India, is distinctly the poorer by the recent death, at the ripe age of seventy-two, of Pandit Sivanath Sastri, Calcutta. As a great social reformer, a missionary of the Sadharan Brahmo Somaj (of which he was also one of the founders), an educationist, an effective public speaker, and a writer and scholar of no mean repute, the Pundit had

a large share in moulding the character of his people and in shaping their destinies. He took a keen and active interest in the battle for political reform and progress. Yet great as were the services rendered by this distinguished Bengalee, greater was the man himself.

Sivanath Sastri was in early youth drawn to the Brahmo Somaj, into which he was initiated by Keshub Chunder Sen; and he abandoned a career in the educational service in which he gave every promise of rising to very highest rung of the ladder to serve his God and his country in those fields of work for which Nature had pre-eminently marked him out, but which offered few opportunities of earning renown and none whatever of earning money and to the end of his days he remained true to the inspiration of his youth and the guidance of his conscience. Such a man is at all times and in all countries a rare asset of national life, so that India mourns his death as that of a worthy son whose whole life was one long record of highly valuable and utterly disinterested public service.

-Christian Life

The death of Pandit Sivanath Sastri, which took place at Calcutta on September 30, will be mourned by a wide circle of religious liberals in India and in this country. Preacher, poet, thinker, religious and social reformer, Sivanath Sastri was a man of real distinction. His wide culture, his saintly character, combined with great simplicity and strength of purpose, marked him out for leadership. In his youth he was attracted by Keshub Chandra Sen; and, cutting himself adrift from family and friends, he joined the Brahmo Samaj in 1869, on the same day as the late Mr A. M. Bose. Nine years later, he and his friend parted company with Keshub and founded the Sadharan Brahmo Samaj—the most enlightened and progressive Theistic movement in India. Pandit Sastri became the chief missionary minister, an office which he held until his death.

The Indian Messenger of October 12, devotes a special number to his memory. Eloquent testimony is borne to his intellectual gifts, to his fine sincerity of purpose, his unselfishness, benevolence, and unswerving loyalty. Pandit Sastri, in his life and writings, showed in a very impressive way the union of divine worship with work for humanity. To him the worship of God in spirit and in truth formed an essential element in the upbuilding of the religious life, and was an unfailing source of inspiration in the faithful performance of daily duty. Sivanath

Sastri visited England in 1888, and he was for many years an honoured and respected correspondent of the British and Foreign Unitarian Association

Inquirer

আর কত উদ্ধৃত করিব, ব্রাহ্মসমাজের শোকোচ্ছ্বাস কেবল অশ্রুজলে হাহাকারে পরিসমাপ্ত হয় নাই তাহা এক্ষণে শিবনাথ কলেবর ধারণ করিবার আয়োজন করিয়াছে শিবনাথের জন্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি স্মৃতিভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প হইয়াছে। সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে এই অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছিল।

শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডার

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার সহানুভূতি, সকল প্রকার চরিত্রমাধুর্য্য, সকল অনুরাগ এবং স্বদেশপ্রেম তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও জীবনব্যাপী ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য সর্ব্বত্র পরিচিত। উপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহাতে (১) সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পুস্তকালয় ও পাঠাগার, (২) উদারভাবে সকল প্রকার বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি বক্তৃতা-গৃহ (৩) আমাদের প্রচারক এবং সাধনাশ্রমের পরিচারক ও সাধনার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর ও একটি উপাসনাগৃহ এবং (৪) ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রার্থীদের জন্য কতকগুলি ঘর থাকিবে। কলিকাতার নিকটে ব্রাহ্মপ্রচারক ও প্রচারার্থীদিগের জন্য একটি সাধনাশ্রম নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছে। এই কার্য্যটি শাস্ত্রী মহাশয় অতি প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রিয় আচার্য্য ও নেতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের এই সামান্য চেষ্টায় আন্তরিক সহায়তা করিবার জন্য আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সকল বন্ধু ও ভক্তদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সমস্ত অর্থাদি শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারের ধনাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের নামে ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইবেন। ঢাকার চেকগুলিতে দুইটি রেখা টানিয়া দিতে হইবে। ইতি—

সিংহ (রাসপুর) এন, জি চান্দাবারকর (বোম্বে), বি, জি ত্রিবেদী (বোম্বে) আর ভেঙ্কাটা রত্নম্ নাইডু (মান্দ্রাজ) অবিনাশচন্দ্র মজুমদার (পাঞ্জাব) পি আর দাস (রেঙ্গুন) রুচিরাম সাহনি (পাঞ্জাব) এন জি ওয়েলিংকার (হাইদরাবাদ দাক্ষিণাত্য), নীলমণি ধর (আগ্রা) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (মধ্যপ্রদেশ) বিশ্বনাথ কর (উড়িষ্যা), হরকান্ত বসু (সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ) পি কে রায় নীলরতন সরকার পি, সি রায় নবদ্বীপচন্দ্র দাস শশিভূষণ দত্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় কামিনী রায়, কানাইলাল সেন শ্রীনাথ চন্দ, সুবোধচন্দ্র রায় হেমচন্দ্র সরকার (বাঙ্গলা), পি, কে আচার্য্য ও পি মহলানবীশ (সম্পাদকদ্বয়)। ১০ই এপ্রিল ১৯২০।

লেখিকার পরিচয়

প্রসন্নময়ী ১৮ বছর বয়সে প্রথম সন্তানসম্ভবা হলে, শিবনাথ পত্নীকে বলেছিলেন, "দেখো, আমি ছেলে চাই না, আমি চাই মেয়ে। যে মেয়ে হবে তাকে খুব লেখাপড়া শেখাব, ইংরাজি পড়াব।" প্রসন্নময়ী চিরদিন শুনে এসেছেন যে ছেলেই হোল সাধনার ধন, আর মেয়ে মাটির ঢেলা। সেই মাটির ঢেলা কন্যার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম হতে হেমলতার ঠাকুরমা ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, কিন্তু কন্যা হলেন পিতার সাধনার ধন।

বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে শিক্ষার পর হেমলতার বিবাহ (১৮৯৩) হয়েছিল ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকারের সঙ্গে। বিপিনবিহারী ধনাঢ্য পরিবারের আদরের দুলাল যিনি তখনকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ, পুরুষদের ব্যাভিচার, নারীজাতিকে পদদলিত করে রাখার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের অভিযানে যোগ দিয়ে নিজের বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন বটে, কিন্তু লাভ করলেন আধ্যাত্মিক শান্তি ও স্ত্রীরত্ন হেমলতাকে।

পিতা কবি ও সাহিত্যিক ইংরাজি ও বাংলায় দুটি ভাষাতেই পারদর্শী, হেমলতাও লেখার প্রতিভা বোধ হয় জন্মসূত্রেই লাভ করেছিলেন। বংশের ঊর্দ্ধতন পুরুষ সকলেই সংস্কৃতে পন্ডিত তাছাড়া হেমলতার পিতৃদেবের মামা স্বয়ং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। হেমলতার লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছোটদের জন্য সরস "ভারতবর্ষের ইতিহাস", স্বামীর সঙ্গে তখনকার দিনে দুর্গম নেপাল রাজ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা "নেপালে বঙ্গনারী", 'সমাজ বা দেশাচার", "নবপদ্যলতিকা" ও "দুনিয়ার ছেলে"। নেপালবাস শেষ করে স্বামী বিপিনবিহারী দার্জিলিং সহরে ডাক্তারী করতে এলেন। সেই দার্জিলিংও সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। হেমলতার পাঁচটি ছোট ছোট সন্তান। দুই ছেলে বিজলীবিহারী ও বিনয়বিহারীর পর জ্যেষ্ঠা কন্যা বীণাকে স্কুলে ভর্ত্তি করবার সময় হোল। কিন্তু রোমান ক্যাথলিকদের প্রতিষ্ঠিত "লোরেটো কনভেন্টে" পড়াশোনা হয় ইংরাজির মাধ্যমে। তাতে বাঙ্গালীর ছোট শিশুকে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করাতে হেমলতার তেজস্বী মন চাইল না। আজকাল ইংরাজি মিডিয়ম স্কুলে বাচ্ছাদের পড়াবার জন্য বাঙ্গালী মায়ের আকুলতা দেখলে তিনি কি বলতেন জানি না, তবে হাত গুটিয়ে হতাশ হয়ে থাকা তাঁর রক্তে ছিল না। তিনি নিজে বেথুন কলেজে উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন এবং শুনেছি তাঁর মুখে যে, তাঁর আর দুটি প্রিয় বান্ধবী, লেডী অবলা বসু ও শ্রীযুক্তা সরলা রায়ের সঙ্গে কিশোরীকালেই তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করবেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন, এই সব আলোচনা করতেন। তাঁরও জন্মের আগে তাঁর বাবা ও অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিরা গ্রামে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষা দেবার চেষ্টায় কত অপমান, কত নিগ্রহ সহ্য করেও পিছিয়ে যাননি, সে কথাও মনে জাজ্জ্বল্যমান ছিল। কিন্তু অর্থাভাব দারুণ, লোকবলও নেই, এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের মানুষেরও মন প্রস্তুত নয়, সব কথা জেনেও তিনি ১৯০৮ সালে, সেপ্টেম্বর মাসের পয়লা তারিখে সেই দুঃসাধ্যসাধনই করলেন। ছোট্ট একটি গৃহে স্থাপিত হোল, মেয়ে-ইস্কুল, নিজের মেয়ে ও আরও কতকগুলি মেয়ে জুটে গেল, নাম দিলেন "মহারাণী গার্লস স্কুল"। "মহারাণী" নাম হোল এইজন্যে যে সেই দুঃসময়ে প্রতি মাসে অর্থ সাহায্য দিতে সানন্দে রাজি হলেন তাঁর তিন বান্ধবী—কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী ও বর্ধমানের মহারাণী। হেমলতা বহুদিন অবধি কোনো

মাইনে নিতেন না। এই স্কুলের অধ্যক্ষা বা ফাউণ্ডার প্রিন্সিপাল হিসাবে আমৃত্যু তিনি কাজ করে গেছেন। স্কুলটি ভাড়াবাড়ী "ওক্ লজ"-এ হোত। সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুধু বাঙ্গালী মেয়ে নন, তিব্বতী, সিকিমী, ভুটানী ও নেপালী মেয়েরাও এখানে বিদ্যালাভের সুযোগ পেলো। স্কুলটি হাই স্কুল হোল, এবং ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চস্থান পেতে লাগলেন। এতে হেমলতার নিজের পড়ানর ধরণ ও ছাত্রীদের সঙ্গে অন্তরের যোগ একটা বড় কথা। স্বর্গতা শ্রীযুক্তা রাণী মহালানবীশও তাঁর স্কুলে পড়েছেন এবং যখন মহারাণী স্কুলের নিজ জমিতে নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হলেন হেমলতা, তখন মেয়েদের জন্য আবাসস্থান সেই বোর্ডিংয়ে তিনি থেকেছেন। একটি স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন যে, বাড়ীছাড়া মেয়েদের মাসীমা" (হেমলতা) ছিলেন পরম আশ্রয় এবং পরম বন্ধু।

হেমলতার স্থাপিত সেই স্কুলের ৫৫তম জন্মদিন অল্পদিন আগে হয়েছে। পুরাতন শিক্ষিকা হিসাবে স্বনামখ্যাতা সাহিত্যিকা লীলা মজুমদার বলেছেন ১৯৩১ সালের কথা, যখন তিনি মহারাণী বিদ্যালয়ে পড়াতেন:—

হেমলতা ছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপনার জন। আদর্শ অধ্যক্ষা যেমন হওয়া উচিত, কোমলে কঠিনের অপূর্ব্ব সমাবেশ। তার সঙ্গে তাঁর অতি বিরল রসবোধ। অমন আর দেখলাম না। তাঁর গোঁড়ামী ছিল না, আকাশের মত উদার, দেখবামাত্র ভালবেসে ফেলতে হয়। কোনো কাছেই তাঁর "নর্থ ভিউ" নামক বাসাবাড়ী ছিল অবারিতদ্বার, এক কথায় দার্জিলিং সহরের প্রাণকেন্দ্র। রোজ বিকালে গুণী-নির্গুণের সমাবেশ সেখানে। রোজ সেখানে আনন্দের হাট বসতো। আদর্শ অধ্যাপিকা কাকে বলে দেখতে পেরেছি।"

হাই স্কুলের অধ্যক্ষার ও শিক্ষিকার গুরুভার ছাড়াও ব্রহ্ম-উপাসনার জন্য মন্দির তৈরীর কাজে প্রবৃত্ত হয়ে হেমলতা সেটিও স্থাপন করলেন। ভক্তদের জাতকুলধর্ম্ম-ভেদে সেটি ভগবানের মহিমা-কীর্ত্তনের মন্দির হয়ে এখনও বর্ত্তমান।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্যে হেমলতা আজীবন কাজ করে গেছেন। তেমনি, নিজের জীবন দিয়ে ভগবানের প্রসাদ পেয়েছেন। অসহায়, অর্থহীন এক বিধবা (১৯১৮ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়) পাঁচটি সন্তানকে এমনভাবে মানুষ করেছেন যে তাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুবিদিত। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিজলীবিহারী শারীরতত্ত্বে উচ্চতম ডিগ্রী লাভ করেছেন—ভারতবর্ষের সম্মান রেখেছেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধানের ফলে তাঁর নামাঙ্কনে মনুষ্যশরীরের একটি অংশ Sarkar's Ganglion নামাঙ্কিত। তাঁর পত্নী, দেশবন্দিত অন্ধ কবি, সাহিত্যিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা, সুকবি ও সাহিত্যিকা সুনীতি দেবী। দ্বিতীয় পুত্র বিজয়বিহারী, সসম্মানে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন ও পরে পূণে ঐতিহ্যমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন জব্বলপুরের বিখ্যাত সিভিল সার্জ্জন, ডাঃ লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর এক কন্যা, মাধুরী দেবীকে। জ্যেষ্ঠাকন্যা বীণার বিবাহ হোল নামকরা ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে, যিনি মহামতি দেশপ্রেমিক আনন্দমোহন বসুর নাতি ও জগদ্বিখ্যাত স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়। দ্বিতীয়া ইলার বিবাহ হোল ভক্ত গগনবিহারী হোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র, লেখক সাংবাদিক অমল হোমের সঙ্গে। তৃতীয়া কন্যা মীরার বিবাহ হোল আর এক সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও "পরিচয়" পত্রিকার সম্পাদক, হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে।

পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী; পৌত্র, পৌত্রী, এমন কি প্রথম পৌত্রীর পুত্রসন্তান

প্রপৌত্রকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পুণ্যবতী, শিক্ষাব্রতিণী, সমাজসেবিকা, ভক্তিময়ী হেমলতা পরলোকগমন করেন ১৯৪১ সালে।

হেমলতা দেবী পিতৃজীবনী লিখেছেন, যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯২১ সালে পিতার মৃত্যুর পর। অসামান্য মানুষের জীবনী কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীও অসামান্যা। তা না হলে নিজের অতি আপনার জন, অপার শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ ভক্তিভাজন পিতার জীবনী এমন বস্তুগত ভাবে লিখতে সমর্থ হতেন না। এ বিষয়ে তাঁর স্পর্শকাতরতা তাঁর পুস্তকের নিবেদনে স্পষ্ট কিন্তু তিনি যে অতি ভক্তি প্রণোদিত হয়ে কোথাও অতিশয়োক্তি করেন নি তাও নির্ভয়ে পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন। এবং সেই বলাটাই তাঁর চরিত্রের বিশালতা তাঁর পরিশুদ্ধির নিদর্শন, তাঁর সত্যনিষ্ঠার পরিচয়।

তপতী মুখোপাধ্যায়